সূচীপত্র

Peace

জান্নাতী ২০ রমণী

পিস পাবলিকেশন-ঢাকা
Peace Publication

জান্নাতী
২০ রমণী

কুরআন ও হাদীসের আলোকে

জান্নাতী ২০ রমণী

সংকলনে

মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম

সম্পাদনায়

মুফতি মুহাম্মদ আবুল কাসেম গাজী
এম.এম, প্রথম শ্রেণী (প্রথম)
এম.এম, এম.এফ, এম.এ (প্রথম শ্রেণী)
মুফাসসির
তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা
ঢাকা।

হাফেজ মাও: আরিফ হোসাইন
বি.এ (অনার্স) এম.এ, এম.এম
পিএইচ ডি গবেষক, ঢাবি
আরবি প্রভাষক
নওগাঁও রাশেদিয়া ফাযিল মাদরাসা
মতলব, চাঁদপুর।
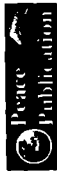
পিস পাবলিকেশন-ঢাকা
৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

জান্নাতী
২০ রমণী

প্রকাশক
মো: রফিকুল ইসলাম
প্রকাশনায় : পিস পাবলিকেশন
৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট, ঢাকা – ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৫৭৬৮২০৯
প্রকাশকাল : অক্টোবর – ২০১১ ইং
কম্পিউটার কম্পোজ : পিস হ্যাভেন
বাধাঁই : তানিয়া বুক বাইন্ডার্স, সূত্রাপুর
মুদ্রণে : ক্রিয়েটিভ প্রিন্টার্স
৪/৬ জয়চন্দ্র ঘোষ লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা।
ইমেইল : peacerafiq@yahoo.com

মূল্য : ২০০.০০ টাকা।

সম্পাদকীয়

যাবতীয় প্রশংসা জ্ঞাপন করছি মহান রাব্বুল আলামীনের জন্যে, যিনি তাঁর একান্ত মেহেরবাণীতে **জান্নাতী ২০ রমণী** নামক গ্রন্থটি সম্পাদনা করার তাওফিক দান করেছেন। সালাত ও সালাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির দিশারী রাসূল [illegible]-এর ওপর। শহীদ ভাইদের রুহের মাগফিরাত কামনা করছি।

জান্নাতী ২০ রমণী নামক এ মূল্যবান গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহর শোকর আদায় করছি, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা গ্রন্থটির নাম দিয়েছি **জান্নাতী ২০ রমণী**। জান্নাতের শুধুমাত্র ২০ রমণীই নয়। গ্রন্থটির কলেবর বৃদ্ধি হওয়ার আশঙ্কায় অনেকের আলোচনা এড়িয়ে গেছি। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার নাম। মানব জাতির একটি অংশ নর আরেকটি নারী। ইসলাম নারীকে কেবল পুরুষের সমান অধিকারই দেয়নি বরং তাকে দিয়েছে অগ্রাধিকার। তাই জান্নাতী নারীদের জীবনী, কার্যাবলী এবং ইসলামের জন্য তাদের খেদমত এ প্রসঙ্গে জানা প্রত্যেক নর-নারীর জন্য উচিত।

এ বিষয়ের ওপর পর্যাপ্ত পরিমাণে তাত্ত্বিক কোন গ্রন্থ না থাকায় আমরা অনেক দিন থেকে এ রকম একটি মূল্যবান গ্রন্থ সম্পাদনের চেষ্টা করেছি। বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্তের নিরীখে কুরআন ও হাদীসের আলোকে জান্নাতী ২০ রমণীদের জীবনী ও মানবতার জন্যে তাঁদের অবদান ও হাদীস শাস্ত্রে তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের যে সমাবেশ ঘটেছে তা জাতির সামনে উপস্থাপন করতে পেরে নিজেদের ওপর

অর্পিত দায়িত্বের কিয়দাংশ হলেও আদায় করতে পেরেছি বলে মনে করছি।

পরিশেষে, এ মহান কাজে যারা সময় ও শ্রম কুরবানী করেছেন তাদের কৃতজ্ঞতা জানাই। পাঠকদের সুচিন্তিত পরামর্শ পরবর্তী সংস্করণে প্রতিফলিত হবে বলে প্রতিশ্রুতি রইল। বইটি ভাল হলে অন্তত একজনকে বলুন আর আপত্তি থাকলে আমাদের বলুন। আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাতী ২০ রমণীদের জীবনী জেনে তা থেকে শিক্ষা অর্জন করে বাস্তব জীবনে প্রতিফলনের তাওফিক দান করুন। আমিন ॥

সূচীপত্র

১. উম্মুল মু'মিনীন খাদীজা (রা)

١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ اَتٰى جِبْرِيْلُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَذِهِ خَدِيْجَةُ قَدْ اَتَتْ مَعَهَا اِنَاءٌ فِيْهِ اِدَامٌ اَوْ طَعَامٌ اَوْ شَرَابٌ فَاِذَا هِىَ اَتَتْكَ فَاقْرَاْ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّىْ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لاَ صَخَبَ فِيْهِ وَلاَ نَصَبَ

১. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, জিবরাঈল (আ) নবী করীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! ঐ যে খাদীজা (রা) একটি পাত্র হাতে নিয়ে আসছেন। ঐ পাত্রে তরকারী অথবা খাদ্যদ্রব্য অথবা পানীয় ছিল। যখন তিনি পৌঁছে যাবেন তখন তাঁকে তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকেও সালাম জানাবেন। আর তাঁকে জান্নাতের এমন একটি ভবনের সুসংবাদ দিবেন যার অভ্যন্তর ভাগ ফাঁকা-মোতি দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। সেখানে থাকবে না কোন প্রকার শোরগোল; কোন প্রকার দুঃখ-ক্লেশ।

(বুখারী : হাদীস নং-৩৮২০)

খাদীজা (রা)-কে নবী করীম ﷺ জান্নাতে একটি গৃহের সুসংবাদ দিয়েছেন।

٢. عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ بَشَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَدِيْجَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ ـ

২. আয়েশা সিদ্দিকা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ খাদিজা (রা)-কে জান্নাতে একটি ঘরের সুসংবাদ দিয়েছেন।

(মুসলিম : হাদীস নং-৬২৭৬, কিতাবুল ফাযায়েল, বাব মিন ফাযায়েল খাদীজা)

মারইয়াম বিনতে ইমরান, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ ﷺ, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রী খাদিজা ও ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া জান্নাতী রমণীদের সরদার হবে।

٣. عَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَيِّدَاتُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ بَعْدَ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ فَاطِمَةُ وَخَدِيْجَةُ وَاٰسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ ـ

৩. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : জান্নাতী রমণীদের সরদার মারইয়াম বিনতে ইমরান এর পরে ফাতেমা, খাদিজা ও ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া।

(তাবরানী : সিলসিলা আহাদিস সহীহা লি আলবানী; হাদীস নং-১৪৩৪))

নাম ও উপনাম : তাঁর নাম 'খাদীজা', ডাক নাম 'উম্মুল হিন্দ', তাঁর প্রথম স্বামী আবুল হালার ঔরসে হিনদ নামক তাঁর এক পুত্র ছিল, তার নাম অনুসারে খাদীজা (রা)-এর উপনাম হয় উম্মুল হিনদ।

জন্ম : তিনি নবী করীম ﷺ -এর প্রথমা স্ত্রী, প্রথম মুসলমান উম্মুল মু'মিনীনদের প্রধান খাদীজাতুল কুবরা (রা) ৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ হস্তী বছরের ১৫ বছর পূর্বে মক্কার সম্মানিত গোত্র আসাদ ইবনে আবদিল উযযায় জন্মগ্রহণ করেন। সে হিসেবে তিনি বয়সে রাসূল ﷺ-এর ১৫ বছরের বড় ছিলেন।

মাতা-পিতা ও পূর্বপুরুষ : পিতার নাম খুওয়াইলিদ ইবনে আসাদ ইবনে আবদুল ওযযা ইবনে কুসাই, মায়ের নাম ফাতিমা বিনতে যায়িদাহ। আর নানা ছিলেন আসাম ইবনে হারাম ইবনে ওয়াহাব ইবনে হাজার ইবনে আবদ ইবনে মাঈছ ইবনে আমের। তাঁর নানীর নাম হালাহ বিনতে আবদে মানাফ। উল্লেখ্য যে, কয়েক পুরুষ ওপরে গিয়ে খাদীজা (রা)-এর পিতৃকূল ও মাতৃকূল এক ছিল। অর্থাৎ তাঁর উর্ধ্বতন পঞ্চম পুরুষ এবং নবী করীম ﷺ-এর উর্ধ্বতন পঞ্চম পুরুষ একই ব্যক্তি ছিলেন। এ ব্যক্তির নাম ছিল কুসাই। পৈত্রিক বংশের দিক দিয়ে খাদিজা রাসূল ﷺ-এর ফুফু হতেন। নবুওয়্যাতের সূচনায় খাদীজা তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নাওফাল এর নিকট রাসূল ﷺ সম্পর্কে যে উক্তি করেছিলেন "আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের কথা শুনুন" তা এ সম্পর্কের ভিত্তিতেই। তাহলে বুঝা গেল খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ (রা) ছিলেন আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ বংশ কুরাইশ বংশের পূত পবিত্র সন্তান।

গোত্র : তাঁর গোত্র আসাদ ইবনে আব্দুল উযযা কুরাইশদের সেই নয়টি বিশিষ্ট গোত্রের অন্যতম ছিল, যাদের মধ্যে দশটি জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় গৌরবজনক দায়িত্ব ছিল। পরামর্শ এ গোত্রের দায়িত্বে রয়েছে বিধায় 'দারুণ নাদওয়া' এর ব্যবস্থাপনা

ছিলো তাদের অধীনস্থ। পরামর্শ অর্থ হলো কুরাইশদের যখন কোন জাতীয় অথবা রাষ্ট্রীয় সমস্যা দেখা দিত এবং তারা ঐক্যবদ্ধভাবে কোন কাজ করতে মনস্থ করত তখন সুপরামর্শের জন্য এ গোত্রের নিকট আগমন করত। এ পদে সর্বশেষ অধিষ্ঠিত ব্যক্তি ছিলেন যায়েদ ইবনে যাম'আ ইবনে আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব ইবনে আসাদ। কুরাইশরা তাদের সমস্যাবলী তাঁর নিকট পেশ করত। তিনি যদি তাদের সাথে একমত পোষণ করতেন তাহলে বিষয়টি গ্রহণযোগ্য হত নতুবা তাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিত। কুরাইশগণ পুনরায় চেষ্টা করে তাকে তাদের মতাবলম্বী করে নিত। উহা হতে কুরাইশদের মধ্যে তাঁর প্রভাব কেমন তা উপলব্ধি করা যায়।

উপাধি : উপাধি 'তাহিরা' (طَاهِرَةٌ) অর্থাৎ পবিত্রা নারী। খাদীজা (রা) তৎকালীন আরবে অত্যন্ত মর্যাদা সম্পন্না ও সম্মানিতা একজন মহিলা হিসেবে ব্যাপকভাবে পরিচিতা ছিলেন। সে জাহেলী যুগেও তাঁর পূত পবিত্র চরিত্রের জন্য তিনি 'তাহিরা' উপাধিতে ভূষিতা হন।

তিনিই রাসূল ﷺ-এর প্রথম স্ত্রী, নবী নন্দিনী ফাতিমাতুজ জোহরার মা, ইনিই হাসান ও হোসাইন (রা)-এর নানী এবং তৎকালীন আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনাঢ্য ব্যবসায়ী।

খাদীজা (রা)-এর বাল্যকাল সম্বন্ধে তেমন কিছুই জানা যায় না। তবে রাসূল ﷺ-এর সাথে বিয়ে হবার পূর্বে তাঁর আরও দু'বার বিয়ে হয়েছিল। এরও পূর্বে খাদীজা (রা)-এর পিতা খুওয়াইলিদ তাঁকে বিয়ে দেয়ার জন্য সে সময়ের বিশিষ্ট ব্যক্তি তাওরাত ও ইনজীল বিশেষজ্ঞ ওয়ারাকা ইবনে নাওফিলের সাথে সম্বন্ধ ঠিক করেন। ওয়ারাকা খাদীজার চাচাত ভাই ছিলেন। কিন্তু যে কোন কারণে সে বিয়ে হয়নি।

প্রথম বিবাহ : খাদীজা (রা)-এর প্রথম বিবাহ হয় আবূ হালা হিনদ ইবন যুরারা ইবনে নাব্বাশ ইবনে 'আদিয়্যি আত-তামীমীর সাথে (ইবন হাযম জামহারাতু আনসাবিল-আরাব, পৃ. ২১০)। তাঁর নাম সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেহ কেহ নামনাশ ইবনে যুরার আবার কেহ কেহ নাব্বাশ ইবনে মুরারা বলে বর্ণনা করেছেন। ইবনে সাদ হিনদ ইবনে মাব্বাশ ইবনে যুরারা বলে উল্লেখ করেছেন। আবূ হালার দাদা নাব্বাশ তার গোত্রের মধ্যে একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মক্কায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন এবং বনূ 'আবদি' ইবনে কুসায়্যির সাথে মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপন করেন। কুরাইশদের রীতি ছিল যে, তারা

মিত্রদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করত। তাই খাদীজা (রা)-এর সাথে আবূ হালার সম্পর্ক কুরাইশদের সমপর্যায়ের ছিল। তারাও মুদার গোত্রভূত ছিল। এ জন্য তাদের সাথে আত্মীয়তা করা কোনরূপ অবমাননাকর ছিল না। এ স্বামীর ঔরসে খাদীজা (রা)-এর তিনটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে ২ (দুই) পুত্র হিনদ ও আল হারিছ এবং যয়নব নামক এক কন্যা। খাদিজার প্রথম পুত্র ও প্রথম সন্তান হল হিনদ। যিনি রাসূল ﷺ-এর নিকট লালিত-পালিত হন। এজন্য তাকে রাবীবু রাসূলিল্লাহ رَبِيبُ رَسُولِ اللهِ বা রাসূল ﷺ-এর পালক পুত্র বলা হত।

এ হিনদ ইসলাম গ্রহণ করে উহুদ বা বদর যুদ্ধে শরীক হন এবং পরে বসরায় ইনতেকাল করেন। রাসূল ﷺ নবুওয়্যাত প্রাপ্তির পর খাদীজা (রা)-এর এ পুত্র দু'জনই ইসলাম কবুল করেন এবং সম্মানিত সাহাবা হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। কিন্তু তাদের পিতা আবূ হালা ইবনে যাররাহ সে জাহেলী যুগেই ইন্তেকাল করেন।

দ্বিতীয় বিবাহ : খাদীজা (রা)-এর স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ হয় 'আতীক ইবনে 'আ'ইয (ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে 'উমর ইবনে মাখযুম)-এর সাথে। খাদীজা (রা)-এর গর্ভে তাঁর এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে যিনি উম্মু মুহাম্মাদ উপনামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন (জামহারাতু আনসাবিল আরাব, পৃ. ১৪২)। ইবনে সাদ আইয-এর স্থলে আবিদ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি মাখযুম গোত্রের লোক ছিলেন এবং আবূ জাহেল উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামা (রা) ও খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা)-এর চাচা ছিলেন। খাদীজা (রা)-এর গোত্রের সাথে এ গোত্রের এ দিক থেকে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল যে, উম্মে সালামা (রা)-এর সহোদরা কারীবা বিনতে আবী উমাইয়্যার সাথে যাম'আ ইবনে আসওয়াদ এর বিবাহ হয় এবং যায়েদ ইবনে যাম'আ তাঁদের পুত্র।

দ্বিতীয় স্বামী আতিকের মৃত্যু হলে তিনি বিশেষভাবে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রতি মনোনিবেশ করেন।

পিতার ইনতিকাল : খাদীজা (রা)-এর বয়স আনুমানিক পঁয়ত্রিশ বৎসরের সময় তাঁর পিতা খুওয়াইলিদ ইনতিকাল করেন। ইবনে সা'দ তাঁর তাবাকাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ফুজ্জার যুদ্ধে ইনতিকাল করেন।

খাদিজার ব্যবসায়িক অবস্থা : ঐতিহাসিকগণ এক বাক্যে স্বীকার করেছেন যে, আরবের সে জাহেলী যুগে মক্কার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদশালী ব্যবসায়ী ছিলেন খাদীজাতুল কুবরা (রা)। জানা যায়, তাঁর বাণিজ্য বহর যখন সিরিয়ার উদ্দেশ্যে

যাত্রা করত তখন দেখা যেতো একা খাদিজার পণ্য সামগ্রী কুরাইশদের সমগ্র পণ্য সামগ্রীর সমান।

পিতার মৃত্যুর পর খাদীজা (রা)-এর পক্ষে ব্যবসায় পরিচালনা করা একটু কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ তাঁর পিতার ব্যবসায় আরবের বাইরেও বিস্তৃত ছিল। এজন্য তিনি একজন বিশ্বস্ত লোক খুঁজতে লাগলেন যাতে তাঁর ব্যবসায় দেশের বাইরেও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়।

বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী রাসূল ﷺ : নবী করীম ﷺ তখন ২৫ বছরের যুবক। ইতোমধ্যেই তিনি তাঁর চাচা আবূ তালিবের সাথে কয়েকবার বাণিজ্য সফরে গিয়ে প্রভূত সাফল্য বয়ে এনেছিলেন। সাথে সাথে ব্যবসায় সম্পর্কিত পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছিলেন। অন্যদিকে তিনি নানাবিধ সামাজিক কার্যক্রমে জড়িত হওয়ার কারণে সর্বোপরি ঐ বয়সেই আল-আমীন উপাধিতে ভূষিত হওয়ায় সমগ্র আরবে তিনি পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর সততা, নিষ্ঠা, আমানতদারিতা, ন্যায়-পরায়ণতা, বিশ্বস্ততা ও চারিত্রিক মাধুর্যতার কথা খাদিজা (রা)-এর কানেও পৌঁছতে দেরী হয়নি।

বিশ্বস্ত লোকের খোঁজে খাদিজা : এদিকে খাদিজা (রা) তাঁর ব্যবসায় পরিচালনা করার জন্য বিশ্বস্ত লোক খুঁজছেন জানতে পেরে রাসূল ﷺ-এর চাচা আবূ তালিব তাঁকে ডেকে বললেন, 'ভাতিজা! আমি একজন দরিদ্র মানুষ, সময়টাও খুব সংকটজনক। মারাত্মক দুর্ভিক্ষের কবলে আমরা নিপতিত। আমাদের কোনো ব্যবসায় বা অন্য কোনো উপায়-উপকরণ নেই। তোমার গোত্রের একটি বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া যাচ্ছে। খাদীজা তাঁর পণ্যের সাথে পাঠানোর জন্য কিছু লোকের খোঁজ করছেন। তুমি যদি তাঁর কাছে যেতে, হয়তো তোমাকেই তিনি নির্বাচিত করতেন। তোমার চারিত্রিক নিষ্কলুষতা তাঁর ভালো করেই জানা আছে।' চাচা আবূ তালিবের প্রস্তাবের জবাবে রাসূল ﷺ বললেন, 'সম্ভবত তিনি নিজেই লোক পাঠাবেন।'

দেখা গেল সত্যি সত্যিই খাদীজা (রা) লোক পাঠিয়ে বলে দিলেন যে, 'মুহাম্মদ ﷺ যদি তাঁর ব্যবসায় পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে সিরিয়া যান তাহলে তাঁকে অন্যদের তুলনায় দ্বিগুণ মুনাফা দেবেন।' রাসূল ﷺ তাঁর প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন এবং একদিন সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন।

পাদ্রীর ভবিষ্যৎ বাণী : রাসূল ﷺ সিরিয়ার পথে এক গীর্জার পাশে একটি গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেয়ার জন্য বাণিজ্য কাফেলা নামিয়ে বসলেন। সঙ্গে ছিলেন

খাদীজা (রা)-এর বিশ্বস্ত দাস মাইসারা। এ সময় গীর্জার পাদ্রী এগিয়ে এসে মাইসারাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'গাছের নিচে বিশ্রামরত লোকটি কে?' মাইসারা বললেন ইনি মক্কার হারামবাসী কুরাইশ গোত্রের লোক। এ কথা শুনার পর পাদ্রী বললেন, ইনি একজন নবী ছাড়া আর কেউ নন।' ঐ পাদ্রীর নাম 'বুহাইরা। অবশ্য কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেছেন ঐ পাদ্রীর নাম ছিল 'নাসতুরা'।'

রাসূল ﷺ-এর প্রাথমিক সফলতা : রাসূল ﷺ সিরিয়ার বাজারে গিয়ে যথাসম্ভব উচ্চ মূল্যে পণ্য-সামগ্রী বিক্রি করে প্রয়োজনীয় মালামাল ও ছামান কম মূল্যে ক্রয় করলেন। তারপর সঙ্গী মাইসারাকে নিয়ে মক্কার পথে রওয়ানা হলেন। পথ চলতে চলতে মাইসারা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলেন, 'নবী করীম ﷺ তাঁর উটের পিঠে সওয়ার হয়ে চলেছেন, আর দু'জন ফেরেশতা দুপুরের প্রচণ্ড রোদ থেকে বাঁচানোর জন্য তাঁর মাথার ওপর ছায়া বিস্তার করে আছে।' এভাবে তাঁরা মক্কায় ফিরলেন। ঘরে ফিরেই মাইসারা তাঁর মালিক খাদীজা (রা)-কে পাদ্রীর মন্তব্য ও পথের সব ঘটনা বিস্তারিতভাবে খুলে বললেন।

মক্কায় ফিরে সিরিয়া থেকে আনা পণ্য-সামগ্রী বিক্রি করে রাসূল ﷺ দেখলেন এ যাত্রায় প্রায় দ্বিগুণ মুনাফা অর্জিত হয়েছে। তিনি সমস্ত হিসাব-নিকাশ খাদীজা (রা)-কে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিলেন।

খাদীজার বিয়ের প্রস্তাব : সুন্দরী, বুদ্ধিমতী ও বিচক্ষণ সর্বোপরি অসম্ভব ভদ্র মহিলা ছিলেন খাদীজা (রা)। কিন্তু তিনি ছিলেন একজন বিধবা। যে কারণে মক্কার অনেক সম্ভ্রান্ত কুরাইশ যুবক তাঁকে বিয়ে করতে আগ্রহী ছিলেন। তাদের অনেকে প্রস্তাবও পাঠিয়েছিলেন। সে সব প্রস্তাব খাদীজা (রা) বিনয়ের সাথে প্রত্যাখ্যান করেন। এরপর অনুগত ও প্রিয় দাস মাইসারার নিকট রাসূল ﷺ-এর সম্বন্ধে তাঁর ব্যবসায়িক আমানতদারিতা ও বিশ্বস্ততার বিস্তারিত বিবরণ জানার পর ইয়ালার স্ত্রী ও খাদীজা (রা)-এর বান্ধবী 'নাফিসা বিনতে মারিয়া'র মাধ্যমে রাসূল ﷺ-এর নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। নাফিসা রাসূল ﷺ-এর নিকট এভাবে প্রস্তাব পেশ করেন : 'আপনাকে যদি ধন-সম্পদ, সৌন্দর্য ও জীবিকার নিশ্চয়তার দিকে আহ্বান জানানো হয়, আপনি কি গ্রহণ করবেন?

এখানে সকলের অবগতির জন্য একটি তথ্য দিয়ে রাখি, আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে আরবের সে জাহেলী যুগেও মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে তাদের মতামতের স্বাধীনতা ছিল। তারা নিজেদের বিয়ে-শাদী সম্পর্কে নিজেরা সরাসরি

কথা বলতে পারতো। প্রাপ্ত বয়স্কা ও অপ্রাপ্ত বয়স্কা সবাই সমভাবে এ অধিকার ভোগ করতো।

শুভ বিবাহ সম্পন্ন : রাসূল ﷺ খাদীজা (রা)-এর পক্ষ থেকে প্রস্তাব পাওয়ার পর সিদ্ধান্তহীনতায় ছিলেন। রাসূল ﷺ তাঁর প্রিয় চাচা আবূ তালিব এর পরামর্শে খাদীজা (রা)-কে বিয়ে করার সম্মতি প্রদান করেন। রাসূল ﷺ সম্মতি দেয়ার পর খাদীজা (রা)-এর চাচা আমর বিন আসাদের পরামর্শে পাঁচশ স্বর্ণমুদ্রা দেনমোহর ধার্য করে বিবাহের দিন-তারিখ ঠিক করা হয়।

বিয়ের দিন রাসূল ﷺ -এর পক্ষ থেকে খাদীজা (রা)-এর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন আবূ তালিব, হামজা (রা)-সহ তাঁর বংশের আরো কিছু সম্মানিত লোক। খাদীজার পক্ষ থেকেও বেশ কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত হলেন। উভয়পক্ষের বিশিষ্ট মেহমানদের উপস্থিতিতে আবূ তালিব প্রাণপ্রিয় ভাতিজার বিয়ের খুতবা পাঠ করেন এবং বিয়ে পড়ান। এ সময়ে নবী করীম ﷺ -এর বয়স ছিল মাত্র ২৫ বছর, আর খাদীজা (রা)-এর বয়স ছিল ৪০ বছর।

নবুওয়্যাত লাভ : এ বিয়ের ১৫ বছর পর অর্থাৎ রাসূল ﷺ-এর বয়স যখন ৪০ বছর তখন তিনি নবুওয়্যাত লাভ করেন। হেরা গুহায় প্রথম অহী নাযিলের বিষয়টি সর্বপ্রথম তিনি খাদীজা (রা)-কে জানান। খাদীজা (রা) তো তাঁর বিয়ের পূর্ব থেকেই রাসূল ﷺ-এর নবী হওয়া সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। যে কারণে তিনি বিষয়টি সহজে সামলে নিতে পেরেছিলেন। এ সম্পর্কে বুখারী শরীফের ৩নং হাদীসখানা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ (رضـ) أَنَّهَا قَالَتْ : أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لاَ يَرٰى رُؤْيَا الاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ اِلَيْهِ الْخَلاَءُ وَكَانَ يَخْلُوْ بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيْهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ اَنْ يَّنْزِعَ اِلٰى اَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِذٰلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلٰى خَدِيْجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتّٰى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِيْ غَارِ حِرَاءٍ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ : اِقْرَأْ قَالَ : مَا اَنَا بِقَارِئٍ قَالَ : فَاَخَذَنِيْ

فَغَطَّنِىْ حَتّٰى بَلَغَ مِنِّى الْجُهْدَ ثُمَّ اَرْسَلَنِىْ فَقَالَ : اِقْرَاْ قُلْتُ :
مَا اَنَا بِقَارِئٍ، فَاَخَذَنِىْ فَغَطَّنِى الثَّانِيَةَ حَتّٰى بَلَغَ مِنِّى
الْجُهْدَ ثُمَّ اَرْسَلَنِىْ فَقَالَ اِقْرَاْ فَقُلْتُ مَا اَنَا بِقَارِئٍ فَاَخَذَنِىْ
فَغَطَّنِى الثَّالِثَةَ ثُمَّ اَرْسَلَنِىْ فَقَالَ : اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ
خَلَقَ ـ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ـ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ـ فَرَجَعَ بِهَا
رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْجُفُ فُؤَادُهٗ ، فَدَخَلَ عَلٰى خَدِيْجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ
(رضى) فَقَالَ : زَمِّلُوْنِىْ، زَمِّلُوْنِىْ ـ فَزَمَّلُوْهُ حَتّٰى ذَهَبَ عَنْهُ
الرَّوْعُ فَقَالَ لِخَدِيْجَةَ ـ وَاَخْبَرَهَا الْخَبَرَ ـ لَقَدْ خَشِيْتُ عَلٰى
نَفْسِىْ ـ فَقَالَتْ لَهٗ خَدِيْجَةُ : كَلَّا وَاللّٰهِ ! مَا يُخْزِيْكَ اللّٰهُ اَبَدًا
اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَتَقْرِى
الضَّيْفَ وَتُعِيْنُ عَلٰى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَانْطَلَقَتْ بِهٖ خَدِيْجَةُ حَتّٰى
اَتَتْ بِهٖ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ ابْنِ اَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزّٰى ابْنَ عَمِّ خَدِيْجَةَ
وَكَانَ امْرَءًا قَدْ تَنَصَّرَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ
الْعِبْرَانِىَّ فَيَكْتُبُ مِنَ الْاِنْجِيْلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ
يَّكْتُبَ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيْرًا قَدْ عَمِىَ فَقَالَتْ لَهٗ خَدِيْجَةُ : يَا
ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنْ ابْنِ اَخِيْكَ فَقَالَ لَهٗ وَرَقَةُ : يَا ابْنَ اَخِىْ مَاذَا
تَرٰى ؟ فَاَخْبَرَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَبَرَ مَا رَاٰى فَقَالَ لَهٗ وَرَقَةُ : هٰذَا
النَّامُوْسُ الَّذِىْ نَزَّلَ اللّٰهُ عَلٰى مُوْسٰى يَا لَيْتَنِىْ فِيْهَا جَذَعًا
لَيْتَنِىْ اَكُوْنُ حَيًّا اِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَ

مُخْرِجِيَّ هُمْ ؛ قَالَ نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُوْدِيَ وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ وَفَتَرَ الْوَحْيُ

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সর্বপ্রথম যে ওহী আসে, তা ছিল ঘুমের মধ্যে সত্য স্বপ্নরূপে। যে স্বপ্নই তিনি দেখতেন তা একেবারে ভোরের আলোর ন্যায় প্রকাশ পেত। তারপর তাঁর কাছে নির্জনতা প্রিয় হয়ে পড়ে এবং তিনি 'হেরা'র গুহায় নির্জনে থাকতেন। আপন পরিবারের কাছে ফিরে আসা এবং কিছু খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যাওয়া– এভাবে সেখানে তিনি একাধারে বেশ কয়েক রাত ইবাদতে নিমগ্ন ছিলেন।

তারপর খাদীজা (রা)-এর কাছে ফিরে এসে আবার অনুরূপ সময়ের জন্য কিছু খাদ্যসামগ্রী নিয়ে যেতেন। এমনিভাবে 'হেরা' গুহায় অবস্থানকালে একদিন তাঁর কাছে ওহী এলো। তাঁর কাছে ফেরেশতা এসে বললেন, 'পড়ুন'। তিনি বললেন : আমি তো পড়তে পারি না। রাসূল ﷺ বললেন, তিনি দ্বিতীয়বার আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিলেন যে, আমার অত্যন্ত কষ্ট হলো। এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন : 'পড়ুন'। আমি উত্তর দিলাম 'আমি তো পড়তে পারি না।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তারপর তৃতীয়বার তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন। এরপর ছেড়ে দিয়ে বললেন, "পড়ুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'রক্তপিণ্ড থেকে। পড়ুন, আর আপনার রব মহিমান্বিত।"

তারপর এ আয়াত নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিরে এলেন। তাঁর অন্তর কাঁপছিল। তিনি খাদীজা বিনত খুওয়াইলিদের কাছে এসে বললেন, 'আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও', 'আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও।' তাঁরা তাঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। অবশেষে তাঁর ভয় দূর হলো। তখন তিনি খাদীজা (রা)-এর কাছে সকল ঘটনা জানিয়ে তাঁকে বললেন, আমি আমার নিজের ওপর আশঙ্কা বোধ করছি।

খাদীজা (রা) বললেন, আল্লাহর কসম, কখনো না। আল্লাহ আপনাকে কখনো অপমানিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, অসহায় দুর্বলের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সহযোগিতা করেন, মেহমানের মেহমানদারী করেন এবং দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন। এরপর তাঁকে নিয়ে

খাদীজা (রা) তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নাওফিল ইব্‌ন 'আবদুল আসাদ ইব্‌ন 'আবদুল 'উযযার কাছে গেলেন, যিনি জাহিলী যুগে 'খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইবরানী ভাষায় লিখতে জানতেন এবং আল্লাহ্‌র তাওফীক অনুযায়ী ইবরানী ভাষায় ইনজীল থেকে অনুবাদ করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ এবং অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

খাদীজা (রা) তাঁকে বললেন, 'হে চাচাতো ভাই! আপনার ভাতিজার কথা শুনুন।' ওয়ারাকা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাতিজা! তুমি কী দেখ?' রাসূলুল্লাহ্‌ﷺ যা দেখেছিলেন, সবই খুলে বললেন। তখন ওয়ারাকা তাঁকে বললেন, 'ইনি সে দূত যাঁকে আল্লাহ মূসা (আ)-এর কাছে পাঠিয়েছিলেন। আফসোস! আমি যদি সেদিন যুবক থাকতাম। আফসোস! আমি যদি সেদিন জীবিত থাকতাম, যেদিন তোমার কওম তোমাকে বের করে দেবে।' রাসূলুল্লাহ্‌ﷺ বললেন, 'তারা কি আমাকে বের করে দেবে?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, অতীতে যিনিই তোমার মতো কিছু নিয়ে এসেছেন তাঁর সঙ্গেই শত্রুতা করা হয়েছে। সেদিন যদি আমি থাকি, তবে তোমাকে প্রবলভাবে সাহায্য করব।' এর কিছুদিন পর ওয়ারাকা (রা) ইন্তেকাল করেন। আর ওহী স্থগিত থাকে।

খাদীজার ইসলাম গ্রহণ : ওহী সূচনার এ ঘটনা দ্বারা বুঝা যায় খাদীজা (রা) প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী। ইসলাম গ্রহণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, খাদীজা ইসলাম গ্রহণ করার ফলে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ওপর এক বিরাট ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। তাঁর বংশধর এবং শুভানুধ্যায়ী ও নিকটাত্মীয়দের মধ্যে বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে খাদীজা (রা) পুরোপুরি রাসূলুল্লাহ্‌ﷺ-কে অনুসরণ করা শুরু করেন। সালাত ফরজ হওয়ার পূর্ব থেকেই তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ﷺ-এর সাথে ঘরের ভেতর সালাত আদায় করতেন। এ অবস্থা একদিন বালক আলী দেখে ফেলেন এবং জিজ্ঞেস করেন; 'মুহাম্মদ এ কী?' রাসূলﷺ এ সময় নতুন দ্বীনের দাওয়াত আলী (রা)-এর কাছে পেশ করেন এবং বিষয়টি গোপন রাখার জন্য বলেন। এ সময় ইসলামের অবস্থা ছিল আফীক আল কিন্দীর ভাষায়, 'আমি জাহেলী যুগে মক্কায় এসেছিলাম স্ত্রীর জন্য আতর এবং কাপড়-চোপড় ক্রয় করতে, সেখানে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের নিকট অবস্থান করি।

ভোরবেলা কা'বা শরীফের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ে। আব্বাসও আমার সাথে ছিলেন। এ সময় একজন যুবক আগমন করেন এবং আকাশের দিকে তাকিয়ে

কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ পর একজন নারী ও একজন শিশু এসে তার পিছনে দাঁড়ায়। এরা দু'জন যুবকটির পেছনে সালাত আদায় করে চলে যায়। তখন আমি আব্বাসকে বললাম, 'আব্বাস! আমি লক্ষ্য করছি, এক বিরাট বিপ্লব ঘটতে যাচ্ছে।' আব্বাস বললেন, 'তুমি কি জান, এ যুবক এবং মহিলাটি কে?' আমি জবাব দিলাম, 'না'। তিনি বললেন, 'যুবকটি হচ্ছে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব আর শিশুটি হচ্ছে আলী ইবনে আবূ তালিব ইবনে আবদুল মুত্তালিব। যে নারীকে তুমি সালাত আদায় করতে দেখেছো, তিনি হচ্ছেন আমার ভাতিজা মুহাম্মদ-এর স্ত্রী খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ।

আমার ভাতিজার ধারণা, তার ধর্ম খাছ একনিষ্ঠ ধর্ম এবং সে যা কিছু করছে আল্লাহর হুকুমেই করছে। যতদূর আমার জানা আছে, সারা দুনিয়ায় এ তিনজন ছাড়া আর কেউ তাদের দ্বীনের অনুসারী নেই। এ কথা শুনে আমার মনে আকাঙ্ক্ষা জাগে যে, চতুর্থ ব্যক্তি যদি আমি হতাম।' (তাবাকাত ৮ম খণ্ড, পৃ-১১)।

খাদীজা (রা) তৎকালীন সময়ে আরবের একজন প্রভাবশালী মহিলা ছিলেন। ফলে তাঁর ইসলাম গ্রহণের প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই তার পিতৃকূলের লোকদের ওপরও পড়ে। জানা যায় তাঁর পিতৃকূলে বনূ আসাদ ইবনে আবদুল উযযার জীবিত পনের জন বিখ্যাত ব্যক্তির দশজনই ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলাম কবুল করেন। এর মধ্যে খাদীজার ভাতিজা হিযামের পুত্র প্রখ্যাত সাহাবা হাকীম জাহেলী যুগে মক্কার 'দারুন নাদওয়া' পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করেন। অপর ভাতিজা আওয়ামের পুত্র প্রখ্যাত সাহাবী যুবাইর (রা)। এ যুবাইর (রা)-এর মা ছিলেন রাসূল ﷺ-এর আপন ফুফু। খাদীজা (রা)-এর এক বোন হালা ছিলেন রাসূল ﷺ-এর মেয়ে যয়নাব (রা)-এর স্বামী আবূল আস ইবনে রাবী'র মা। এ হালাও ইসলাম কবুল করেছিলেন। মোট কথা খাদীজা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের পর তার বংশের ছোট-বড় অনেকে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেন আবার অনেকে ইসলাম সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করতে থাকেন।

জীবনচরিত : খাদীজা (রা) সে সম্মানিতা মহিলা যিনি নবীজীর নবুওয়্যাত প্রাপ্তির সুসংবাদ প্রথম শুনেছিলেন। তিনি নির্দ্বিধায় সর্বপ্রথম রাসূল ﷺ-এর নবুওয়্যাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন এবং ইসলাম কবুল করেছিলেন। সাথে সাথে তাঁর সমস্ত অর্থ সম্পদ রাসূল ﷺ-এর হাতে সোপর্দ করেছিলেন তাঁর ইচ্ছে অনুযায়ী খরচ করার জন্য। রাসূল ﷺ-এর সাথে তাঁর ২৫ বছরের দাম্পত্য জীবনে তিনি

রাসূল ﷺ-এর বিপদে আপদে সুখে-দু:খে সর্বোত্তম বন্ধুর ভূমিকা পালন করেছেন। একজন শান্ত্বনা ধাত্রী হিসেবে সময়ে-অসময়ে সকল প্রকার সাহায্য সহযোগিতা করেছেন জীবন মরণ বাজি রেখে।

রাসূল ﷺ নিজেও খাদীজা (রা)-কে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। যে কারণে নিজের থেকে ১৫ বছরের বড় হওয়া সত্ত্বেও খাদীজা (রা) জীবিত থাকা অবস্থায় তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন নি। রাসূল ﷺ খাদীজা (রা)-কে কেমন ভালবাসতেন তা আয়েশা (রা)-এর বর্ণনা থেকে ধারণা করা যায়। তিনি বলেন, 'খাদীজার প্রতি আমার যতটা ঈর্ষা ছিল রাসূল ﷺ-এর অন্য কোন স্ত্রীর প্রতি ততটা ছিল না। একদিন রাসূলে করীম ﷺ আমার সামনে তাঁর কথা উল্লেখ করলে আমি ঈর্ষান্বিত হয়ে বলি, 'সে তো ছিল বৃদ্ধা স্ত্রী, এখন আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে তার চেয়ে উৎকৃষ্ট স্ত্রী দান করেছেন; তবুও আপনি তার কথা কেন স্মরণ করছেন?' আমার কথা শুনে আল্লাহর রাসূল ক্রুদ্ধ হন। রাগে তাঁর পশম উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, 'আল্লাহর কসম, তাঁর চেয়ে উত্তম স্ত্রী আমি পাইনি। যখন সকলে ছিল কাফির, তখন সে ঈমান এনেছিল। যখন সকলে আমাকে অবিশ্বাস করেছিল, তখন সে আমাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছিল। যখন সকলে আমাকে ত্যাগ করেছিল, তখন সে অর্থ-সম্পদ দিয়ে আমার সহায়তা করেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর গর্ভেই আমাকে সন্তান দান করেছেন।'

আয়েশা (রা) বলেন, 'এরপর আমি অন্তরে অন্তরে বলি-ভবিষ্যতে আমি কখনো খারাপ অর্থে তাঁর নাম মুখে নেবো না।'

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়েও খাদীজা ছিলেন অতুলনীয়া। যে কারণে রাসূল ﷺ বলেছিলেন, 'সত্যিকার অর্থে তিনি ছিলেন সন্তানের মাতা এবং গৃহকর্ত্রী।'

আবূ হুরাইরা (রা) তাঁর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'দুনিয়ার সমস্ত নারীর ওপর চারজন নারীর মর্যাদা রয়েছে– মারইয়াম বিনতে ইমরান, ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া, খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ এবং ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ।' ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল ﷺ মাটির ওপর চারটি রেখা এঁকে বলেন, 'জান, এটি কি? সাহাবীরা বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-ই ভাল জানেন। রাসূল ﷺ বললেন, 'শ্রেষ্ঠ চার জন জান্নাতী নারী–

১. খাদীজা (রা),

২. ফাতিমা (রা),

৩. মারইয়াম (রা) (ঈসা (আ)-এর মা),

৪. আছিয়া (রা) (ফেরাউনের স্ত্রী)।

সত্যি কথা বলতে কি, রাসূল ﷺ খাদীজার যত প্রশংসা করতেন অন্য কোন স্ত্রীর ব্যাপারে ততটা করতেন না।

সমগ্র আরব যখন রাসূল ﷺ-এর দুশমনে পরিণত হয় অর্থাৎ ইসলাম প্রচারের প্রথম দিকে, তখন একদিন নবীজীকে খুঁজতে খাদীজা (রা) বাইরে বের হন। পথে জিবরাঈল (আ) মানুষের রূপ ধরে তাঁর কাছে আসেন এবং রাসূল ﷺ-এর খোঁজ খবর নিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু খাদীজা (র) ভয় পেয়ে যান এ ভেবে যে সম্ভবত তিনি শত্রু, রাসূল ﷺ-কে হত্যা করার জন্য খোঁজ খবর নিচ্ছেন। সে কারণে তিনি ভয় পেয়ে যান এবং দ্রুত গৃহে ফিরে আসেন। বিষয়টি রাসূল ﷺ-কে খুলে বললে তিনি বলেন, 'ঐ ব্যক্তিটি ছিলেন জিবরাঈল (আ)। তিনি আমাকে বলে গেছেন, তোমাকে তাঁর সালাম পৌঁছাতে এবং জান্নাতে এমন গৃহের সুসংবাদ শুনাতে যে গৃহ তৈরি হয়েছে মণি-মাণিক্য দিয়ে, হৈ চৈ আর কষ্ট ক্লেশ কিছুই থাকবে না সেখানে।'

একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়, একবার রাসূলে করীম ﷺ ফাতিমা (রা)-কে অসুস্থ অবস্থায় দেখতে যান এবং জিজ্ঞেস করেন, মা তোমার কি অবস্থা? তিনি বললেন, আমি অসুস্থ। তদুপরি ঘরে খাবার কিছু নেই। রাসূল ﷺ বললেন, কন্যা! তুমি দুনিয়ার নারীদের সরদার। এতে তুমি কি সন্তুষ্ট নও? ফাতিমা (রা) বললেন, 'বাবা! তাহলে মারইয়াম বিনতে ইমরান?' রাসূল ﷺ বললেন, 'তুমি তোমার যুগের নারীদের সরদার। মারইয়াম ছিল অতীতকালের নারীদের মধ্যে সর্বোত্তম। আর খাদীজা বর্তমান উম্মতের নারীদের মধ্যে উত্তম।'

রাসূল ﷺ তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী খাদীজার মৃত্যুর পরও তাঁকে ভুলতে পারেন নি। যে জন্য তাঁর মৃত্যুর পর যতবারই বাড়িতে পশু জবেহ হতো, ততবারই তিনি তালাশ করে করে খাদীজার বান্ধবীদের ঘরে ঘরে হাদিয়া স্বরূপ গোশত পাঠিয়ে দিতেন।

একবার রাসূল ﷺ-এর কাছে জিবরাঈল (আ) বসে আছেন, এমন সময় সেখানে খাদীজা (রা) উপস্থিত হলেন। খাদীজাকে দেখে জিবরাঈল (আ) রাসূল ﷺ-কে বললেন, 'তাঁকে মণি-মুক্তার তৈরি একটি জান্নাতী মহলের সুসংবাদ দিন।'

প্রিয়তমা স্ত্রী খাদীজা (রা) যখন প্রিয় দাস যায়িদ বিন হারিসাকে স্বামীর হাতে তুলে দিলেন তখন রাসূল ﷺ স্ত্রীকে খুশি করার জন্য যায়িদকে স্বাধীন করে দিলেন। খাদীজার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে আয়েশা (রা) যখন রাসূল ﷺ-কে ভালবাসারচ্ছলে রাগাতে চেষ্টা করতেন তখন তিনি বলতেন, 'আল্লাহ্ আমার অন্তরে তাঁর (খাদীজার) জন্য ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।'

খাদিজা (রা)-এর সন্তান-সন্তুতি : খাদীজা (রা)-এর গর্ভে রাসূল ﷺ-এর ৬ জন সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। ৪ জন মেয়ে ও ২ জন ছেলে। পর্যায়ক্রমে তারা হলেন–

১. কাসিম (রা)। যে কারণে রাসূল ﷺ-এর ডাক নাম ছিল আবুল কাসিম। কাসিম (রা) অল্প বয়সে মক্কায় ইনতিকাল করেন।

২. যয়নব (রা)। যার বিবাহ হয়েছিল খাদীজার ভাগিনেয় আবুল আস (রা)-এর সাথে।

৩. রুকাইয়া (রা)।

৪. উম্মু কুলসুম (রা)। রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমের বিবাহ হয়েছিল আবু লাহাবের দুই পুত্রের সাথে। পরবর্তীতে তাদের বিবাহ ভেঙ্গে দেয়া হয়। পরে রুকাইয়াকে ওসমান (রা)-এর সাথে বিবাহ দেয়া হয়। হিজরী দ্বিতীয় সনে রুকাইয়া (রা)-এর মৃত্যু হলে রাসূল ﷺ উম্মে কুলসুমকে ওসমানের সাথে বিবাহ দেন' এ জন্য তাকে যুন নূরাইন দুই জ্যোতির অধিকারী বলা হয়।

৫. খাতুনে জান্নাত ফাতিমা (রা)। তার সাথে আলী (রা)-এর বিবাহ হয়।

৬. আবদুল্লাহ (রা)। যিনি নবুয়াতপ্রাপ্তির ১ বছর পর জন্মলাভ করেন। আবদুল্লাহ অল্প বয়সে ইন্তেকাল করেন। তার জন্মের কারণে খাদীজা প্রথম সন্তান ও জ্যেষ্ঠ পুত্র কাসিম (রা)-এর শোক ভুলে যান। কিন্তু তিনিও শিশুকালেই ইনতেকাল করেন। তারই উপাধি ছিল তায়্যিব ও তাহির। কারণ তিনি নবুয়্যাতের যুগে জন্মগ্রহণ করেন।

নবুওয়্যাতের পঞ্চম বছর রজব মাসে মুসলমানদেরকে হাবশায় হিজরতের নির্দেশ দেয়া হয়। তখন খাদীজা (রা)-কে এক কন্যা হতে বিচ্ছিন্ন হতে হয়। রুকাইয়া (রা) তাঁর স্বামী ওসমানের সাথে হাবশা হিজরত করেন। দীর্ঘদিন যাবত খাদীজা (রা)-কে এ বিয়োগ ব্যাথা ভোগ করতে হয়। নবুওয়্যাতের নবম ও দশম বছরের মধ্যবর্তী সময়ে তারা হাবশা (আবিসিনিয়া) হতে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। প্রায় ৪ বছর তিনি মাতা হতে বিচ্ছিন্ন থাকেন।

নবুওয়্যাতের অষ্টম বছর রুকাইয়ার বয়স ১৫ বছর হয় এবং তার এক বছর পর নবুওয়্যাতের নবম বছরে রুকাইয়ার গর্ভে আবদুল্লাহ্ জন্মগ্রহণ করেন।

রাসূল ﷺ-এর প্রতি নির্মম অত্যাচার : হাবশায় হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি কাফিরগণের দুর্ব্যবহার ও অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। নবুওয়্যাতের সপ্তম বছর মহররম মাস হতে শিব-ই-আবি তালিব নামক গৃহ পথে অবরুদ্ধ থাকতে হয়। কুরাইশগণ যখন দেখল যে, সাহাবায়ে কেরাম হাবশায় পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করেছে এবং নাজ্জাশী তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে, ওমর ও হামযা ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং সকল গোত্রে ইসলামের চর্চা শুরু হয়ে গেছে, তখন তারা পরামর্শ করে বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব সম্পর্কে এ অঙ্গীকারনামা প্রদান করে যার বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ : বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব যতক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মদ ﷺ-কে হত্যার জন্য তাদের নিকট সোপর্দ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে কেউ আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করবে না, ক্রয়-বিক্রয় করবে না, তাদের সাথে মেলামেশা ও কথাবার্তা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রাখবে এবং তাদের নিকট কোন খাদ্যসামগ্রী পৌঁছতে দিবে না।

আবদ দার গোত্রে মানসুর ইবনে ইকরামা এ অঙ্গীকার নামা লিপিবদ্ধ করেন। উহার বিষয়বস্তুর প্রতি গুরুত্ব আরোপের লক্ষ্যে উহাকে কা'বা গৃহের অভ্যন্তরে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। উপায়ান্তর না দেখে বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব আবু কুবাইস পর্বতের শিব-ই-ই আবু তালিব নামক গিরিপথে আশ্রয় গ্রহণ করেন। উহা ছিল হাশিম গোত্রের মীরাছী (উত্তারাধিকার) সূত্রে প্রাপ্ত গিরিপথ।

আবু তালিব রাসূলের সঙ্গে ছিলেন। আবু তালিব তার পরিবারবর্গ নিয়ে পৃথক হয়ে যায় এবং কুরাইশদের সাথে যোগ দেয়। রাসূল ﷺ-এর সাথে খাদীজাও এ গিরিপথে ছিলেন। দীর্ঘ তিন বছর পর্যন্ত এ গিরিপথে অবস্থান করেন তারা। প্রতিবন্ধকতার মধ্যে দিয়ে সেখানে খাদ্য সামগ্রী পৌছানো হত। খাদীজা (রা)-এর তিন ভ্রাতুষ্পুত্র কুরাইশদের সরদার হাকিম ইবনে হিজাম, আবুল বুক্কারী ও জাম'আ ইবনুল আসওয়াত অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও খাদ্য পৌছানোর এ মহান কাজে অংশগ্রহণ করেন। তাদের উষ্ট্র ভিতরে প্রবেশ করত খাদ্যসামগ্রী নিয়ে। পঞ্চাশাধিক বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি অতি দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে সে পার্বত্য গিরিপথে জীবন যাপন করতে থাকেন।

একাধিকক্রমে প্রায় তিন বছর পর দুশমনদের মধ্যেই দয়ার সঞ্চার হল এবং তাদের পক্ষ হতে এ লিখিত অঙ্গীকার ভঙ্গ করবার উদ্যোগ গ্রহণ করা হল। এ

নিপীড়নমূলক অঙ্গীকার ভঙ্গের উদ্যোক্তা ছিলেন কুরাইশের পাঁচ জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তাঁরা হলেন হিশাম ইবনে 'আমার 'আমিরী', যুহাইর ইবনে আবী উমাইয়া মাখযুমী, মুত'ইম ইবনে 'আদিয়া, আবুল-বুখতারী ইবন হিশাম ও যাম'আ ইবনুল আসওয়াদ। শেষোক্ত দুজন খাদীজা (রা)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। প্রথমোক্ত ব্যক্তি ছিলেন বনু হাশিম-এর নিকট-আত্মীয়। যুহাইর ছিলেন আবূ জাহল-এর চাচাতো ভাই এবং উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামা (রা)-এর ভাই। উহা ছিল নবুওয়্যাতের ১০ম বছরের ঘটনা।

ওফাত : নবুওয়্যাতের দশম বছরে রমযান মাসের ১০ তারিখে মক্কায় খাদীজা (রা) ইন্তেকাল করেন। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তখনো জানাযার সালাতের বিধান চালু হয়নি। এ জন্য জানাযা ছাড়াই তাঁকে 'হাজুন' নামক কবরস্থানে দাফন করা হয়। 'হাজুন' মক্কার একটি পাহাড়ের নাম। বর্তমানে এটি জান্নাতুল মাওলা বা জান্নাতুল মু'আল্লা নামে পরিচিত। নবী করীম ﷺ নিজেই খাদীজার লাশ কবরে নামান।

খাদীজা (রা)-এর মৃত্যুর পর ফাতিমা (রা) রাসূল ﷺ-এর নিকটে তাঁর মায়ের অবস্থা জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'তোমার মা খাদীজা (রা) সারা (রা) এবং মারইয়ামের মধ্যখানে অবস্থান করছেন।'

রাসূল ﷺ-এর পৃষ্ঠপোষক চাচা আবূ তালিব খাদীজা (রা)-এর ইন্তেকালের বছরে ইন্তেকাল করেন। অবশ্য একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, আবূ তালিবের মৃত্যুর তিন দিন পর খাদীজা (রা) ইন্তেকাল করেন। যা হোক সময়টা ছিল রাসূল ﷺ-এর একান্ত প্রিয়জন হারানোর দুঃখজনক সময়। এজন্য মুসলিম উম্মাহর নিকট এ বছরটি 'আ'মুল হুযুন' বা শোকের বছর নামে অভিহিত হয়েছে।

২. উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)

আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

١. عَنْ عَائِشَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَمَا تَرْضَيْنَ اَنْ تَكُوْنِىْ زَوْجَتِىْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ قُلْتُ بَلٰى قَالَ فَاَنْتِ زَوْجَتِىْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ـ

১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হে আয়েশা তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি দুনিয়া ও আখেরাতে আমার স্ত্রী হবে? আয়েশা বলল কেন নয়? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি দুনিয়া ও আখেরাতে আমার স্ত্রী।

(হাকিম : সিলসিলা আহাদিস সহীহা লি আলবানী, হাদীস নং-১১৪২)

নাম ও বংশ : নাম আয়েশা। আয়েশা শব্দের অর্থ সৎচরিত্রা। ডাক নাম উম্মে আবদুল্লাহ। উপাধি সিদ্দিকা ও হুমায়রা। তিনি খুব ফর্সা ছিলেন এজন্য তাকে হুমায়রা বলা হতো। পরবর্তীকালে নবী ﷺ-এর স্ত্রী হওয়ার কারণে উম্মুল মু'মিনীন বা মু'মিনদের মা খেতাব প্রাপ্তা হন।

পিতা-মাতা ও বংশ পরিচয় : পিতার নাম আবূ বকর সিদ্দিক (রা)। যিনি রাসূল ﷺ-এর সার্বক্ষণিক সহচর ও বন্ধু ছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদার প্রথম খলিফা ছিলেন। তাঁর মায়ের নাম ছিল যয়নব এবং ডাক নাম ছিল উম্মে রুম্মান।

পিতার দিক থেকে তাঁর বংশ তালিকা হল, আয়েশা বিনতে আবূ বকর ইবনে কুহাফা ইবনে ওসমান ইবনে আমের ইবনে ওমর ইবনে কা'ব ইবনে সা'দ ইবনে তাইম। মাতার দিক থেকে আয়েশা বিনতে উম্মে রুম্মান বিনতে আমের পিতৃকূলের দিক থেকে আয়েশা (রা) তাইম গোত্রের এবং মাতৃকূলে দিক থেকে কেনানা গোত্রের ছিলেন।

কুনিয়াত বা উপনাম : আয়েশা (রা) নিঃসন্তান ছিলেন। একদিন তিনি রাসূল ﷺ-কে বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আপনার অন্যান্য স্ত্রীগণ তাদের পূর্বোক্ত স্বামীর সন্তানদের নামানুসারে গুণবাচক নাম গ্রহণ করে থাকেন। আমি কি ডাক নাম গ্রহণ করার ব্যাপারে কারো নামের সাথে নিজের নামকে সংযুক্ত করবো?' রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃদু হাসলেন এবং বললেন, 'আয়েশা! তুমি তোমার বোনের ছেলে আবদুল্লাহর নামের সঙ্গে সংযুক্ত করে ডাকনাম (কুনিয়াত) গ্রহণ কর।' এর পর থেকে তিনি উম্মে আবদুল্লাহ নামেই পরিচিতি লাভ করেন। অবশ্য তাঁর পিতা আবূ বকর (রা)-এর আসল নাম ছিল আবদুল্লাহ, আর ডাক নাম ছিল আবূ বকর। এ জন্য আয়েশা (রা)-কে উম্মে আবদুল্লাহ অর্থাৎ আবদুল্লাহর মা বলার কারণ ইবনুল আসীর এভাবে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে রাসূল ﷺ তাঁকে 'সত্যবাদীর কন্যা সত্যবাদীণী' বলে ডাকতেন।

জন্ম : আয়েশা (রা)-এর জন্ম ও বিয়ের সন তারিখ নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। তবুও মতগুলো নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, নবুওয়্যাতের ২/৩ সনে তাঁর জন্ম হয়েছিল এবং নবুওয়্যাতের ১০ম সনের শাওয়াল মাসে বিয়ে হয়েছিল। এ সময় তার বয়স হয়েছিল ৬/৭ বছর। হিজরী দ্বিতীয় সনের শাওয়াল মাসে রাসূল ﷺ ও আয়েশা (রা)-এর বাসর অনুষ্ঠিত হয়। এ সময়ে আয়েশার বয়স হয়েছিল ৯/১০/১১ বছর, আর নবী নন্দিনী ফাতিমার বয়স হয়েছিল ১৭/১৮ বছর.। আয়েশা (রা) ফাতিমা (রা) থেকে ৫ বছরের ছোট ছিলেন।

রাসূলের সাথে আয়েশার বিয়ের প্রস্তাব : রাসূল ﷺ-এর খালা খাওলা বিনতে হাকিম ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও আরবের জাহেলী যুগের কুসংস্কার দূর করার জন্য আয়েশা (রা)-কে বিয়ে করার ব্যাপারে তাঁকে বললেন, তৎক্ষণাৎ রাসূল ﷺ এ বিষয়ে হ্যাঁ বা না কিছুই বললেন না। তিনি আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষা করতে লাগলেন। এরপর তিনি এক রাতে স্বপ্ন দেখলেন, 'এক ফেরেশতা কারুকার্য খঁচিত একটি রুমাল জড়িয়ে অতি মনোরম এক বস্তু তাঁকে উপহার দিচ্ছেন। রাসূল ﷺ তা হাতে নিয়ে ফেরেশতাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এটি কি জিনিস? উত্তরে ফেরেশতা তা খুলে দেখার জন্য বললেন। রাসূল ﷺ খুলে দেখলেন তার মধ্যে আয়েশার ছবি অঙ্কিত রয়েছে।'

এরপর রাসূল ﷺ-এর নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে খাওলা আয়েশা (রা)-এর পিতা-মাতার নিকট প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাব শুনে আবূ বকর জানান যে, এ বিয়েতে তাঁর কোন আপত্তি নেই। কিন্তু তিনি বিস্মিত হয়ে বলেন, 'এ বিয়ে

কীভাবে বৈধ হবে? আয়েশা তো রাসূলুল্লাহর ভাইঝি।' এ কথা শুনে রাসূল ﷺ বলেন, 'তিনি তো কেবলমাত্র আমার দ্বীনি ভাই।' খাওলা আবূ বকর (রা)-কে বোঝান যে, রাসূল ﷺ তো আপনার রক্ত সম্পর্কের ভাই নন। রক্ত সম্পর্কে না থাকলে একই খান্দানে এক মুসলমান অন্য মুসলমানের মেয়েকে পর্যন্ত বিয়ে করতে পারে।

আয়েশা (রা)-এর মা এ বিষয়ে বললেন, 'আয়েশার সাথে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিয়ে খুবই আনন্দের কথা। আমার বিশ্বাস এ বিয়ের ফলে আরবের অনেক জঘন্য কু-প্রথা দূর হবে।'

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হলে আবূ বকর (রা) তাঁর পিতা আবূ কুহাফাকে বিষয়টি বললেন। তিনি তাঁর মতামতে বললেন, 'রাসূলুল্লাহর সাথে আমার নাতনীর বিয়ে হলে তা বড়ই গৌরবের কথা হবে। আমার আদরের নাতনী মাহবুব রাব্বুল মাশরিকাইন ও মাগরিবাইন এর মাহবুবা হবে। তবে আমি আমার নাতনীর বিয়ে যুবায়ের ইবনে মাতয়াম এর ছেলের সাথে দেবার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আছি। এ কথা আমি কারো নিকট এতদিন প্রকাশ করিনি। আমি যুবায়েরের মতামত নিয়ে তোমাকে আমার অভিমত জানাবো।

যুবায়ের ও তার পরিবার তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি। সে কারণে তারা নওমুসলিম আবূ বকরের কন্যার সাথে তাদের সন্তানের বিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে রাসূল ﷺ-এর সাথে আয়েশা (রা)-এর বিয়ের বাধা দূরীভূত হয়।

বিয়ে সম্পন্ন : উভয়পক্ষ বিয়েতে সম্মত হয়ে ৫০০ দিরহাম মহরানা ধার্য করা হয়। এরপর আবূ বকর (রা) নিজে রাসূল ﷺ-এর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে নিজ বাড়িতে আনলেন। রাসূল ﷺ আবূ বকরের বাড়িতে আসার সাথে সাথে উপস্থিত মেহমানবৃন্দ 'মারহাবান মারহাবান, আহলান ওয়া সাহলান' অর্থাৎ শুভেচ্ছা স্বাগতম বলে তাঁকে খোশ আমদেদ (স্বাগতম) জানালেন। বিয়ের মজলিসে সকলকে উদ্দেশ্য করে আবূ বকর সিদ্দিক (রা) একটি বক্তৃতা দিলেন, তিনি বললেন–

'আপনারা জানেন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের পয়গম্বর। তিনি আমাদেরকে আঁধার থেকে আলোকে নিয়ে এসেছেন। এ আলোকের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখবার এবং চিরদিনের জন্য আমাদের এ অকৃত্রিম বন্ধুত্ব বজায় রাখবার পথ অনেকদিন ধরে খুঁজছি। তাই আজ আপনাদের খেদমতে আমার ছোট মেয়েটিকে এনেছি। এ ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের নিয়ে কতশত কুসংস্কার আমরা গড়ে তুলেছি। বিনা

Contents

অজুহাতে আমরা শিশু কন্যাকে মাটিতে পুঁতে ফেলি, হাত পা বেঁধে দেব-দেবীর পায়ে বলি দেই; যাদেরকে বাঁচিয়ে রাখি তাদেরকে জীবন্ত-মরা করে ফেলি, দোস্তের মেয়েকে আমাদের কেউই বিয়ে করতে পারে না। আপনারা যদি আমার এ আয়েশাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে সোপর্দ করে দেন তবে চিরতরে আরব দেশ থেকে এ সকল কুসংস্কার মুছে ফেলতে পারবেন। এতে আপনারা আমার বন্ধুত্বকে বজায় রাখতে পারবেন এবং আমার প্রিয় কন্যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে থেকে ভবিষ্যতে তাঁর আদর্শ ও বাণী জগতে প্রচার করতে পারবে।

উপস্থিত সুধীবৃন্দ এ বক্তৃতা শোনার পর সমবেত কণ্ঠে আবার বলে উঠলেন, 'মারহাবান, মারহাবান, (স্বাগতম) আয়েশার বিয়ের মধ্য দিয়ে আমাদের সেই কল্যাণ নেমে আসুক।'

এরপর আবূ বকর (রা) নিজে খুতবা পাঠ করে রাসূল ﷺ ও আয়েশার (রা) বিয়ে পড়িয়ে দেন।

আয়েশা (রা)-এর জন্ম ও বিয়ে ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা মত থাকলেও একটি বিষয়ে সকল ঐতিহাসিকই একমত, তা হল– তিনি শাওয়াল মাসে জন্মগ্রহণ করেন, শাওয়াল মাসেই তাঁর বিয়ে হয় এবং শাওয়াল মাসেই তিনি স্বামীগৃহে প্রথম পদার্পণ করেন।

আয়েশা (রা)-এর জ্ঞান-গরিমা : বাল্যকাল থেকেই আয়েশা (রা) নানা ক্ষেত্রে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দেন। তিনি ছিলেন অসম্ভব প্রতিভাধর একজন বালিকা। তাঁর স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ। যে কোনো বিষয় তিনি দু'একবার পড়লেই মুখস্থ করে ফেলতে পারতেন। আয়েশা (রা) তাঁর পিতার সাথে থেকে ৩/৪ হাজার কবিতা ও কাসিদা কণ্ঠস্থ করেছিলেন। তিনি ছোটবেলা থেকেই পিতা আবূ বকর (রা)-এর ন্যায় একজন ন্যায়পরায়ণ মানুষের পূত-পবিত্র সাহচর্য থেকে আদব-কায়দা, আচার-ব্যবহার, চাল-চলন, দান-খয়রাত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, অতিথি আপ্যায়ন এবং সত্যবাদিতার ক্ষেত্রে তাঁকেই আদর্শ হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি তাঁর পিতা-মাতার নিকট থেকে যে শিক্ষা পেয়েছিলেন, রাসূল ﷺ-এর সাহচর্যে এসে তা শতধারায় বিকশিত হয়েছিল। ফলশ্রুতিতে পরবর্তী জীবনে তিনি মুসলিম বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেমা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন।

কাফেরদের অন্তর্জ্বালা : ইসলাম প্রচারের শুরু থেকেই মক্কা ও মদীনাতে মুনাফিকরা তৎপর ছিল এবং ইসলামের প্রচার ও প্রসার দেখে তাদের অন্তর্জ্বালা

ক্রমেই বাড়ছিল। তারা সুযোগ খুঁজছিল বড় ধরনের কোনো গোলযোগ সৃষ্টির জন্য। বিশেষ করে রাসূল ﷺ ও আবূ বকর (রা)-এর মধ্যে যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল এটাকে তারা ভেঙে দেয়ার ষড়যন্ত্র করতে লাগলো। তাদের ধারণা ছিল আবূ বকর (রা) যেহেতু সমাজের প্রভাবশালী মানুষ, তাছাড়া রাসূল ﷺ -এর সব কিছুকে বিনা বাক্য ব্যয়ে বিশ্বাস করে। অতএব তাদের বন্ধুত্বে ভাঙন ধরানো একান্ত জরুরী।

কাফেরদের ষড়যন্ত্র : কাফেরদের অন্তর্জ্বালা ও গোপন ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য মুনাফিকদের সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই পুণ্যবতী, সতীসাধ্বী আয়েশা (রা)-এর চরিত্রের ভয়ানক এক অপবাদ রটনা করে। ইসলামের ইতিহাসে যা ইফকের ঘটনা নামে খ্যাত।

আয়েশা (রা)-এর জীবনের সাথে জড়িত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী

আয়েশা (রা)-এর জীবনে চারটি ঘটনা অত্যন্ত আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ। এ ঘটনা চারটি হলো : ১. ইফক, ২. ঈলা, ৩. তাহ্‌রীম ও ৪. তাখাইয়ির।

১. ইফক বা মিথ্যা অপবাদ আরোপের ঘটনা

৫ম মতান্তরে ৬ষ্ঠ হিজরীর শা'বান মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বনূ মুসতালিক বা আল মুরায়সী যুদ্ধে যাত্রা করেন। এ যুদ্ধে উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)ও শরীক ছিলেন।

অনেক মুনাফিক বা কপট মুসলমান এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। এ যুদ্ধাভিযানেই মুনাফিকরা আয়েশা (রা)-এর চারিত্রিক নিষ্কলুষতাকে কেন্দ্র করে এক ষড়যন্ত্র পাকায়। তারা আয়েশা (রা)-এর পূত পবিত্র চরিত্রের ওপর নেহায়েত আপত্তিকর মিথ্যা দোষারোপ করে বসে। মূল ঘটনাটি আয়েশা (রা)-এর ভাষ্যে বিভিন্ন হাদীস ও সীরাত গ্রন্থ অবলম্বনে সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে উদ্ধৃত হলো :

আয়েশা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অভ্যাস ছিলো দূরে কোথাও সফরে গেলে কুরআ বা লটারীর মাধ্যমে নির্বাচিতা তাঁর কোন এক পত্নীকে সফর সঙ্গী করতেন। বনূ মুসতালিক যুদ্ধে আমি সফর সঙ্গী নির্বাচিতা হই। এটা পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পরের ঘটনা। পর্দা রক্ষার জন্য আমাকে হাওদাসহ উটের পিঠে উঠানো-নামানো হতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে রাতে মদীনার নিকটস্থ কোন এক স্থানে তাঁবু গেড়ে অবস্থান করেন।

রাতের শেষাংশে যাত্রা শুরু করার নির্দেশ আসে। আমি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার জন্য বাইরে যাই। প্রয়োজন সেরে সাওয়ারীর কাছে ফিরে এসে বুকে হাত দিয়ে দেখি, আমার গলার হার হারিয়ে গিয়েছে। আবার ফিরে গিয়ে তা খুঁজতে শুরু করি। এতে বেশ দেরী হয়ে যায়। আমি হাওদার (অর্থাৎ পালকির মত) মধ্যে আছি ভেবে লোকেরা সাওয়ারীর পিঠে হাওদা উঠিয়ে দেয়। তারা মনে করেছিল আমি হাওদার মধ্যে আছি, যেহেতু আমি চিকন ও হালকা ছিলাম সেহেতু তারা তা বুঝতে পারে নি। ঐ সময়ে খাদ্যাভাবের কারণে আমরা মেয়েরা ছিলাম খুবই হালকা-পাতলা।

সৈন্যবাহিনী রওয়ানা হওয়ার পর আমি হার খুঁজে পেলাম এবং ফিরে এসে দেখি সেখানে কেউ নেই। মনে করলাম তাঁরা আমাকে দেখতে না পেলে অবশ্যই আমার সন্ধানে ফিরে আসবে। কাজেই যে স্থানে আমি ছিলাম সেখানে গিয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে বসে পড়লাম এবং ঘুমিয়ে পড়লাম। বনু সালাম গোত্রের যাকওয়ান শাখার সাফওয়ান ইবনে মু'আত্তাল পিছনে ছিলেন। প্রত্যুষে তিনি আমার অবস্থান স্থলের নিকট পৌছে নিদ্রাবস্থায় দেখে আমায় চিনে ফেলেন এবং ইন্না লিল্লাহ পড়লেন। তাঁর আওয়াজ শুনে আমি জেগে উঠলাম এবং চাদর টেনে মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললাম। আল্লাহর শপথ। আমাদের মধ্যে কোন কথাবার্তাই হয়নি।

তিনি সাওয়ারী থেকে অবতরণ করলেন এবং সাওয়ারীকে বসিয়ে তার পা কষে বাঁধলে আমি তাতে আরোহণ করলাম। তিনি লাগাম ধরে হেটে চললেন। প্রায় দুপুরের সময় আমরা কাফেলাকে ধরলাম। তখন তাঁরা বিশ্রামের জন্য একটি স্থানে কেবলমাত্র থেমেছেন। আমি যে পিছনে রয়ে গেছি এ কথা তাঁদের কারো এখনো জানা হয়নি। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমার ওপর মিথ্যা অপবাদ রটানো হলো। মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ছিল এ অপপ্রচারের অগ্রনায়ক। এছাড়াও মুসলমানদের মধ্যে হাসান ইবনে সাবিত, মিসতাহ, ইবনে উসামাহ এবং হামনা বিনত জাহাশও এতে জড়িয়ে পড়েন।

আয়েশা (রা) বলেন : মদীনায় পৌছে আমি এক মাস যাবৎ অসুস্থ ছিলাম। এদিকে অপবাদের বিষয় নিয়ে লোকজনের মধ্যে কানা-ঘুষা হতে লাগলো। কিন্তু এ সবের আমি কিছুই জানতাম না। তবে আমার সন্দেহ হচ্ছিল এবং তা দৃঢ় হচ্ছিল এ কারণে যে, আমার অসুস্থতার সময় পূর্বে রাসূল ﷺ যেভাবে আমার দেখাশুনা করতেন এবার তা করছেন না। বরং এবার "আমি কেমন আছি"? জিজ্ঞেস করেই চলে যেতেন। এতে আমার মনে বড় সংশয় সৃষ্টি হলো। ভাবতাম

হয়তো কিছু একটা ঘটেছে। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুমতি সাপেক্ষে মায়ের নিকট চলে গেলাম। যাতে তিনি আমার সেবা-শুশ্রূষা ভালোভাবে করতে পারেন।

একদা রাতের বেলায় প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বের হলাম। তখন আমরা সাধারণ আরববাসীদের অভ্যাসমত পায়খানার জন্য এলাকার বাইরে মাঠে বা ঝোপ-ঝাড়ে চলে যেতাম। 'উম্মু মিসতাহ্' ঐ রাতে আমার সাথে গিয়েছিল। কাজ সেরে ফেরার পথে উম্মু মিসতাহ্ পায়ে কাপড় জড়িয়ে পড়ে গিয়ে বলে উঠলেন, মিসতাহ্ ধ্বংস হোক। আমি বললাম, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নিজ পুত্রের ব্যাপারে একি বলছ? সে বলল মিসতাহ তোমার সম্পর্কে কী বলে বেড়াচ্ছে, তাতো তুমি শোননি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সে আমার সম্পর্কে কি বলছে? তখন তিনি অপবাদ রটনাকারীদের কার্যকলাপ ও প্রচারণা সম্পর্কে আমায় অবহিত করলেন। এ ঘটনা শুনে আমার রক্ত যেন শুকিয়ে গেল। সোজা ঘরে ফিরে এসে সারারাত কেঁদে কেঁদে কাটালাম।

উম্মু মিসতাহ্ হলেন আবূ রুহম ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে আবদ মানাফের কন্যা। তার মা ছিলেন আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খালা সাখার ইবনে আমরের কন্যা। তার পুত্র মিসতাহর পিতা ছিলেন আসাসা ইবনে আদ ইবনুল মুত্তালিব।

এ দিকে ওহী আসতে বিলম্ব হচ্ছে দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পত্নী বিচ্ছেদের ব্যাপারে পরামর্শ চেয়ে আলী ইবনে আবু তালিব এবং উসামা ইবনে যায়েদ (রা)-কে ডেকে পাঠালেন। উসামা আয়েশা (রা)-এর পবিত্রতার বিষয়ে দৃঢ় মনোবল হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আপনার স্ত্রী (আয়েশা) সম্পর্কে আমি ভাল ছাড়া অন্য কিছু জানিনা। আপনি তাঁকে নিজের কাছেই রাখুন। আলী (রা) বললেন, হে নবী! আল্লাহ্ তো আপনার সংকীর্ণতা রাখেননি। তিনি ছাড়া তো আরো বহু মেয়ে সমাজে আছে। তবে আপনি দাসী বারীরাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন। সে আপনাকে সত্য কথাই বলবে।

নবী ﷺ বারীরাকে ডেকে বললেন, তুমি কি আয়েশার মধ্যে সন্দেহজনক কিছু দেখেছ? বারীরা বলল, সে সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, আমি তাঁর মাঝে খারাপ বা আপত্তিকর কিছু লক্ষ্য করিনি। তবে তিনি অল্প বয়স্ক কিশোরী হওয়ার কারণে শুধু এতটুকু দোষ দেখেছি যে, রুটি তৈরী করার জন্য আটা খামীর করে রেখে তিনি মাঝে মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তেন, আর বকরী এসে তা খেয়ে ফেলতো।

সে দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, হে সাহাবীগণ! তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে আমার স্ত্রীর ওপর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে আমায় যে কষ্ট দিয়েছে তার আক্রমণ থেকে আমায় রক্ষা করতে পারে? আল্লাহর কসম! আমি আমার স্ত্রীদের মধ্যে কোন দোষ দেখতে পাইনি। একথা শুনে উসাইদ ইবনে হুদাইর মতান্তরে সা'দ ইবনে মু'আয (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! অভিযোগকারী যদি আমাদের বংশের লোক হয়ে থাকে, তবে আমরা তাকে হত্যা করবো আর আমাদের ভ্রাতা খাযরাজ গোত্রের লোক হলে আপনি যা বলবেন তাই করবো।

এ কথা শুনেই খাযরাজ গোত্র নেতা সা'দ ইবনে উবাদা দাঁড়িয়ে বললেন, তুমি মিথ্যা বলছো, কিছুতেই তাকে তুমি মারতে পারবে না। সে খাযরাজ গোত্রভুক্ত বলেই তুমি তাকে হত্যা করার কথা বলছো। সে তোমাদের গোত্রের হলে কখনই তাকে হত্যা করার কথা বলতে না। উত্তরে তাকে বলা হলো, তুমি তো মুনাফিক, এ জন্য মুনাফিকদের সমর্থন দিচ্ছো।

এরূপ কথা কাটাকাটির দরুণ মসজিদে নববীতে গোলযোগের সৃষ্টি হলো। আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা মসজিদের মধ্যে লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু নবী ﷺ তাদেরকে বুঝিয়ে শান্ত করেন। একমাস ব্যাপী এ মিথ্যা দোষারোপের কথা সমাজে পর্যালোচনার বস্তুতে পরিণত হলো। রাসূল ﷺ মানসিকভাবে অত্যন্ত ক্ষত-বিক্ষত হলেন।

আমি অবিরাম কাঁদতে লাগলাম। আমার পিতা-মাতাও খুব উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের মধ্যে কালাতিপাত করছিলেন। শেষে নবী করীম ﷺ একদিন আমার পাশে এসে বসলেন। আমার পিতা-মাতা ভাবলেন, আজ হয়ত কোন সিদ্ধান্তমূলক রায় হয়ে যাবে। এ কারণে তাঁরাও কাছে এসে বসলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে আয়েশা (রা) তোমার সম্পর্কে উত্থাপিত অপবাদ-অভিযোগ আমার কানে পৌঁছেছে। তুমি যদি নির্দোষী হয়ে থাকো, তাহলে আশা করি আল্লাহ্ তোমার নির্দোষিতা প্রকাশ ও প্রমাণ করে দেবেন। আর যদি তুমি কোন গুনাহে লিপ্ত হয়ে থাকো, তবে আল্লাহর নিকট তাওবা করে ক্ষমা চাও, অপরাধী যখন অপরাধ স্বীকার করে তাওবা করে, আল্লাহ্ তখন ক্ষমা করে দেন।

এ কথা শুনে, আমি হত-বিহ্বল ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম। বাবা মাকে বললাম, আপনারা রাসূলের কথার উত্তর দিন। তাঁরা বললেন, কি বলে যে উত্তর দিবো তা আমাদের বুঝে আসছে না। তখন আমি বললাম, আপনাদের কানে

একটা কথা এসে তা বিশ্বাসে পরিণত হয়ে গিয়েছে। এখন যদি আমি নির্দোষ বলে প্রলাপ করি তবে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন না। আর যদি শুধু শুধুই এমন একটি অন্যায় কর্মকে স্বীকার করে নেই, যার সাথে আদৌ আমার কোন সংশ্লিষ্টতা নেই, আল্লাহ জানেন যে, আমি নির্দোষ তবে আপনারাও তা সত্য বলে মেনে নিবেন। আমি তখন ইয়াকূব (আ)-এর নামটি স্মরণের চেষ্টা করলাম, কিন্তু তা স্মৃতিতে এলো না। শেষ পর্যন্ত আমি বললাম, এ পর্যায়ে আমি ঐ কথাই বলব, যা ইউসুফ (আ)-এর পিতা বলেছেন। তা হলো :

فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَّ اللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ۔

অর্থ: "এখন ধৈর্যধারণ করাই উত্তম পন্থা, আর তোমরা যা কিছু বলেছ, সে ব্যাপারে আল্লাহই একমাত্র সহায়"। [১২-ইউসুফ : ১৮]

এ কথা বলে আমি অপর দিকে পাশ ফিরে শুয়ে পড়লাম। মনে মনে ভাবলাম, আল্লাহ আমার নির্দোষিতা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। নিশ্চয়ই তিনি প্রকৃত সত্য উন্মোচন করে দিবেন। 'আমার বিষয়ে আল্লাহ কোন আয়াত নাযিল করবেন নিজেকে আমি এতখানি যোগ্য মনে করিনি, বরং আমি এতটুকু আশা করেছি যে স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ কে আমার পবিত্রতা সম্পর্কে হয়ত জানিয়ে দিবেন।

আল্লাহর শপথ। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখনও তাঁর জায়গা ছেড়ে উঠেন নি এবং বাড়ীর কোন লোকও তখন বাইরে যায়নি, এমন সময় নবী ﷺ-এর ওপর ওহী নাযিল হওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হলো, তীব্র শীতের মধ্যে তাঁর চেহারা হতে টপ টপ করে ঘামের ফোটা পড়তে লাগলো। আমরা সবাই চুপ হয়ে গেলাম। আমি সম্পূর্ণ নির্ভয় ছিলাম, কিন্তু আমার পিতা-মাতা অস্থির ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। ওহী অবতরণের অবস্থা শেষ হয়ে গেল রাসূল ﷺ-কে অত্যন্ত প্রফুল্ল মনে হলো। তিনি হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় প্রথমেই বললেন, হে আয়েশা! তোমার সুসংবাদ। আল্লাহ তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করে ওহী নাযিল করেছেন। অত:পর তিনি সূরা নূর এর ১১ নং আয়াত থেকে ২১ নং আয়াত পর্যন্ত পাঠ করে শুনালেন।

١. اِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْ بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ط لَاتَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ ط بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ط لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ ج وَالَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۔

١٢. لَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ۙ وَّقَالُوْا هٰذَآ اِفْكٌ مُّبِيْنٌ ـ

١٣. لَوْلَا جَآءُوْ عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ـ

١٤. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِىْ مَآ اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ـ

١٥. اِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَّتَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا ۖ وَّهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ ـ

١٦. وَلَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا ۖ سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ ـ

١٧. يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖٓ اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ

١٨. وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ـ

١٩. اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ـ

٢٠. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ـ

٢١. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۗ وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا ۙ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّىْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ـ

১. ইরশাদ হচ্ছে, যারা মিথ্যা অপবাদ রচনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল। এ অপবাদকে তোমরা নিজেদের জন্য অমঙ্গল মনে করো না। বরং তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে কৃত পাপ কর্মের ফল। আর তাদের মাঝে যে এ কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে, তার জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।'

২. এ কথা শুনার পর বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীগণ কেন নিজেদের বিষয়ে সৎ ধারণা করেন নি? এবং বলেনি যে এটা মিথ্যা অপবাদ।

৩. তারা কেন চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি? এজন্য তারা আল্লাহর বিধান মত মিথ্যাবাদী।

৪. ইহলোক ও পরলোকে তোমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমরা যাতে নিমগ্ন ছিলে তজ্জন্য কঠিন শাস্তি তোমাদেরকে স্পর্শ করতো।

৫. যখন তোমরা মুখে মুখে তা ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয়ে মুখ খুলছিলে যে সম্পর্কে তোমাদের কোনো জ্ঞান ছিল না, আর তোমরা একে তুচ্ছ জ্ঞান করেছিলে, আল্লাহর দৃষ্টিতে তা ছিল গুরুতর বিষয়।

৬. আর তোমরা তা শ্রবণ করলে, তখন কেন বললে না, এ বিষয়ে তোমাদের বলাবলি করা উচিত নয়। আল্লাহ্ পবিত্র ও মহান। এ এক জঘন্য অপবাদ।

৭. আল্লাহ্ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যদি বিশ্বাসী হও তবে কখনো এরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করো না।

৮. আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বীয় আয়াতগুলো সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও বিজ্ঞানময়।

৯. যারা বিশ্বাসীদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, তাদের জন্য রয়েছে ইহলোক ও পরলোকে কঠোর শাস্তি। আল্লাহ্ জানেন কিন্তু তোমরা জাননা।

১০. তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউ অব্যাহতি পেত না এবং আল্লাহ্ দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু।

Contents

১১. হে মু'মিনগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। কেহ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে শয়তান তো অশ্লীলতা ও মন্দ কার্যের নির্দেশ দেয়। আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউ কখনো পবিত্র হতে পারতে না, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করে থাকেন এবং আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।" (সূরা আন নূর : আয়াত-১১-২১)

আয়েশা (রা) বললেন, মা তখন আমাকে বললেন ওঠো মা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শুকরিয়া আদায় কর। আমি বললাম, আমি রাসূল ﷺ শুকরিয়া আদায় করবো না। আমি তো সেই মহান প্রভুর শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি আমার নির্দোষিতা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের আয়াত নাযিল করেছেন। আপনারা তো এ বানোয়াট অপবাদ ও অভিযোগকে মিথ্যা ঘোষণা করেন নি। (বুখারী)

এ ওহী নাযিলের পর মু'মিনদের মনে শান্তি ফিরে এল। রাসূল ﷺ-এর নির্দেশে অপবাদকারী তিনজন মুনাফিক প্রত্যেককে আশিটি করে দোররা মারা হল। কিন্তু মূল আসামী আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে শাস্তি না দিয়ে রাসূল ﷺ তার বিচারের ভার আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিলেন।

ইফ্‌ক এর এ ঘটনাকে পুঁজি করে পাশ্চাত্যের ইসলাম বিদ্বেষী একটা মহল আয়েশা (রা) এর বিষয়ে সমালোচনার অপপ্রয়াস চালানোর চেষ্টা করেছে। অথচ আল্লাহ প্রদত্ত আয়েশা (রা)-এর চারিত্রিক সনদ এলে তাদের মিশন প্রাথমিক পর্যায়েই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আল্লাহর কোন কাজ-ই অন্তসার শূন্য নয়, বরং সবকিছুর পশ্চাতেই একটা উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। ইফ্‌ক এর এ ঘটনা অবতারণের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হলো বিশ্ব নারী জাতিকে সকল বিপদে দৃঢ়তা অবলম্বন ও ধৈর্য ধারণের শিক্ষা দেয়া।

এ ঘটনাটি ইফকের বা অপবাদ আরোপের ঘটনা হিসেবে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে।

ইফকের ঘটনার মাত্র তিন মাস পর 'জাতুল জায়েশ' যুদ্ধে রাসূল ﷺ গমন করেন। এবারও আয়েশা রাসূল ﷺ-এর সফর সঙ্গী হন এবং তাঁর হারটি হারিয়ে যায়। বিষয়টি তিনি তৎক্ষণাৎ রাসূল ﷺ-কে জানান। ফলে রাসূল ﷺ যাত্রা বিরতির নির্দেশ দেন। হার খুঁজতে খুঁজতে ফজরের ওয়াক্ত প্রায় যায় যায় অবস্থা। এদিকে কাফেলার সাথে এক ফোঁটাও পানি ছিল না। কীভাবে সালাত আদায় করা হবে এ ব্যাপারে সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন।

আবূ বকর (রা) যথারীতি এ কাফেলার সাথে ছিলেন। তিনি বুঝলেন আয়েশার জন্য এ অবস্থা। তাই তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে রাসূল ﷺ-এর তাঁবুতে গেলেন। রাগত কণ্ঠে বললেন, 'আয়েশা! এ কি তোমার আচরণ? তোমার হারের জন্য সমগ্র কাফেলার লোকজন এক চরম বিপদের সম্মুখীন। অযু গোসলের জন্য এক বিন্দু পানিও নেই। এখন লোকজন কেমন করে ফজরের সালাত আদায় করবে? বারে বারে তুমি আমাদেরকে এ কি সমস্যায় ফেলে চলেছো?

আয়েশা (রা) টু শব্দটি পর্যন্তও করলেন না। কারণ রাসূল ﷺ তখন তাঁর কোলে মাথা রেখে চোখ বুঁজেছিলেন। তিনি মনে মনে শুধু আল্লাহর সাহায্য চাইলেন। এ সময় রাসূল ﷺ-এর নিকট ওহী নাযিল হলো–

وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْجَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ ط إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ـ

"আর যদি তোমরা পীড়িত হও কিংবা বিদেশ ভ্রমণে থাকো, কিংবা তোমাদের কেউ শৌচাগার হতে ফিরে আসে, কিংবা স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় এমতাবস্থায় পানি পাওয়া না গেলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম কর। হস্তদ্বয় ও মুখমণ্ডল মাসেহ কর, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মার্জনাকারী।" (সূরা নিসা : আয়াত-৪৩)

তায়াম্মুমের হুকুম নাযিল হওয়ায় উপস্থিত সবাই খুব খুশি হয়ে আয়েশা (রা) ও আবূ বকর (রা)-এর প্রশংসা করতে লাগলো। রাসূল ﷺ ও খুশি মনে সকলকে নিয়ে তায়াম্মুম করে জামা'আতের সাথে ফজর সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষে যাত্রা করার উদ্দেশ্যে আয়েশা (রা)-কে বহনকারী উট উঠে দাঁড়াতেই দেখা গেল তাঁর হার সেখানে পড়ে আছে। হার পাওয়াতে আবূ বকর (রা) নিজ কন্যার কাছে এসে বললেন, মা আয়েশা! আমি জানতাম না তুমি এতই পুণ্যবতী। তোমাকে কেন্দ্র করে আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মদীর প্রতি যে রহমতের ধারা বর্ষণ করেছেন, তার জন্য হাজারো শোকর। আল্লাহ তোমাকে দীর্ঘায়ু দান করুন।

২. ঈলার ঘটনা

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীদের জন্য খাদ্য ও খেজুরের যে পরিমাণ ছিল, প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল নেহায়েত অপ্রতুল। তাঁরা অভাবের মধ্যে দিনাতিপাত করতেন। এদিকে ৯ম হিজরী বা আহযাব ও বনু কুরায়জার সমসাময়িককালে আরবের দূর-দূরান্তে ইসলামের বাণী ছড়িয়ে পড়েছিল। যুদ্ধের পর যুদ্ধ বিজয়, বার্ষিক আমদানী বৃদ্ধি এবং পর্যাপ্ত গনীমতের মাল সঞ্চয় হতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে অর্থ-সম্পদের আধিক্য দেখে তাঁরা (নবী পত্নীগণ) সমস্বরে তাঁদের জন্য নির্ধারিত বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধির আবেদন জানালো। আবু বকর সিদ্দীক (রা) ও ওমর (রা) তাঁদের কন্যাদ্বয় যথাক্রমে আয়েশা ও হাফসা (রা)-কে বুঝিয়ে এ দাবী থেকে বিরত রাখেন।

অপরদিকে অন্যান্য স্ত্রীগণ তাঁদের দাবীর ওপর অটল থাকলেন। ঘটনাক্রমে এ সময় মহানবী ﷺ ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যান এবং পাজরে গাছের একটি মূলের সাথে ধাক্কা লেগে আঘাতপ্রাপ্ত হন। (সুনানে আবু দাউদ) স্ত্রীদের এ দাবীতে তিনি অসন্তুষ্ট হন। আয়েশা (রা)-এর হুজরা সংলগ্ন 'আল-মাশরাবা' নামক গৃহে অবস্থান নেন এবং এক মাস পর্যন্ত কোন স্ত্রীর কাছে না যাওয়ার কসম বা শপথ করেন। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে কুচক্রী মুনাফিকরা সমাজে রটিয়ে দেয় যে, রাসূল ﷺ তাঁর স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়েছেন। এ কথা শুনে সাহাবীগণ অস্থির হয়ে পড়েন। তাঁরা মসজিদে নববীতে সমবেত হন। রাসূল ﷺ-এর স্ত্রীগণ অত্যন্ত বিমর্ষ ও চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু কেউই রাসূল ﷺ পর্যন্ত যাওয়ার সাহস করলেন না।

ওমর (রা) মসজিদে নববীতে এসে ব্যথাতুর অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। দু'বার সাড়া না পেয়ে তৃতীয় বারের মাথায় অনুমতি পেয়ে ঘরে ঢুকলেন। দেখলেন মহানবী ﷺ একটি চৌকির উপর শুয়ে আছেন, তাঁর শরীর মুবারকে মোটা কম্বলের দাগ পড়ে গেছে। ওমর (রা) ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন সেখানে কয়েকটি মাটির পাত্র ও শুকনো মশক বৈ কিছুই নেই। এ দৃশ্য দেখে ওমর (রা)-এর চক্ষু অশ্রু সিক্ত হয়ে পড়ল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আপনি কি আপনার স্ত্রীদেরকে তালাক দিবেন? নবী ﷺ বললেন, না। ওমর (রা) এ সুসংবাদ লোকদের কে শুনিয়ে দিলেন। ফলে সকল মুসলমান এবং নবী পত্নীগণ চিন্তামুক্ত হন।

আয়েশা (রা) বলেন, আমি এক এক করে দিন গুণতে ছিলাম। ২৯ দিন পূর্ণ হলে নবী ﷺ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সর্বপ্রথম আমার গৃহে আগমন করেন। আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো এক মাসের শপথ করেছিলেন, আজতো ঊনত্রিশ দিন হয়েছে। নবী ﷺ বলেলেন : মাস ঊনত্রিশ দিনেও হয়। (মুসলিম)

৩. তাখাইয়্যিরের ঘটনা

ঈলার ঘটনার পর তাখাইয়্যিরের ঘটনা ঘটে। তাখঈর অর্থ ইখতিয়ার বা স্বাধীনতা দান করা।

পার্থিব ভোগ-বিলাসিতা দ্বারা নিজেকে কুলষিত করতে একদিকে যেমন নবী ﷺ নারাজ ছিলেন অন্যদিকে তাঁর স্ত্রীগণ জীবন যাপনের মান বৃদ্ধির জন্য দাবী জানিয়েছিলেন। এ পরিস্থিতিতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন : এ ঘটনা থেকে মুসলিম নারী সমাজ দাম্পত্য জীবনে ধৈর্যধারণ ও পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় রাখার শিক্ষা পান।

يَـا اَيُّـهَا النَّبِـىُّ قُـلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُـنَّ تُـرِدْنَ الْحَيٰـوةَ الـدُّنْـيَا وَ زِيْـنَـتَـهَـا فَـتَـعَـالَـيْـنَ اُمَـتِّـعْـكُـنَّ وَ اُسَـرِّحْـكُـنَّ سَرَاحًـا جَـمِـيْـلاً، وَاِنْ كُـنْـتُـنَّ تُـرِدْنَ الـلّٰـهَ وَ رَسُـوْلَـهٗ وَ الـدَّارَ الْاٰخِـرَةَ فَـاِنَّ الـلّٰـهَ اَعَـدَّ لِـلْـمُـحْـصَـنَـاتِ مِـنْـكُـنَّ اَجْـرًا عَـظِـيْـمًـا ـ

"হে নবী আপনি স্ত্রীদেরকে বলুন, তোমরা যদি দুনিয়া ও তার চাকচিক্য পেতে চাও তবে এসো, আমি তোমাদেরকে কিছু দিয়ে সুন্দরভাবে বিদায় করে দেই। আর যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং আখিরাতের গৃহ ভাল মনে কর, তবে তোমাদের মধ্যে যে নেককার তাঁর জন্য আল্লাহ বিরাট পুরস্কার ঠিক করে রেখেছেন"। (সূরা–৩৩ আহযাব : আয়াত-২৯)

অর্থাৎ আয়াতটির মূল বক্তব্য হলো : নবী পত্নীদের মধ্যে যার ইচ্ছা দরিদ্র ও অভাব অনটন মেনে নিয়ে আল্লাহ্‌র রাসূলের সাথে সংসার ধর্ম পালন করতে পারেন। আর যার ইচ্ছা তাঁকে ছেড়ে চলে যেতে পারেন।

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বপ্রথম আয়েশা (রা) -এর কাছে এসে বললেন, আজ তোমাকে একটি কথা বলছি, খুব তাড়াতাড়ি করে উত্তর না দিয়ে তোমার পিতা-মাতার সাথে জেনে স্থিরভাবে উত্তর দেবে। অতঃপর নবী

ﷺ উপরিউল্লিখিত আয়াতটি তাঁকে পাঠ করে শুনালেন এবং বললেন, আল্লাহর নিকট থেকে এ হুকুম এসেছে। তৎক্ষণাৎ আয়েশা (রা) বললেন : এ বিষয়ে আমার বাবা-মার নিকট কি জিজ্ঞেস করবো? আমি তো আল্লাহ, তদীয় রাসূল এবং পরকালের সাফল্যই প্রত্যাশী।

আয়েশা (রা)-এর এ উত্তর শুনে নবী ﷺ অত্যন্ত খুশী হলেন। তিনি বললেন, বিষয়টি তোমার নিকট যেভাবে উপস্থাপন করেছি, ঠিক সেভাবে অন্য স্ত্রীদের নিকটেও করবো। আয়েশা (রা) তাঁর সিদ্ধান্তের কথা কাউকে না জানাতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু নবী ﷺ তা রাখেন নি। তিনি বরং তাঁর অন্যান্য স্ত্রীদের নিকট আয়েশা (রা)-এর সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিলেন। (বুখারী) তাঁদের প্রত্যেকেই আয়েশা (রা)-এর মত একই উত্তর দেন। আলোচ্য আয়াত নাযিলের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ৪ জন (সাওদা, আয়েশা, হাফসা ও উম্মু সালামা) মতান্তরে ৯ জন (বাকি ৬ জন উম্মু হাবিবা, সাফিয়া, মায়মুনা, জুআইরিয়া, যয়নব বিনতে জাহাশ) স্ত্রী ছিলেন।

৪. তাহরীমের ঘটনা (হারাম করা)

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল ﷺ মধু খুব পছন্দ করতেন। এ জন্য যয়নাব (রা) তাঁকে প্রায়ই মধুর শরবত তৈরি করে দিতেন। কিন্তু একদিন আছরের পর রাসূল ﷺ যয়নব ঘর থেকে মধু খেয়ে বের হয়ে আয়েশা (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করলে আয়েশা ও হাফসা বললেন, হে রাসূল আপনার মুখে "মাগাফীর" নামক এক প্রকার দূর্গন্ধ ফলের গন্ধ আসছে। বিষয়টি আয়েশা (রা) সহ অন্যান্য নবী পত্নীদের পছন্দনীয় ছিল না। রাসূল ﷺ যখন ব্যাপারটি আঁচ করলেন, তখন তিনি আর মধু খাবেন না বলে কসম করলেন।

মহান রাব্বুল আলামীন কিন্তু তাঁর হাবীবের এ কাজটি পছন্দ করলেন না। সাথে সাথে ওহী নাযিল হল, হে প্রিয় নবী–

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَٰجِكَ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۔ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَـٰنِكُمْ ۚ وَٱللَّهُ مَوْلَىٰكُمْ ۖ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۔

"আল্লাহ যা কিছু আপনার জন্য বৈধ করেছেন, স্বীয় স্ত্রীদের প্ররোচনায় তাদের মনস্তুষ্টির জন্য হালাল বিষয়কে আপনি অবৈধ বা হারাম বলে অভিহিত কেন

করলেন? আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। আর আল্লাহ্ আপনার কসম ভঙ্গ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং তা হবে আইনসঙ্গত। আল্লাহ্ আপনার বিশ্বস্ত বন্ধু এবং তিনি সর্ব বিষয়ে সুপরিজ্ঞাত।" (সূরা তাহরীম : আয়াত-১-২)

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূল ﷺ আবার মধু পান করা শুরু করলেন। (তারপর রাসূল ﷺ কসমের কাফফারা আদায় করেন) আয়েশা ও হাফসাসহ অন্যান্য নবীপত্নীগণ এ বিষয়ে রাসূল ﷺ-এর নিকট ক্ষমা চাইলেন। তিনি সকলকে ক্ষমা করে দিলেন। এ ঘটনা 'তাহরীম' এর ঘটনা হিসেবে পরিচিত।

যেহেতু এ ঘটনা বহুলাংশে হাফসা (রা)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট। তাই তাঁর সম্পর্কে আলোচনার স্থানে এ বিষয়টি আলোকপাত করা হয়েছে। আয়েশা (রা)-এর জীবনে সংঘটিত উপরিউক্ত প্রতিটি ঘটনাই প্রকারান্তে তাঁর ইযযত ও সম্মান বৃদ্ধি করেছে। যা গোটা মানব জাতিকে বহুবিদ কল্যাণের পথ দেখিয়েছে। উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) ছিলেন বিশ্ব নারী জাতির জন্য গর্ব, আদর্শ ও আলোকবর্তিকা স্বরূপ।

সচেতন আয়েশা : আয়েশা (রা) অন্ধ অনুকরণের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি সবকিছু যাচাই– বাছাই করে তারপর গ্রহণ করতেন। রাসূল ﷺ-এর সময়ে মেয়েরা মসজিদে গিয়ে পুরুষদের পেছনে সালাত আদায়ের অনুমতি ছিল। কিন্তু রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকালের পর তৎকালীন সময়ের মেয়েদের চলাফেরা দেখে আয়েশা (রা) বেশ রাগের সাথে বলেছিলেন, 'রাসূল ﷺ যদি জানতেন, নারীদের কি দশা হবে, তা হলে তিনি বনী ইসরাঈলের মতো নারীদেরকে মসজিদে আসতে নিষেধ করতেন।'

কা'বা শরীফের চাবিধারী ওসমান (রা) একবার এসে আয়েশা (রা)-কে বললেন, 'কা'বা শরীফের গেলাফ নামানোর পর তা দাফন করা হয়েছে। যেন মানুষের নাপাক হাত তা স্পর্শ করতে না পারে।' আয়েশা বললেন, 'এটাতো কোন যুক্তিযুক্ত কথা হলো না। গেলাফ খুলে ফেলার পর যার ইচ্ছে তা ব্যবহার করতে পারে। তুমি তা বিক্রি করে গরীব-দুঃখীদের মধ্যে তার মূল্য বিতরণ করে দাওনা কেন?'

আয়েশার প্রতি রাসূল ﷺ-এর ভালবাসা : আয়েশা (রা) সে সৌভাগ্যবান উম্মাহাতুল মু'মিনীন যাঁর কোলে মাথা রেখে রাসূল ﷺ ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব থেকে অসুস্থাবস্থায় নবী করীম ﷺ আয়েশার গৃহেই ছিলেন, এমন

কি তাঁর গৃহেই রাসূল ﷺ-কে দাফন করা হয়। পরবর্তীকালে আবূ বকর (রা) ও ওমর (রা)-কেও রাসূল ﷺ-এর পাশে অর্থাৎ আয়েশার গৃহে দাফন করা হয়।

আসলে রাসূল ﷺ অন্যান্যদের তুলনায় আয়েশা (রা)-কে একটু বেশিই ভালবাসতেন। তিনি নিজেই বলেছেন, 'হে আল্লাহ! যা কিছু আমার আয়ত্তাধীন, (অর্থাৎ স্ত্রীদের মধ্যে সাম্য বজায় রাখা) সে ক্ষেত্রে ইনসাফ থেকে যেন আমি বিরত না থাকি, আর যা আমার আয়ত্তের বাইরে (অর্থাৎ আয়েশার মর্যাদা ও ভালবাসা) তা ক্ষমা করে দাও। (আবূ দাউদ)

আমর ইবনুল আস (রা) নবীজীকে জিজ্ঞেস করেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! দুনিয়ায় আপনার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি কে? রাসূল ﷺ বললেন, আয়েশা। তিনি বললেন, আমি জানতে চাচ্ছি পুরুষদের মধ্যে কে সবচেয়ে প্রিয়। জবাব দিলেন, আয়েশার পিতা অর্থাৎ আবূ বকর (রা)।'

আয়েশা (রা)ও প্রাণ দিয়ে রাসূল ﷺ-কে ভালবাসতেন। নবীজী ইন্তেকালের সময় যে পোশাক পরিহিত ছিলেন পরবর্তীকালে আয়েশা তা যত্ন সহকারে হেফাযত করেন। একদিন তিনি জনৈক সাহাবাকে নবীজীর কম্বল ও তহবন্দ (লুঙ্গি জাতীয়) দেখিয়ে বলেন, 'খোদার কসম, এ কাপড় পরিধান করে রাসূল ﷺ ইন্তেকাল করেছেন।' জীবনের শুরুতেই আয়েশা (রা) বিধবা হন, এরপর তিনি ৪৮ বছর জীবিত ছিলেন। এ ৪৮ বছর তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে রাসূলের রেখে যাওয়া কাজের তদারকি করেছেন।

রাসূল ﷺ-এর ওফাতের পর আবূ বকর (রা)-এর খেলাফাতকে স্বীকার করে বাই'আতকালে নবী পত্নীগণ উসমানের মাধ্যমে মীরাছি দাবি করার উদ্যোগ নিলে আয়েশা (রা) সকলকে স্মরণ করে দিয়ে বলেন, 'রাসূল ﷺ বলে গেছেন, কেউ আমার ওয়ারিশ হবে না। আমার রেখে যাওয়া জিনিস হবে ছদকা।'

আয়েশা (রা) পোশাক পরিচ্ছদ পরার ব্যাপারে খুব সতর্কতা অবলম্বন করতেন। একবার তাঁর ভাইঝি হাফছা বিনতে আবদুর রহমান পাতলা ওড়না পরে তাঁর সামনে আসলে তিনি ওড়নাটি ছুড়ে ফেলে বলেন, 'সূরা নূর-এ আল্লাহ তা'আলা কি বলছেন, তুমি কি পড়নি?' এরপর একটা মোটা কাপড়ের ওড়না তাকে দেন।

আয়েশা (রা) কোনো এক বাড়িতে একবার বেড়াতে যান। সেখানে বাড়ির মালিকের দু'জন মেয়েকে চাদর ছাড়াই সালাত পড়তে দেখে বলেন, 'আগামীতে বিনা চাদরে কখনো সালাত পড়বে না।'

পরামর্শক আয়েশা (রা) : আবু বকর (রা)-এর আমল থেকে আয়েশা (রা) বিভিন্ন জটিল বিষয়ে সাহাবাদেরকে পরামর্শ দিতেন। এ সময় থেকেই তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর হাদীস বর্ণনা করতে থাকেন এবং ফতোয়া দেয়া শুরু করেন।

ওমর (রা)-এর শাসনামলে যখন তিনি খালিদ বিন ওয়ালিদকে সেনাপতির পদ থেকে পদচ্যুত করেন, তখন এ সংবাদ পাওয়ার পর আয়েশা (রা) খলিফাকে পরামর্শ দেন খালিদকে সাধারণ সৈনিক হিসেবে রাখার জন্য। তা না হলে বিশৃংখলা দেখা দিতে পারে বলে তিনি আংশকা করছিলেন। ওমর (রা) মা আয়েশার কথা অনুযায়ী কাজ করেন।

মিসর অভিযানে আমর ইবনুল আস যখন সুবিধা করতে পারছিলেন না, তখন আয়েশা (রা) ওমর (রা)-কে তাড়াতাড়ি জোবায়েরের নেতৃত্বে নতুন সৈন্য বাহিনী মিসরে পাঠানোর পরামর্শ দেন। খলিফা সে অনুযায়ী কাজ করলেন। ফলে অল্পদিনেই মিসর মুসলমানদের পদানত হয়।

ইরাক বিজয়ের পর গণীমতের মালের মধ্যে এক কৌটা মণি-মুক্তা পাওয়া যায়। রাসূল ﷺ-এর প্রিয় স্ত্রী হিসেবে আয়েশা (রা) বলেন, 'রাসূল ﷺ-এর পর খাত্তাবের পুত্র ওমর আমার প্রতি বিরাট অনুগ্রহ করছেন। হে আল্লাহ, তাঁর দানের জন্য আগামীতে আমাকে বাঁচিয়ে রেখো না।'

ওমর (রা)-এর খিলাফতকালে উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের সকলকে বার্ষিক দশ হাজার দিরহাম বৃত্তি মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু আয়েশা (রা)-এর জন্য বার হাজার দিরহাম ধার্য করা হয়। এর কারণ উল্লেখ করে ওমর (রা) বলেন, ' আয়েশা (রা) ছিলেন নবীজীর অতি প্রিয়।'

মৃত্যুর আগে ওমর (রা)-এর পুত্র আবদুল্লাহকে আয়েশা (রা)-এর নিকট পাঠান তাঁর লাশ রাসূল ﷺ-এর পাশে দাফন করার অনুমতির জন্য। আবেদন পেশ করলে আয়েশা (রা) বলেন, 'স্থানটি আমার নিজের জন্য রাখলেও ওমরের জন্য তা আনন্দের সাথে ত্যাগ করছি।'

আয়েশা (রা)-এর অনুমতি পাওয়ার পরও ওমর (রা) ওছিয়াত করে যান, 'আমার মৃতদেহ আস্তানার সামনে রাখবে। অনুমতি পাওয়া গেলে ভেতরে দাফন করবে, অন্যথায় সাধারণ মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করবে।' সে অনুযায়ী কাজ করা হয়। আয়েশা (রা)-এর অনুমতি পাওয়ার পর হুজরার ভেতর ওমর (রা)-এর লাশ দাফন করা হয়।

ওসমান (রা)-এর খিলাফতকালে বিভিন্ন বিষয়ে আয়েশা (রা)-এর নিকট থেকে যুক্তি পরামর্শ গ্রহণ করা হতো এবং সে অনুযায়ী কাজ করা হতো। তাঁর সময়ের প্রথম দিকে রাজ্যে হট্টগোল দেখা দিলে মুহাম্মদ বিন আবূ বকরসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ খলিফার পদত্যাগের দাবি নিয়ে আয়েশার কাছে আসেন। আয়েশা (রা) বলেন, 'না, তা হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি ওসমানের হাতে খেলাফতের দায়িত্ব আসে তাহলে সে যেন তা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ না করে।'

ওসমান (রা)-এর খেলাফাতের শেষ দিকে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে দুঃশাসনের অভিযোগ উঠলে আয়েশা (রা)-এর পরামর্শ অনুযায়ী তাদেরকে রাজধানীতে তলব করা হয় এবং গভর্নরদের পেশকৃত দলিল-দস্তাবেজ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় একটি তদন্ত কমিটির মাধ্যমে। এ তদন্ত কমিটিও আয়েশা (রা)-এর পরামর্শে গঠিত হয়।

ইসলাম প্রচারের শুরু থেকেই মুনাফিকরা আল্লাহ, রাসূল ﷺ ও ইসলামের বিরুদ্ধে কাজ করে আসছিল। ওসমান (রা)-এর সময়ে এসে তারা খুবই সুকৌশলে কাজ শুরু করে এবং ওসমান (রা)-এর শাহাদাতের ফলে তা আরো বিস্তৃতি লাভ করে। আলী (রা) এমনি এক দুঃখজনক পরিস্থিতিতে মুসলিম বিশ্বের খলীফা হন। খিলাফাত প্রাপ্তির পর পরই তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয় ওসমান হত্যার বিচার করার জন্য।

কিন্তু ঘটনা এমন ছিল যে, হত্যাকারী কে বা কারা তা সঠিক করে কেউ জানতো না। ওসমান (রা)-এর স্ত্রী নাইলা ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কাউকে চিনতে পারেন নি। ফলে কাউকে সাজা দেয়া যাচ্ছিল না। চক্রান্তকারীরা এ সুযোগটিই গ্রহণ করলো। তাদের প্ররোচনায় কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবাও ওসমান হত্যার বিচার দাবি করলেন। এদের মধ্যে আয়েশা, তালহা ও যুবাইর (রা)-এর মত লোকও ছিলেন। তাঁরা আয়েশার নেতৃত্বে মক্কা থেকে বসরার দিকে যাত্রা করেন, সেখানে ওসমান হত্যার বিচার দাবিকারীদের সংখ্যা ছিল বেশি। এহেন সংবাদে আলী (রা) সেনাদলসহ সেখানে পৌছান এবং দু'বাহিনী মুখোমুখি অবস্থান নেয়। যেহেতু উভয়পক্ষ সততার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, ফলে আলাপ আলোচনার পর বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়।

কিন্তু চক্রান্তকারীরা এ ধরনের পরিস্থিতির পক্ষে ছিল না। তাই তারা অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে রাতের আধারে এক পক্ষ অপর পক্ষের ওপর আক্রমণ চালায়, আর প্রচার করতে থাকে যে অপর পক্ষ সন্ধির সুযোগ নিয়ে অন্যায়ভাবে আক্রমণ

করেছে। এতে যুদ্ধ বেধে যায় এবং আরো ভয়াবহ রূপ নেয়। উভয়পক্ষে প্রচুর শহীদ হন। শেষ পর্যন্ত আলী জয়লাভ করেন এবং আয়েশা (রা)-কে সসম্মানে মদীনা পাঠিয়ে দেন।

এ যুদ্ধে আয়েশা (রা) উটে আরোহণ করে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন বলে ইতিহাসে এটা জঙ্গে জামাল বা উষ্ট্রের যুদ্ধ নামে পরিচিত।

আয়েশা (রা)-এর বদান্যতা : আমীর মু'আবিয়ার শাসনামলে আয়েশা (রা)-এর খেদমতে তিনি এক লক্ষ দিরহাম উপহারস্বরূপ পাঠিয়েছিলেন। আয়েশা (রা) ঐদিন সন্ধ্যার আগেই পুরো এক লক্ষ দিরহাম গরীব মিসকীনদের মধ্যে দান করে দিলেন। ঐদিন তিনি রোযা ছিলেন। কিন্তু তিনি ইফতার করার জন্যেও কিছু রাখেন নি। তাই তার দাসী আরজ করলো, 'ইফতারের জন্য তো কিছু রাখা প্রয়োজন ছিল।' উত্তরে আয়েশা (রা) বললেন, 'মা! তোমার এ বিষয়ে পূর্বে আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া উচিত ছিল।'

আয়েশা (রা)-এর বৈশিষ্ট্য : আয়েশা (রা) অনেক ক্ষেত্রে অনেকের চেয়ে বিশিষ্ট ছিলেন। উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের মধ্যে তাঁর ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। তিনি নিজেই বলেন, 'এটি আমার অহংকার নয়, বরঞ্চ প্রকৃত ঘটনা এই যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অনেকগুলো কারণে দুনিয়ার সকলের চেয়ে আমাকে বিশেষভাবে সম্মানিতা করেছেন। তারই কথা–

১. আমার বিবাহের পূর্বে আমার ছবি ফেরেশ্তাগণ রাসূলুল্লাহ্র সামনে রেখেছিলেন।
২. যখন আমার ৬/৭ বছর বয়স তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমায় বিয়ে করেছিলেন।
৩. ৯/১০/১১ বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাড়িতে পদার্পণ করেছি।
৪. আমি ছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন স্ত্রী কুমারী ছিল না।
৫. রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আমার নিকট একই বিছানায় থাকতেন তখন প্রায়ই তাঁর ওপর ওহী নাযিল হতো।
৬. আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রিয়তমা স্ত্রী ছিলাম।
৭. আমাকে লক্ষ্য করে সূরা নূরের এবং তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয়েছে।
৮. আমি চর্মচক্ষে দু'বার জিবরাঈল (আ)-কে দেখেছি।
৯. রাসূলুল্লাহ ﷺ আমারই কোলে পবিত্র মাথা রেখে ইন্তেকাল করেছেন।

১০. আমি রাসূল ﷺ-এর খলিফার কন্যা এবং সিদ্দিকা। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে যাদেরকে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকার ওয়াদা দিয়েছেন, আমি তাদেরও অন্যতম।

আয়েশা (রা) ছিলেন একজন মহৎ হৃদয়ের মানুষ। কবি হাসসান বিন সাবিত ইফকের জঘন্য অপবাদকারীদের মধ্যে শামিল ছিলেন। তবুও কবি সাবিত যখন আয়েশা (রা)-এর মজলিসে আসতেন তিনি সাদরে তাকে বরণ করে নিতেন। অন্যরা সাবিতের কৃতকর্মের জন্য সমালোচনা ও নিন্দা করলে তিনি বলতেন, 'তাকে মন্দ বলো না। সে বিধর্মী ও পৌত্তলিক কবিদের কবিতার উত্তর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে প্রদান করতো।'

আয়েশা (রা)-এর ছিল প্রচণ্ড সাহস ও আত্মিক মনোবল। যে কারণে তিনি ওহুদ যুদ্ধের সময় আহতদের সেবা করতে পেরেছিলেন। তিনি সেখানে দৌড়াদৌড়ি করে মশক (কলস জাতীয় চামড়ার তৈরি এক প্রকার পানির পাত্র) কাঁধে নিয়ে তৃষ্ণার্তদের পানি পান করিয়েছিলেন। তিনি উষ্ট্রের যুদ্ধের এক পক্ষের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এমনিতেও তিনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশগ্রহণের প্রবল ইচ্ছা পর্যন্ত প্রকাশ করেছেন। রাতের বেলা তিনি একাকী কবরস্থানে গমন করতেন।

রাসূল ﷺ জীবিত থাকতে তিনি তাঁর সাথে রাতের বেলা তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতেন। অধিকাংশ দিন তিনি রোযা রাখতেন।

ইশরাকের সালাত সম্বন্ধে আয়েশা (রা) নিজে বলেছেন, 'আমি নবীজীকে কখনো ইশরাকের সালাত পড়তে না দেখলেও আমি নিজে তা পড়ি। তিনি অনেক কিছু পছন্দ করতেন, উম্মতের ওপর ফরয হয়ে যাবে এ আশংকায় তদনুযায়ী আমল করতেন না।'

আয়েশা (রা)-এর পাণ্ডিত্য : আয়েশা (রা)-এর পাণ্ডিত্যের বিবরণ শুনলে অবাক হতে হয়। তিনি কুরআন, হাদীস, ফিকাহ, উসূল, ইজমা, কিয়াস, সাহিত্য, ইতিহাস, রসায়ন, চিকিৎসা বিদ্যা ইত্যাদি নানা বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি শিক্ষকতা ও বক্তৃতায় পারদর্শী ছিলেন। এক পরিসংখ্যানে জানা যায় তাঁর ছাত্র সংখ্যা ছিল কমপক্ষে বার হাজার।

এ জন্যই আয়েশা (রা) সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেছেন, 'শরীয়তের অর্ধেক বিদ্যাই তোমরা ঐ রক্তাভ গৌরবর্ণা মহিয়সীর নিকট থেকে শিখতে পারবে।'

আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বলেন, 'সাহাবী হিসেবে আমাদের সামনে এমন কোনো কঠিন বিষয় উপস্থিত হয়নি, যা আয়েশাকে জিজ্ঞেস করে তাঁর কাছে কিছু জানতে পারিনি।'

বিশিষ্ট সাহাবী আবূ সালমা ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ বলেন, 'আয়েশার চেয়ে সুন্নাতে নববীর বড় আলেম, দ্বীনের সূক্ষ্মতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ, কালামে মজীদের আয়াতের শানে নুযূল এবং ফারায়েয সম্পর্কে বেশি জ্ঞানের অধিকারী আর কাউকে দেখিনি।'

আতা ইবনে আবূ রেবাহ তাঁর সম্বন্ধে বলেন, ' আয়েশা ছিলেন সবচেয়ে বড় ফকীহ, সবচেয়ে উত্তম মানুষ এবং লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সুস্থ মতের অধিকারিণী।

ইমাম যুহরী বলেন, 'সকল পুরুষ এবং উম্মুল মু'মিনীনদের সকলের ইলম একত্র করা হলেও আয়েশার ইলম হবে তাদের সবার চেয়ে বেশি।"

হাদীস শাস্ত্রে আয়েশা (রা)-এর অবদান : আয়েশা (রা) মোট ২২১০ টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে ১৭৪ টি হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম ঐকমত্যে পৌছেছেন। ইমাম বুখারী (র) তাঁর কাছ থেকে এককভাবে ৫৪টি হাদীস এবং ইমাম মুসলিম (র) ৬৮টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। সাহাবী ও তাবেয়ী মিলে মোট দুই শতাধিক রাবী আয়েশা (রা)-এর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মাসরুক, আসওয়াদ, ইবনুল মুসাইয়িব, উরওয়াহ, কাসেম প্রমুখ সাহাবিগণ। কারো মতে তিনি শরীয়তের এক-চতুর্থাংশ নির্দেশাবলী বর্ণনা করেছেন। নিচে তাঁর থেকে বর্ণিত কিছু হাদীস উল্লেখ করা হল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যক্তিসত্তা বিষয়ক

١. عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ (رضى) قُلْتُ بِأَيِّ شَيْءٍ يَبْدَأُ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ ؟ قَالَتْ : بِالسِّوَاكِ.

১. শুরাইহ বলেন : আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী ﷺ ঘরে এসে কোন কাজটি প্রথম করতেন। তিনি বললেন : মিসওয়াক।

(মুসলিম : হাদীস নং-৫৯০)

٢. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : كَانَ شَعْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ فَوْقَ الْوَفْرَةِ دُوْنَ الْجُمَّةِ ـ

২. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথার চুল কানের লতির উপরে এবং অল্প নিচ পর্যন্ত থাকতো। (আবু দাউদ : হাদীস নং-৪১৮৭)

٣. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : مَاشَبِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ خُبْزِ شَعِيْرٍ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتّٰى الْمَوْتِ ـ

৩. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যু অবধি ক্রমাগত দু'দিন পেট ভরে রুটি খেতে পারেন নি। (তিরমিযী)

٤. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ ـ

৪. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত প্রতি রমযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন। (তিরমিযী : হাদীস নং-৮০৩)

٥. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : مَاضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَادِمًا لَهُ وَ لاَ اِمْرَاَةً وَّلاَ ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا ـ

৫. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চাকর এবং কোন স্ত্রীকে মারেননি। এমন কি তিনি স্বীয় হস্তে কোন বস্তুকে প্রহার করেন নি। (ইবনে মাজাহ)

পারিবারিক প্রসঙ্গে

٦. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَهَا اُرِيْتُكِ فِى الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ اَرٰى اَنَّكِ فِى سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيْرٍ وَيَقُوْلُ هٰذِهِ اِمْرَاَتُكَ فَاَكْشِفُ عَنْهَا فَاِذَا هِىَ اَنْتِ فَاَقُوْلُ اِنْ يَّكُ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ يُمْضِهِ ـ

৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ তাকে বলেছেন, বিয়ের পূর্বে স্বপ্নের মাঝে দু'বার তোমাকে আমায় দেখানো হয়েছে। আমি স্বপ্নে দেখি যে, তুমি একখণ্ড রেশমী বস্ত্রে আচ্ছাদিতা। আমাকে বলা হলো, ইনি আপনার স্ত্রী। তারপর আমি তার মুখাবরণ উন্মোচন করে দেখি যে, সে তুমিই। তখন আমি মনে মনে বললাম, এ স্বপ্ন যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তবে তা তিনি কার্যকর করবেনই। (বুখারী : হাদীস নং-৬২৮৩; আবু দাউদ)

٦. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّهَا قَالَتْ : كُنْتُ اَكُوْنُ نَائِمَةً وَ رِجْلاَىَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَيُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ، فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّسْجُدَ ضَرَبَ رِجْلَىَّ، فَقَبَضْتُهَا فَسَجَدَ ـ

৬. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি ঘুমিয়ে থাকতাম। আমার পা দু'টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে থাকতো। তিনি রাতের সালাত পড়তেন। যখন সিজদা করতে চাইতেন আমার পায়ে খোচা দিতেন। আমি পা সংকোচিত করে নিতাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সিজদা করতেন। (আবু দাউদ)

٧. ٤. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ حَىَّ اللَّيْلَ وَشَدَّ الْمِيْزَرَ وَاَيْقَظَ اَهْلَهُ ـ

৭. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রমযান মাসের শেষ দশক আসলেই নবী ﷺ রাত্রি জেগে ইবাদত করতেন, তাঁর কোমর শক্তভাবে বেঁধে নিতেন এবং তাঁর পরিবার-পরিজনকে (ইবাদতের জন্য) জাগাতেন। (আবু দাউদ)

٨. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لاَهْلِهِ، وَاَنَا خَيْرُكُمْ لاَهْلِىْ ـ

৮. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই উত্তম যে তার পরিবারের কাছে উত্তম। আর আমি আমার পরিবারের নিকট উত্তম। (তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৮)

٩. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ يَّقُوْمَ عَنِ الطَّعَامِ حَتّٰى يَرْفَعَ ـ

৯. আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মেযবানকে মেহমানের খাওয়া শেষ হওয়ার পূর্বে খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন।

(সুনানে ইবনে মাজাহ, পৃ. ১৩৭।)

١٠. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ :دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ الْبَيْتَ فَرَاٰى كَسْرَةً مُلْقَاةً فَاَخَذَهَا فَمَسَّحَهَا ثُمَّ اَكَلَهَا ـ وَ قَالَ يَا عَائِشَةُ اَكْرِمِىْ كَرِيْمًا، فَاِنَّهَا مَا نَفَرَتْ عَنْ قَوْمٍ قَطُّ فَعَادَتْ اِلَيْهِمْ ـ

১০. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ একদা ঘরে প্রবেশ করে উল্টো করে ফেলে রাখা একটি খাবারের পাত্র দেখে তা হাতে উঠিয়ে নিলেন এবং তা মুছে খেয়ে ফেললেন আর বললেন : হে আয়েশা (রা)! খাবারকে সম্মান কর, কেননা তা যে সম্প্রদায় হতে বিরাগ ভাজন হয়ে বেরিয়ে গেছে কোন দিন তাদের কাছে তা আর ফিরে আসে না। (তিরমিযী)

١١. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : كُنْتُ اَضَعُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةَ اٰنِيَةٍ مِّنَ اللَّيْلِ مَخْمَرَةً : اِنَاءً لِطُهُوْرِهٖ وَ اِنَاءً لِّسِوَاكِهٖ وَ اِنَاءً لِّشَرَابِهٖ ـ

১১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য তিনটি পাত্র ঢেকে রাখতাম। একটি অজুর জন্য, একটি মিসওয়াকের জন্য আর একটি পান করার জন্য। (ইবনে মাজাহ, পৃ. ৩০)

١٢. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : كُلُّ شَرَابٍ اَسْكَرُ فَهُوَ حَرَامٌ ـ

১২. আয়েশা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন : "প্রত্যেক নেশাকর পানীয়ই হারাম। (আল-বুখারী : ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮; তরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮।)

١٣. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَا مُصِيْبَةٌ تُصِيْبُ الْمُسْلِمَ اِلاَّ كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا عَنْهُ حَتّٰى الشَّوْكَةَ يُشَاكُهَا .

১৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন মুসলমানের ওপর আপতিত বিপদ তার পাপরাশি ক্ষমার কাফফারা হয়ে থাকে। এমনকি একটা কাঁটা ফুটলেও। (সহীহ্ আল-বুখারী : ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৪৩।)

١٤. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَازَالَ جِبْرَئِيْلُ يُوْصِيْنِىْ عَنِ الْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ يُوَرِّثُهُ .

১৪. আয়েশা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : জিব্রাঈল (আ) সদা-সর্বদা আমার প্রতিবেশীর ব্যাপারে অসীয়ত করেন। আমার ধারণা হচ্ছে যে, অচিরেই প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবেন। (বুখারী)

١٥. كَانَ بَيْنَ اَبِىْ سَلَمَةَ وَبَيْنَ قَوْمِهِ خُصُوْمَةٌ فِى الْاَرْضِ. وَاَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى عَائِشَةَ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهَا فَقَالَتْ : يَا اَبَا سَلَمَةَ اِجْتَنِبِ الْاَرْضَ، فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ ظَلَمَ قِيْدَ شِبْرٍ مِّنَ الْاَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ .

১৫. আবূ সালামা ও তাঁর জাতির সাথে ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে বিরোধ ছিল। আবূ সালামা (রা) আয়েশা (রা)-এর কাছে এসে তাঁকে এ বিষয়টি জানালে তিনি বললেন : হে আবূ সালামা, ঐ জমি হতে বিরত থাকো। কেননা নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি এক বিঘত জমি অন্যায়ভাবে দখল করবে, কিয়ামতের দিন উহার সাত স্তবক জমিন তার কাঁধে ঝুলিয়ে দেয়া হবে।

(মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩।)

১৬. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে দু'আ করতেন এ বলে- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَاْثَمِ وَالْمَغْرَمِ হে

আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে পাপ ও ঋণগ্রস্ততা হতে আশ্রয় চাই। জনৈক ব্যক্তি বললেন, হে রাসূল ﷺ! আপনি ঋণগ্রস্ততা থেকে বেশী পরিমাণে আশ্রয় চান কেন? নবী ﷺ বললেন : কেউ ঋণগ্রস্ত হলে কথা বলার সময় মিথ্যা বলে, ওয়াদা খিলাফ করে। (নাসাঈ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৭)

١٦. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِذَا انْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا ـ

১৭. আয়েশা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : যখন কোন স্ত্রী তার স্বামীর ঘর থেকে সৎপথে খাদ্য ব্যয় করে সে তাঁর এ দানের পুণ্য লাভ করবে। তাঁর স্বামীও উপার্জনকারী হিসেবে এর পুরস্কার পাবে। আর তা রক্ষণাবেক্ষণকারীও অনুরূপ পুণ্য লাভ করবে। কারো পুরস্কার কম করে দেয়া হবে না। (আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯২)

১৮. উরওয়া ইবনে যুবাইর (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আয়েশা (রা) তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের পর তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা) আবূ বকর (রা)-এর কাছে গিয়ে বললেন, আল্লাহর দেয়া সম্পদ হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ যা রেখে গিয়েছেন তা বণ্টন করে আমার উত্তরাধিকারের অংশ বুঝিয়ে দিন। আবূ বকর (রা) তাঁকে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : لاَنُوَرِّثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ-আমরা যা রেখে গেলাম তাঁর কোন উত্তরাধিকার হবে না, বরং তা সাদকা হিসেবে গণ্য হবে।

١٩. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) أَنَّهَا ذَكَرَتْ عِدَّةً مِّنْ مَسَاكِيْنَ، وَ قَالَ غَيْرَ : أَوْ عِدَّةً مِّنْ صَدَقَةٍ، فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِعْطِي وَلاَ تُحْصِي فَيُحْصَى عَلَيْكِ ـ

১৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি কিছু মিসকীন কিংবা কিছু সাদকা প্রসঙ্গে উল্লেখ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন : দান করে দাও, গুণে গুণে দিবে না, তাহলে তোমাকেও সাওয়াব গুণে গুণে দেয়া হবে।

(আবূ দাউদ : ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৮)

٢٠. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ اَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُوْدِ الْمَيْتَةِ اِذَا دُبِغَتْ.

২০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মৃত প্রাণীর চামড়া দাবাগত তথা পরিশোধন করে তা থেকে উপকৃত হবার অনুমতি রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রদান করেছেন। (আবূ দাউদ : ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬৯)

٢١. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَاْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِيْنَ دِيْنَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِيْنَارٍ، وَمِنَ الْاَرْبَعِيْنَ دِيْنَارًا ـ

২১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতি বিশ দীনার বা এর বেশী হলে অর্ধ দীনার এবং প্রতি চল্লিশ দীনারে এক দীনার য়াকাত হিসেবে গ্রহণ করতেন। (ইবনে মাজাহ, পৃ. ১২৮)

রাজনীতি বিষয়ক

রাজনৈতিক বলতে এখানে দ্বীন প্রতিষ্ঠাকল্পে কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে পরিচালিত বিভিন্ন যুদ্ধাভিযান ও খিলাফত সংক্রান্ত বর্ণনাকে বুঝানো হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও আয়েশা (রা) হাদীস বর্ণনা করেছেন। নিম্নে উদাহরণ স্বরূপ এ সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো–

٢٢. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : لَمَّا رَجَعَ النَّبِىُّ ﷺ مِنَ الْخَنْدَقِ وَوَضَعَ السِّلَاحَ وَاغْتَسَلَ اَتَاهُ جِبْرِيْلُ فَقَالَ : قَدْ وَضَعْتَ السِّلَاحَ وَاللّٰهِ مَا وَضَعْنَاهُ، اُخْرُجْ اِلَيْهِمْ ـ قَالَ : فَاِلٰى اَيْنَ؟ قَالَ : هٰهُنَا، وَاَشَارَ اِلٰى بَنِىْ قُرَيْظَةَ، فَخَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ اِلَيْهِمْ ـ

২২. আয়েশা (রা) বলেন : নবী ﷺ যখন খন্দক যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে যুদ্ধাস্ত্র খুলে গোসল করলেন, তখন জিব্রাঈল (আ) এসে বললেন, আপনি যুদ্ধের অস্ত্র খুলে ফেলেছেন। অথচ আল্লাহর শপথ আমরা তা খুলিনি। আপনি তাদের দিকে বের হন। নবী ﷺ বললেন, কোন দিকে বের হবো? জিব্রাঈল (আ) বনূ কুরায়জার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন : ঐদিকে। অত:পর নবী ﷺ তাদের দিকে বের হয়ে পড়লেন। (বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯০)

٢٣. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِالْاَمِيْرِ خَيْرًا جَعَلَ لَهٗ وَزِيْرَ صِدْقٍ، اِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهٗ وَ اِنْ ذَكَرَ اَعَانَهٗ ـ وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِهٖ غَيْرَ ذٰلِكَ جَعَلَ لَهٗ وَزِيْرَ سُوْءٍ اِنْ نَسِيَ لَمْ يُذَكِّرْهُ وَاِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ ـ

২৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেছেন : আল্লাহ যখন কোন নেতার কল্যাণ কামনা করেন তখন তাকে একজন সত্যবাদী মন্ত্রী (উযীর) দান করেন। যিনি তাঁকে কিছু ভুলে গেলে স্মরণ করিয়ে দেন। আর কিছু স্মরণ করতে তাকে সহায়তা করেন। অপর পক্ষে আল্লাহ যে নেতার অমঙ্গল চান, তাকে একজন খারাপ উযীর দান করেন যে তাকে ভুলে গেলেও স্মরণ করিয়ে দেয় না। আর কিছু স্মরণ করলেও তাকে সহায়তা করে না।

(আবূ দাউদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৭)

٢٤. عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ اِلٰى بَدْرٍ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرِ لَحِقَهٗ رَجُلٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ يَذْكُرُ مِنْهُ جُرْاَةً وَنَجْدَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : اَتُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ؟ قَالَ : لاَ قَالَ : اِرْجِعْ فَلَنْ اَسْتَعِيْنَ بِمُشْرِكٍ ـ

২৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বদর যুদ্ধে যাবার পথে হাররাতুল ওয়াবার নামক স্থানে যখন পৌছালেন, তখন একজন মুশরিক ব্যক্তি তাঁর সাথে সাক্ষাত করে নিজের শক্তি ও সাহসের পরিচয় দিল। অতঃপর মহানবী ﷺ বললেন, তুমি কী আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখ? সে বলল, জী

না। মহানবী ﷺ বললেন : আমি কোন মুশরিকের নিকট সাহায্য-সহযোগিতা চাইব না। (তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৪)

٢٥. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاعُثْمَانُ اِنْ وَّلاَّكَ اللّٰهُ هٰذَا الْاَمْرَ يَوْمًا فَاَرَادَكَ الْمُنَافِقُوْنَ اَنْ تَخْلَعَ قَمِيْصَكَ الَّذِىْ قَمَّصَكَ اللّٰهُ فَلاَ تَخْلَعْهُ يَقُوْلُ ذٰلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ النُّعْمَانُ : فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا مَنَعَكَ اَنْ تُعَلِّمِى النَّاسَ بِهٰذَا؟ قَالَتْ : اُنْسِيْتُهُ .

২৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উসমান (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন : হে উসমান! আল্লাহ যদি কোন দিন তোমাকে নেতৃত্ব দান করেন, তবে মুনাফিকরা আল্লাহর দেয়া নেতৃত্বের ঐ জামা তোমার থেকে খুলে নিতে চাইলে তুমি তা খুলে দিবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথাটি তিনবার বললেন। হাদীসের বর্ণনাকারী নু'মান বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম, জনগণকে এ সংবাদটি জানতে দিতে আপনাকে কোন জিনিস বারণ করল? তিনি বললেন, আমাকে (তখন তা) ভুলিয়ে দেয়া হয়েছিল। (ইবনে মাজাহ, পৃ. ১১)

٢٦. عَنِ الْاَسْوَدِ (رضى) قَالَ : ذَكَرُوْا عِنْدَ عَائِشَةَ اَنَّ عَلِيًّا كَانَ وَصِيًّا . فَقَالَتْ : مَتٰى اَوْصٰى اِلَيْهِ؟ فَلَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ اِلٰى صَدْرِىْ اَوْ اِلٰى حُجْرِىْ فَدَعَا بِطُسْتٍ فَلَقَدْ اِنْخَنَثَ فِىْ حُجْرِىْ فَمَاتَ وَمَا شَعَرْتُ بِهٖ، فَمَتٰى اَوْصٰى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

২৬. আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আয়েশা (রা)-এর নিকটে আলী (রা)-এর (কথিত) খিলাফতের ওসিয়ত সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখন খিলাফতের ব্যাপারে তাঁর প্রতি ওসিয়ত করলেন? আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে (মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে) আমার কোলে বা বুকে ঠেস লাগিয়ে রেখেছিলাম। তখন তিনি একটি গামলা আনতে বললেন। আমার

Contents

কোলের মধ্যেই গামলাটি কাত করলেন। পরে তিনি মারা যান। অথচ আমি বুঝতেও পারিনি। এমতাবস্থায় কখন তিনি ওসিয়ত করলেন?

(ইবনে মাজাহ, পৃ. ১১৭)

٢٧. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَةُ مِنْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِى الرِّبَا خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ اِلَى الْمَسْجِدِ فَقَرَاَهُنَّ عَلَى النَّاسِ -

২৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সুদ সংক্রান্ত সূরা বাকারা-এর আয়াত যখন নাযিল হলো, তখন নবী ﷺ মসজিদে গিয়ে লোকদেরকে তা শিক্ষা দিলেন। (বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ, ৬৫)

٢٨.عَنْ عَائِشَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَثَلُ الَّذِىْ يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ، وَمَثَلُ الَّذِيْ يَقْرَاُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيْدٌ فَلَهُ اَجْرَانِ -

২৮. আয়েশা (রা) মহানবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি আল কুরআন পড়ে এবং মুখস্থ করে সে মহান লিপিকারদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি পড়ে এভাবে যে, সে তা বুঝার চেষ্টা করে এবং এ ক্ষেত্রে যে বড়ই যত্নবান তার জন্য আছে দ্বিগুণ পুণ্য। (বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৩৫)

٢٩. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ اٰيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ ... اَلْاٰيَةُ) فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِذَا رَاَيْتُمُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، فَاُولٰئِكَ الَّذِيْنَ سَمَّاهُمُ اللّٰهُ، فَاحْذَرُوْهُمْ -

২৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহর এ বাণী প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হলো– "সে মহান সত্তা যিনি আপনার ওপর কুরআন নাযিল করেছেন যার কিছু আয়াত সুস্পষ্ট অর্থবোধক যেগুলো কিতাবের মূল বিষয়। অপর কিছু আয়াত অস্পষ্ট। যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে তারা ফিতনা বা বিপর্যয় সৃষ্টির লক্ষ্যে অস্পষ্ট আয়াতগুলো অন্বেষণ করে।" রাসূলুল্লাহ ﷺ

বলেন : যখন তোমরা ঐ সমস্ত লোকদেরকে দেখবে যারা অস্পষ্ট আয়াতগুলো অনুসরণ করে, জানবে তাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। তাদের থেকে সাবধান হয়ে চলো। (তিরমিযী, ২য় খণ্ড পৃ. ১২৮)

٣٠. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوٰى إِلٰى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيْهِمَا فَقَرَأَ بِهِمَا قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلٰى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ـ

৩০. আয়েশা (রা) বলেন : প্রতি রাতে বিছানায় শয়ন করার সময় নবী ﷺ দু'হাতের তালু একত্রিত করে তাতে সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস পড়ে ফুঁক দিয়ে মাথা ও মুখমণ্ডল হতে সারা শরীর তিন বার মাসেহ করতেন।

(তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৭)

٣١. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَنْفُثُ عَلٰى نَفْسِهِ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِىْ قُبِضَ فِيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ. فَلَمَّا ثَقُلَ كُنْتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ بِهِنَّ وَأَمْسَحُ بِيَدِ نَفْسِهِ بِبَرَكَتِهَا، فَسَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ كَيْفَ كَانَ يَنْفُثُ؟ قَالَ : يَنْفُثُ عَلٰى يَدَيْهِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ ـ

৩১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, মহানবী ﷺ যে অসুখে মৃত্যুবরণ করলেন তাতে আশ্রয় প্রার্থনার দু'আ দ্বারা নিজের ওপর ঝাড়-ফুঁক করছিলেন। অত:পর তিনি যখন ভারী (শক্তিহীন বিহ্বল) হয়ে গেলেন তখন আমি ঐ গুলোর দ্বারা ঝাড়-ফুঁক দিচ্ছিলাম এবং তিনি ঐসবের বরকত হাসিলের জন্য নিজের হাত বুলাচ্ছিলেন। একজন বর্ণনাকারী বলেন যে, আমি ইবন হিশাবকে জিজ্ঞেস করলাম : তাঁর ঝাড়-ফুঁক কেমন ছিল? তিনি উত্তর দিলেন যে, তিনি তাঁর দু'হাতে ফুঁক দিতেন। তারপর উহা দ্বারা মুখমণ্ডল মুছতেন।

٣٢. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اَلْحُمّٰى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرِدُوْهَا بِالْمَاءِ ـ

৩২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : জ্বর জাহান্নামের উত্তাপ থেকে হয়ে থাকে। সুতরাং পানি দিয়ে তোমরা তা ঠাণ্ডা করো।

(মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৬ ও তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭)

٣٣. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : كَانَتْ اُمِّىْ تُعَالِجُنِىْ لِلسَّمَنَةِ تُرِيْدُ اَنْ تَدْخُلَنِىْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ. فَمَا اِسْتَقَامَ لَهَا ذٰلِكَ حَتّٰى اَكَلْتُ الْقِثَاءَ بِالرُّطَبِ، فَسَمِنْتُ كَاَحْسَنَ سَمِنَةٍ ـ

৩৩. আয়েশা (রা) বলেন, আমার মা আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট প্রেরণ করার জন্য মোটা তাজা করার চেষ্টা করছিলেন। এ জন্য অনেক কিছু ভক্ষণ করলেও তাঁর উদ্দেশ্য অর্জিত হচ্ছিল না। অবশেষে পাকা খেজুরের সাথে কাকুড় মিশিয়ে খেয়ে বেশ মোটাতাজা হলাম। (ইবনে মাজাহ, পৃ. ২৩৮)

٣٤. عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ (رض) قَالَ : خَرَجْنَا وَمَعَنَا غَالِبُ بْنُ الْجَبْرِ فَمَرِضَ فِى الطَّرِيْقِ فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ وَهُوَ مَرِيْضٌ فَعَادَهُ اِبْنُ اَبِىْ عَتِيْقٍ وَقَالَ لَنَا : عَلَيْكُمْ بِهٰذِهِ الْحَبَّةَ السَّوْدَاءَ فَخُذُوْا مِنْهَا خَمْسًا اَوْ سَبْعًا فَاسْتَحِقُّوْهَا ثُمَّ اَقْطِرُوْهَا فِىْ اَنْفِهِ بِقَطَرَاتِ زَيْتَ فِىْ هٰذَا الْجَانِبِ وَفِىْ هٰذَا الْجَانِبِ فَاِنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُمْ اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِنَّ هٰذِهِ الْحَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِّنْ كُلِّ دَاءٍ اِلاَّ اَنْ يَّكُوْنَ السَّامُّ ـ

৩৪. খালিদ ইবনে সাদ (রা) বলেন, আমরা সফরে বের হলাম। গালিব ইবনে জাবের আমাদের সাথে ছিলেন। তিনি রাস্তায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাকে অসুস্থ অবস্থায় নিয়ে আমরা মদীনায় পৌছলাম। ইবনে আবু আতীক তাঁকে দেখতে

এসে বললেন, তোমাদের উচিত কালো জিরা দিয়ে তার চিকিৎসা করা। পাঁচ বা সাতটি কলো জিরার দানা নিয়ে তা পিষে তেলের সাথে মিশিয়ে নাকের দু'পাশে ফোঁটা ফোঁটা করে দিবে। কেননা, আয়েশা (রা) তাঁদেরকে বলেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, নবী ﷺ বলেছেন : এ কালো জিরা মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের প্রতিষেধক।

٣٥. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِيْ حَجْرِيْ وَأَنَا حَائِضٌ.

৩৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ঋতুবতী থাকাকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কোলে মাথা রেখে কুরআন পাঠ করতেন।

(আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১২৫)

٣٦. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : كَانَ اِحْدَانَا اِذَا كَانَتْ حَائِضًا اَمَرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ فَتَأْتَزِرُ بِإِزَارٍ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا.

৩৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাদের (নবীপত্নী) কারো মাসিক স্রাব শুরু হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে আদেশ করতেন চাদর দিয়ে নিজেকে আবৃত করে রাখতে। অত:পর তিনি তার সাথে মিলিত হতেন।

(সহীহ মুসলিম : ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪১)

٣٧. قَالَ ذَكْوَانُ مَوْلٰى عَائِشَةَ (رضى) سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا اَهْلُهَا اَتُسْتَأْمَرُ اَمْ لَا ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ تُسْتَأْمَرُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ لَهٗ فَاِنَّهَا تَسْتَحْيِيْ؟ فَقَالَ : فَذٰلِكَ اِذْنُهَا اِذَا هِيَ سَكَتَتْ.

৩৭. আয়েশা (রা)-এর গোলাম যাকওয়ান (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন : আমি রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছি যে, কোন মেয়েকে তার অভিভাবক বিবাহ দেয়ার সময় মেয়ের অনুমতি নিতে হবে কি?

নবী ﷺ বললেন, হ্যাঁ, নিতে হবে। আমি বললাম : সে মেয়ে তো লজ্জাবোধ করবে। নবী ﷺ বললেন, নীরবতা পালন করাই তার সম্মতির লক্ষণ।

(মুসলিম : ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৫)

٣٨. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِى بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٍ فَاَعْرَضَ عَنْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَ قَالَ يَا اَسْمَاءَ : اِنَّ الْمَرْأَةَ اِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيْضُ لَمْ يَصْلُحْ لَهَا اَنْ يُّرٰى مِنْهَا اِلاَّ هٰذَا وَهٰذَا، وَاَشَارَ اِلٰى وَجْهِهٖ وَكَفَّيْهِ .

৩৮. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আসমা বিনত আবূ বকর (রা) একদা পাতলা কাপড় পরিহিত অবস্থায় মহানবীর ﷺ-এর নিকট আসলে তিনি বললেন, হে আসমা! মহিলাদের যে দিন থেকে মাসিক হওয়া শুরু করে সে দিন থেকে তাদের এই এই অঙ্গ ছাড়া কিছুই দেখানো ঠিক নয়। এই বলে তিনি তাঁর মুখমণ্ডল ও হাতের কব্জিদ্বয়ের দিকে ইঙ্গিত করলেন।

(আবূ দাউদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬৭)

পবিত্রতা বিষয়ক

৩৯. আয়েশা (রা) বলেন, নবী ﷺ অপবিত্র (জুনুবী) অবস্থায় নিদ্রা যেতে ইচ্ছা করলে তিনি তার যৌনাঙ্গ ধুয়ে নিতেন এবং সালাতের অযূর ন্যায় অযূ করতেন।

৪০. খুল্লাস আল-হাজরী (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন : ঋতুস্রাব অবস্থায় আমি ও নবী ﷺ একই চাদরের নিচে ঘুমিয়েছি। নবী ﷺ-এর শরীরে বা কাপড়ে রক্ত লাগলে তিনি তা ধুয়ে সালাত পড়তেন"। (আবূ দাউদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৪)

٤١. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ لاَ يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ .

৪১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ গোসলের পর আর অযূ করতেন না। (তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯ ও নাসাঈ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯)

٤٢. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلسِّوَاكُ مُطْهِرَةٌ لِّلْفَمِ وَمَرْضَاةٌ لِّلرَّبِّ ـ

৪২. আয়েশা (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, মিসওয়াক মুখ পবিত্র করে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি আনয়ন করে। (সুনানে আন-নাসাঈ)

٤٣. عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلاَةِ وَ لَمْ يَتَوَضَّأْ قُلْتُ : مَنْ هِىَ اِلاَّ اَنْتِ فَضَحِكَتْ ـ

৪৩. উরওয়া ইবনুয যুবাইর আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কোন স্ত্রীকে চুমু দিতেন। তারপর নতুন অযূ ছাড়াই সালাতে যেতেন। উরওয়া (রা) বলেন, তিনি আর কেউ নন আপনি ছাড়া। এ কথা শুনে তিনি হাসলেন। (ইবনে মাজাহ, পৃ. ৩৮)

٤٤. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : اِذَا الْتَقَى الْخَتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، فَعَلْتُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَغَسَلْنَا ـ

৪৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যখন দুই লজ্জাস্থান মিলিত হয় তখন গোসল ফরয হয়ে যায়। আমার এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এমনটি হতো। অতঃপর আমরা গোসল করে নিতাম। (বুখারী)

ইবাদতমূলক

٤٥. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى الصُّبْحَ فِىْ غَلَسٍ فَيَنْصَرِفْنَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِيْنَ لاَ يُتَعَرَّفْنَ مِنَ الْغَلَسِ اَوْ لاَ يُعْرَفْنَ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا ـ

৪৫. আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সালাত অন্ধকার থাকতে পড়তেন। মু'মিন মহিলাগণ সালাত শেষে ফিরে আসতেন, অন্ধকারের কারণে তাদেরকে চেনা যেতো না বা তাঁরা একে অপরকে চিনতে পারতো না।

(বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২০)

٤٦. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ اِلاَّ مِقْدَارَ مَا يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَ الْاِكْرَامِ .

৪৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের সালাম ফিরানোর পর اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَ مِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَ الْاِكْرَامِ . পাঠ করা পরিমাণ সময় বসতেন।

(মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৮)

٤٧. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ اَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ اَوْ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ فَقَدْ اَدْرَكَهَا .

৪৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের এক রাক'আত এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের এক রাক'আত পেলো, সে যেন পূর্ণ ফজর ও আসরের সালাতই পেলো।

(মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২১)

٤٨. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحَبُّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ اَدْوَمُهَا وَاِنْ قَلَّ وَكَانَتْ عَائِشَةُ اِذَا عَمِلَتِ الْعَمَلَ لَزِمَتْهُ .

৪৮. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : আল্লাহর নিকট উত্তম আমল হলো যা সর্বদা করা হয়, যদিও তা কম হয়। আয়েশা (রা) যখন কোন আমল করতেন তখন তা স্থায়ীভাবে করতেন। (মুসলিম)

٤٩. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ بِهٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ شَرِّ الْغِنٰى وَالْفَقْرِ ـ

৪৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ নিম্নের বাক্যগুলো দ্বারা দু'আ করতেন : হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জাহান্নামের ফিতনা ও আযাব থেকে এবং ধনাঢ্য ও দারিদ্র্যতার অপকারিতা থেকে আশ্রয় চাই।
(আবু দাউদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৫)

٥٠. عَنْ مُعَاذَةَ اَنَّ امْرَاَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ (رضى) اَتَجْزِىْ اِحْدَانَا صَلٰوتُهَا اِذَا طَهُرَتْ فَقَالَتْ اَحَرُوْرِيَّةٌ اَنْتِ كُنَّا نَحِيْضُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَلاَيَامُرُنَابِهٖ اَوْ قَالَتْ فَلاَ نَفْعَلُهُ ـ

৫০. মু'আযা থেকে বর্ণিত যে, একটি মহিলা আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করল, মহিলারা হায়েজ থেকে পবিত্র হলে তাদের জন্য কী সালাতের কাজা আদায় করে দেয়া আবশ্যক? আয়েশা (রা) বললেন, তুমি কী খারেজী মহিলা? আমরাতো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে জীবন কাটিয়েছি, আমাদেরও ঋতুস্রাব হত অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সালাত কাজা করার জন্য কখনো বলেননি তাই আমরা কোন দিন কাজা আদায় করতাম না। (বুখারী)

٥١. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ مَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَاُ فِىْ شَىْءٍ مِّنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ جَالِسًا حَتّٰى اِذَا كَبُرَ قَرَاَ جَالِسًا حَتّٰى اِذَا بَقِىَ عَلَيْهِ مِنَ السُّوْرَةِ ثَلاَثُوْنَ اَوْ اَرْبَعُوْنَ اٰيَةً قَامَ فَقَرَاَهُنَّ ثُمَّ رَكَعَ ـ

৫১. আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রাত্রের সালাত বসে পড়তে দেখিনি। তবে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বৃদ্ধ হয়ে

গিয়েছিলেন তখন কেরাত পাঠ করার সময় বসে বসে পড়তেন। আর ত্রিশ চল্লিশ আয়াত বাকী থাকতেই দাঁড়িয়ে যেতেন এবং তা পড়ে রুকু করতেন। (মুসলিম)

٥٢. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ (رضى) قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ (رضى) عَنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَنْ تَطَوُّعِهِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّىْ فِىْ بَيْتِىْ قَبْلَ الظُّهْرِ اَرْبَعًا ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّىْ بِالنَّاسِ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ وَيَدْخُلُ بَيْتِىْ فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيْهِنَّ الْوِتْرَ وَكَانَ يُصَلِّىْ لَيْلاً طَوِيْلاً قَائِمًا وَلَيْلاً طَوِيْلاً قَاعِدًا وَكَانَ اِذَا قَرَاَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ وَكَانَ اِذَا قَرَاَ قَاعِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ وَكَانَ اِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ.

৫২. আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা) থেকে রাসূল করীম ﷺ-এর নফল সালাত প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। আয়েশা (রা) বললেন, রাসূল করীম ﷺ জোহরের পূর্বে চার রাকা'আত আমার ঘরে পড়তেন, তারপর মসজিদে গিয়ে ফরজ আদায় করতেন। অতঃপর ঘরে চলে আসতেন এবং জোহরের পর দুই রাকাত পড়তেন। মাগরিবের সালাত শেষ করেও ঘরে চলে আসতেন এবং দুই রাকা'আত পড়তেন। এশার সালাতের পরও ঘরে চলে আসতেন এবং দুই রাকা'আত পড়তেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাজ্জুদের সালাত বেতরসহ নয় রাকা'আত আদায় করতেন। তাহাজ্জুদের সালাত কখনো দাঁড়িয়ে আর কখনো বসে বসে আদায় করতেন। দাঁড়িয়ে কেরাত পাঠ করলে রুকু সেজদাও দাঁড়িয়ে করতেন। আর বসে কেরাত পড়লে রুকু সেজদাও বসে আদায় করতেন। ফজর হয়ে গেলে দুই রাকা'আত আদায় করতেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের রাকা'আতের মোট সংখ্যা নিম্নরূপ–

সালাত	ফরজ	ফরজের পূর্বে সুন্নাত	ফরজের পরে সুন্নাত
ফজর	২	২	-
জোহর	৪	২ বা ৪	২
আছর	৪	-	-
মাগরিব	৩	-	২
এশা	৪	-	২
মোট	১৭	৪/৬	৬

٥٣. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ فَإِنْ نَسِىَ أَنْ يَّذْكُرَ اسْمَ اللّٰهِ فِىْ أَوَّلِهٖ فَلْيَقُلْ : بِسْمِ اللّٰهِ أَوَّلَهٗ وَآخِرَهٗ ـ

৫৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন : যখন তোমাদের কেউ খাবার শুরু করে সে যেন প্রথমে আল্লাহর নাম স্মরণ করে। প্রথমে তা ভুলে গেলে পরে বলবে, بِسْمِ اللّٰهِ أَوَّلَهٗ وَ آخِرَهٗ ।

(বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫২৯, তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭।)

পরকাল বিষয়ক

٥٤. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهٗ قَالَ : يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللّٰهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَّ لَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا ـ

৫৪. আয়েশা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : হে আমার উম্মতগণ! আল্লাহর শপথ আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে, তবে তোমরা কম করে হাসতে, বেশী করে কাঁদতে। (বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৮১)

٥٥. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ .

৫৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ পছন্দ করে আল্লাহও তাঁর সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর যে আল্লাহর সাক্ষাৎ অপছন্দ করে, আল্লাহও তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন।

(মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৩)

٥٦. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ يَقُوْلُ : يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيْعًا ؟

৫৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন : কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষকে উলঙ্গ অবস্থায় এবং খাতনা বিহীন একত্রিত করা হবে। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম : হে রাসূল ﷺ পুরুষ ও নারী সকলকেই কি এভাবে একত্রিত করা হবে?

٥٧. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّهَا ذَكَرَتِ النَّارَ فَبَكَتْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا يُبْكِيْكَ ؟ قَالَتْ : ذَكَرْتُ النَّارَ، فَبَكَيْتُ هَلْ تَذْكُرُوْنَ اَهْلِيْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَقَالَ : اَمَا فِىْ ثَلاَثَةِ مَوَاطِنَ، فَلاَيَذْكُرُ اَحَدٌ اَحَدًا : عِنْدَ الْمِيْزَانِ حَتّٰى يَعْلَمَ اَيَخَفُّ مِيْزَانُهُ اَمْ يَثْقُلُ . وَعِنْدَ الْكِتَابِ حِيْنَ يُقَالُ : هَاؤُمُ اقْرَؤُوْا كِتَابِيَهْ حَتّٰى يَعْلَمَ اَيْنَ يَقَعُ كِتَابُهُ اَ فِىْ يَمِيْنِهِ اَمْ فِىْ شِمَالِهِ اَمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ وَعِنْدَ الصِّرَاطِ اِذَا وَضَعَ بَيْنَ ظَهْرِىْ جَهَنَّمَ .

৫৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি একদা জাহান্নামের আগুনের কথা স্মরণ করত: কাঁদছিলেন। মহানবী ﷺ বললেন : তোমাকে কাঁদাল কে? তিনি বললেন, আমি জাহান্নামের আগুন স্মরণ করছিলাম, তাই কাঁদছি। আচ্ছা আপনি কি কিয়ামতের দিনে আপনার পরিবার-পরিজনদের কথা মনে রাখবেন? মহানবী ﷺ বললেন : এমন তিনটি স্থান রয়েছে যেখানে কেউ কাউকে মনে রাখবে না। ১. আমল ওজন করার সময়, যতক্ষণ না সে নিশ্চিত হবে যে, তার ওজন ভারী হলো না হালকা হলো। ২. যখন আমলনামা দেওয়া হবে এই বলে যে, এসো তোমার আমলনামা পড়ে দেখ। যতক্ষণ না সে নিশ্চিত হবে তার আমলনামা ডান হাতে পাচ্ছে, না বাম হাতে, নাকি পৃষ্ঠদেশে। ৩. জাহান্নামের উপরে রাখা কঠিন (পুলসিরাত) পার হবার সময়। (আবূ দাউদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৪৫-৪৫)

٥٨. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ : (وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا صَفِيَّةُ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا فَاطِمَةُ بِنْتِ مُحَمَّدٍ يَا بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ اَمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا، سَلُوْنِيْ مِنْ مَالِيْ مَا شِئْتُمْ.

৫৮. আয়েশা (রা) বলেন, যখন আল্লাহর এ বাণী নাযিল হলো "তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দাও।" তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা সাফিয়া, হে মুহাম্মদ তনয়া ফাতিমা, হে বনূ আব্দুল মুত্তালিব! আমি আল্লাহর বিষয়ে তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারবো না, তোমরা আমার মাল থেকে যা খুশি চেয়ে নিতে পার। (তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬)

٥٩. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يُحَرِّمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ.

৫৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জন্মগত সম্বন্ধের কারণে যা হারাম হয়, দুধ পানগত সম্বন্ধের কারণেও তা হারাম হয়। (মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৬)

৬০. আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন : এক চতুর্থাংশ দীনার বা তার চেয়ে বেশী পরিমাণ মূল্যের সম্পদ চুরি করলে চোরের হাত কেটে দিতে হবে। (মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩)

٦١. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَحْدَثَ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلاَتِهِ فَيَأْخُذْ بِاَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ.

৬১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কারো সালাতে অযূ ছুটে গেলে (হদস) সে যেন তাঁর নাক ধরে পিছনে চলে আসে। (আবূ দাউদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৯)

٦٢. عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رِبَاحٍ (رض) اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ (رضى) هَلْ لِلنِّسَاءِ اَنْ يُصَلِّيْنَ عَلَى الدَّوَابِّ ؟ قَالَتْ لَمْ يُرْخَصْ لَهُنَّ فِىْ ذٰلِكَ، فِىْ شِدَّةٍ وَلاَ رَخَاءٍ.

৬২. আতা ইবন আবী রাবাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, মহিলাদের সাওয়ারীর উপর সালাত আদায় করার অনুমতি আছে কি? তিনি বললেন, এ ব্যাপারে কোন অনুমতি নেই। স্বাভাবিক অবস্থাতেও নয় এবং অস্বাভাবিক অবস্থাতেও নয়। (মুসলিম, পৃ. ১৭৩)

٦٣. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

৬৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেউ যদি রোযা কাযা থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে তার অভিভাবকদের কেউ তা আদায় করে দেবে। (আবূ দাউদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৬)

٦٤. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : اِنَّمَا نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ لُحُوْمِ الْاَضَاحِىْ لِجُهْدِ النَّاسِ، ثُمَّ رَخَّصَ فِيْهَا.

৬৪. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, কুরবানীর গোশত সংরক্ষণ করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছিলেন জনগণের অভাব-অনটনের কারণে। এ অবস্থা উত্তরণের পর তিনি তা পুনরায় সংরক্ষণের অনুমতি দান করেন।

(ইবনে মাজাহ, পৃ. ২২৮)

অন্যান্য বিষয়ে আয়েশা (রা)-এর অবদান

আয়েশা (রা) ইসলামী সাহিত্য ও জ্ঞান বিজ্ঞানের জগতে এক বিস্ময়কর নাম। হাদীস ছাড়াও তাফসীর, ফিক্হ, সাহিত্য, কাব্য ও চিকিৎসা প্রভৃতি শারঈ ও পার্থিব বিষয়ে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হলো–

তাফসীর বিষয়ে আয়েশা (রা)-এর অবদান : পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণকে পরিভাষায় তাফসীর বলে। এ ক্ষেত্রেও আয়েশা (রা)-এর অবদান ছিল অসামান্য। দীর্ঘ প্রায় ১২ বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র সাহচর্য থেকে তিনি কুরআন অবতরণ, নাযিলের প্রেক্ষাপট এবং এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করেন। উপরন্তু তাঁর ঘরেই অধিকাংশ সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কুরআনের আয়াত নাযিল হতো। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কুরআন (ভাব ও তাৎপর্যসহ) শিক্ষা লাভ করতেন। আবূ ইউনূস নামে তাঁর এক দাসকে দিয়ে তিনি কুরআন লিখিয়েছিলেন। তাঁর বর্ণনায় আল-কুরআনের অনেক আয়াতের সঠিক তত্ত্ব ও তাৎপর্য প্রতিভাত হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হলো–

১. আল্লাহ তা'আলার বাণী : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا "নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্যতম। সুতরাং যারা বায়তুল্লাহর হজ্জ বা উমরা করবে তাদের জন্য এ দু'টির তাওয়াক (সাঈ) করাতে কোন দোষ নেই"।

এ আয়াত সম্পর্কে একদা তাঁর বিশিষ্ট ছাত্র ও ভাগ্নে উরওয়া (র) বললেন : খালা আম্মা! অত্র আয়াত থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, সাফা, মারওয়ার তাওয়াফ না করলেও কোন ক্ষতি নেই। আয়েশা (রা) বললেন : "তোমার ব্যাখ্যা সঠিক নয়, যদি আয়াতটির অর্থ তাই হতো, তবে আল্লাহ এভাবে বলতেন : لَا جُنَاحَ أَنْ لَا

يَطَّوَّفَ অর্থাৎ ঐ দু'টির তাওয়াফ না করাতে কোন দোষ নেই। মূলত এ আয়াতটি আনসারদের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে। মদীনার আউস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা ইসলামে দীক্ষিত হবার পূর্বে মানাত দেবীর অর্চনা করত। এ মূর্তি ছিল কুদায়দ সংলগ্ন মুশাল্লাল পর্বতে। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁরা এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে অত্র আয়াত নাযিল হয়। অতঃপর আয়েশা (রা) বলেন : "নবী ﷺ সাফা ও মারওয়ায় সাঈ করেছেন। সুতরাং এখন তা পরিত্যাগ করার অধিকার কারো নাই।"

২. আল্লাহ তা'আল্লার বাণী : حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلَاةِ الْوُسْطٰى। "তোমরা সকল সালাতের ব্যাপারে যত্নবান হও, বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের"। এখানে মধ্যবর্তী সালাত নিয়ে সাহাবীদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। যায়িদ ইবন সাবিত এবং উসামা (রা)-এর মতে, এর দ্বারা যুহরের সালাত, আবার কোন কোন সাহাবীর মধ্যে ফজরের সালাতকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু আয়েশা (রা) আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলেছেন : তা হলো আসরের সালাত। তিনি এ তাফসীরের ওপর এত দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন যে, স্বীয় মাসহাফের পাদটীকায় وَصَلَاةِ الْعَصْرِ। কথাটি লিপিবদ্ধ করে নিয়েছেন। তাঁর মাসহাফ লেখক আবূ ইউনুস বলেন : " তিনি আমাকে তাঁর নিজের জন্য কুরআন লিখার নির্দেশ দিয়ে বললেন : যখন এ আয়াত পর্যন্ত আসবে তখন আমাকে জানাবে। আমি তাঁকে সে সম্পর্কে জানালে তিনি বললেন : اَلصَّلَاةُ الْوُسْطٰى। এর পরে صَلَاةُ الْعَصْرِ। কথাটি লিখে দাও। অতঃপর তিনি বলেন, আমি মহানবী ﷺ-এর থেকে এর ব্যাখ্যা এমনই শুনেছি।

৩. আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে : "তোমাদের হৃদয়ে যা কিছু আছে তা প্রকাশ কর বা গোপন রাখ, আল্লাহ তোমাদের কাছে তার হিসাব নিবেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছা মাফ করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করবেন"। এ আয়াত সম্বন্ধে ইবন আব্বাস ও আলী (রা) বলেন : "অত্র আয়াতের বিধান মতে, আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে"। আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর দ্বারা রহিত হয়ে গিয়েছে। ইবন উমর (রা)-এর অভিমতও অনুরূপ। জনৈক ব্যক্তি আয়েশা (রা)-এর নিকট উদ্ধৃত আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলে তিনি "যে খারাপ কাজ করবে, সে তার শাস্তি পাবে" আয়াতটি উল্লেখ করেন।

প্রশ্নকারীর বক্তব্য ছিল এই যদি অবস্থা হয় তাহলে আল্লাহর ক্ষমা ও অনুগ্রহ বান্দা কি করে লাভ করবে? আয়েশা (রা) বললেন : নবী ﷺ-এর নিকট আমি এ আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞেস করার পর তিনি বললেন সর্বপ্রথম তুমিই এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছো। আল্লাহর কালাম সত্য। তবে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের ছোট ছোট অপরাধসমূহ বিভিন্ন মুসিবত-বিপদের মাধ্যমে ক্ষমা করে দেন। কোন মু'মিন যখন রোগাক্রান্ত হয় বা তার উপর বিপদ নেমে আসে, এমনকি পকেটে কোন জিনিস রেখে ভুলে যায়, আর তা অন্বেষণ করতে করতে অস্থির হয়ে পড়ে, এ সবই তাঁর ক্ষমা ও অনুকম্পা লাভের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অতঃপর অবস্থা এমন হয় যে, সোনা আগুনে জ্বালালে যেমন নিখাঁদ হয়ে যায়, তেমনি মু'মিন ব্যক্তিও গুনাহ্ থেকে মুক্ত হয়ে এ দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়।

৪. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা যার কাছে থেকে হিসাব চেয়ে বসবেন সে ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি বললাম : হে রাসূল ﷺ অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا "অচিরেই তাদের থেকে সহজ হিসাব গ্রহণ করা হবে"। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এর অর্থ হল اَلْعَرْضُ অর্থাৎ আমলনামা উপস্থাপনা।

ফিকহ্ বিষয়ে আয়েশা (রা)-এর অবদান : কুরআন ও হাদীসের উপর ভিত্তি করে শরঈ বিষয়ে যে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তাকেই ফিকহ্ বলে। এই ফিকহ্ শাস্ত্রে আয়েশা (রা)-এর অবদান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মহানবী ﷺ ছিলেন সকল বিষয়ের সিদ্ধান্ত ও ফতওয়া দানের কেন্দ্রস্থল। তাঁর ইন্তিকালের পর ইসলামী শরী'আত ও হুকুম-আহ্কামে পারদর্শী সাহাবীদের উপর এ দায়িত্ব বর্তায়। বিশেষ কোন সমস্যা আসলে তাঁরা প্রথমে কুরআন ও সুন্নায় তার সমাধান তালাশ করতেন। কিন্তু তাতে স্পষ্ট সমাধান না পেলে কুরআন ও হাদীসের অন্য হুকুমের উপর কিয়াস বা অনুমান করে সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন। খুলাফায়ে রাশিদার যুগের শেষ পর্যায়ে এসে বিভিন্ন কারণে বড় বড় সাহাবীদের অনেকেই মক্কা, তায়িফ, দামিস্ক, বসরা, কূফা প্রভৃতি নগরীতে ছড়িয়ে পড়েন। পক্ষান্তরে ইবন আব্বাস, ইবন ওমর, আবূ হুরায়রা ও আয়েশা (রা)-এ চার মহান ব্যক্তিত্ব মদীনায় ফিকহ্ ও ফতওয়ার কাজ আঞ্জাম দেন।

এ ক্ষেত্রে ইবন ওমর ও আবূ হুরায়রা (রা)-এর পদ্ধতি ছিল উদ্ভূত সমস্যা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের কোন বিধান কিংবা পূর্ববর্তী খলীফাদের কোন

আমলে থাকলে তাঁরা তা বলে দিতেন। অন্যথায় নীরবতা অবলম্বন করতেন। আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) এ ক্ষেত্রে কুরআন, সুন্নাহ ও পূর্ববর্তী খলীফাদের আমলে সমাধানকৃত মাসআলার ওপর অনুমান করে নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধি অনুযায়ী সমাধান দিতেন। এ ক্ষেত্রে আয়েশা (রা)-এর মূলনীতি ছিল প্রথমে কুরআন ও পরে সুন্নাতের মাঝে সমাধান তালাশ করা। কিন্তু কুরআন ও হাদীসে সমাধান না পেলে স্বীয় জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত প্রদান করা। নিম্নে তাঁর গৃহীত ফিকহী মাসআলার কিছু উদাহরণ পেশ করা হলো–

* আল্লাহ্ তা'আলার বাণী–

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ

"তালাক প্রাপ্তা নারী তিন 'কুরূ' পর্যন্ত নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে"। অর্থাৎ এ সময় পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে। (সূরা আল বাকারা : আয়াত-২২৮)

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-এর এক ভাতিজী স্বামী কর্তৃক তালাক প্রাপ্তা হন। তাঁর ইদ্দতের তিন তুহুর অর্থাৎ পবিত্রতার তিনটি মেয়াদ অতিক্রান্ত হয়ে নতুন মাসের প্রারম্ভনায় আয়েশা (রা) তাকে স্বামী গৃহ ছেড়ে চলে আসতে বলেন। কিছু লোক এটাকে কুরআনী হুকুমের পরিপন্থী বলে প্রতিবাদ জানায়। তাঁরা দলীল হিসেবে উল্লেখিত আয়াতটি পেশ করলে আয়েশা (রা) বলেন : আল্লাহর বাণী সত্য। 'কুরূ' এর অর্থ কি তা কি তোমরা জান? 'কুরূ' অর্থ : পবিত্রতা (তুহুর)। মদীনার ফিকহবিদগণ এ বিষয়ে আয়েশা (রা)-এর অনুসরণ করেছেন। তবে ইরাকের ফকীহগণ 'কুরূ' বলতে হায়েজ (ঋতুস্রাব)-কে বুঝে থাকেন।

* স্বামী স্ত্রীকে তালাক দানের ক্ষমতা অর্পণ করলে এবং স্ত্রী সে ক্ষমতা স্বামীকে ফিরিয়ে দিয়ে তাকে সর্বোতভাবে মেনে নিলেও কি সে স্ত্রীর ওপর কোন তালাক পতিত হবে? এ ক্ষেত্রে আলী (রা) ও যায়েদের (রা) অভিমত হলো স্ত্রীর ওপর এক তালাক প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু আয়েশা (রা)-এর মতে কোন তালাকই হবে না। তিনি তাঁর মতের স্বপক্ষে 'তাখঈর' এর ঘটনা উল্লেখ করে বলেন : রাসূল ﷺ তাঁর স্ত্রীদেরকে এ ইখতিয়ার বা স্বাধীনতা দিয়েছিলেন যে, তাঁরা তাঁকে ছেড়ে পার্থিব সুখ-সাচ্ছ্যন্দ গ্রহণ করতে পারেন, অথবা তাঁর সাথে থেকে এ দারিদ্র্যময় জীবন বেছে নিতে পারেন। উম্মুল মু'মিনীনগণ (রা) শেষোক্ত সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করেন। অথচ এতে তাঁদের ওপর কোনরূপ তালাক পতিত হয়নি।

এরূপ আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে, যাতে কুরআন ও হাদীসের আলোকে আয়েশা (রা)-এর ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গী বা ফতওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও সূক্ষ্মতার প্রমাণ মিলে।

আরবী সাহিত্যে আয়েশা (রা)-এর অবদান : আরবী ভাষা পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা। এ ভাষা অত্যন্ত অলংকার সমৃদ্ধ, ছন্দময় ও প্রাঞ্জল। আয়েশা (রা) তাঁর এ মাতৃভাষার ওপর অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এর পশ্চাতে অলংকার সমৃদ্ধ মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস চর্চা ও অধ্যয়ন সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল বলে অনুমিত হয়। আয়েশা (রা) অত্যন্ত সুমিষ্ট, স্পষ্ট, প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় কথা বলতেন। তাঁর ছাত্র মূসা ইবন তালহা এ সম্পর্কে যথার্থ বলেন : مَا رَاَيْتُ اَفْصَحَ مِنْ عَائِشَةَ "আমি আয়েশা (রা) অপেক্ষা অধিকতর অলংকারময় ও প্রাঞ্জলভাষী কাউকে দেখিনি"। আয়েশা (রা)-এর বর্ণিত অসংখ্য হাদীসের মধ্যে অনেক হাদীস তিনি নিজের প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনায় রয়েছে শৈল্পিকরূপ ও সৌন্দর্য। তাতে বিভিন্ন রূপক ও উপমা-উৎপ্রেক্ষার সার্থক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ওপর ওহী অবতীর্ণের বর্ণনা উল্লেখ করা যায়। আয়েশা (রা) বলেন : اَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِى النَّوْمِ، فَكَانَ لَا يَرٰى رُؤْيًا اِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ। "প্রথমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর ওহী নাযিল হয় সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন তা ভোরের স্বচ্ছ উষার ন্যায় তাঁর কাছে দীপ্যমান হত"।

সাহিত্যিকরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সত্য স্বপ্নসমূহকে সাহিত্যের উচ্চাঙ্গ ভঙ্গীমায় "প্রত্যুষের কিরণের" সাথে তুলনা করেছেন।

অনুরূপ তাঁর ওপর ইফক বা মিথ্যা অপবাদ আরোপের ঘটনার সময়কার এক রাতের করুণ চিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন–

فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ

حَتّٰى اَصْبَحْتُ لَا يَرْقَى لِى دَمْعٌ

وَلَا اَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ

"ঐ রাতটি ক্রন্দন করে কাটালাম।
সকাল পর্যন্ত আমার অশ্রুও শুকায়নি
এবং আমি চোখে ঘুমের সুরমাও লাগাইনি"।

অর্থাৎ তিনি ঐ রাতটি জেগে কেঁদে কেঁদে অতিবাহিত করেছেন, এ কথাটি তিনি সরল বাক্যে না বলে অলংকার সমৃদ্ধ অভিব্যক্তির মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। ভাষার ওপর তাঁর যে যথেষ্ট দখল রয়েছে এতে তা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়।

আয়েশা (রা) ছিলেন অত্যন্ত প্রত্যুৎপন্নমতী ও সূক্ষ্মদর্শিনী মহিলা। প্রাচীন আরবের লোক সাহিত্যের ওপর তাঁর বিচরণ ছিল। আরবের এগার সহোদরের একটি লম্বা কিচ্ছা তিনি একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে শুনিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ একাগ্রচিত্তে তাঁর বর্ণনা শুনতেন। এসব কাহিনী বর্ণনাতে তার ভাষার লালিত্য, অনন্য বাচনভঙ্গি, অসাধারণ গাঁথুনী ও আরবী সাহিত্যে তাঁর অগাধ নৈপুণ্যের সাক্ষ্য বহন করে।

পত্র সাহিত্যে আয়েশা (রা)

যে কোন ভাষায়ই পত্র সাহিত্যের ভূমিকা ও গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামী সাহিত্য কিংবা আরবী সাহিত্য এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। ইসলামের ইতিহাসে এমন অসংখ্য পণ্ডিতের নাম পাওয়া যাবে যাদের পত্রাবলী ইসলামী সাহিত্যকে সমধিক সমৃদ্ধ করেছে। তন্মধ্যে আয়েশা (রা)-এর নাম শ্রদ্ধার সাথে উল্লেখ করতে পারি। আয়েশা (রা) ছিলেন তৎকালীন সময়ের শরয়ী বিষয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। ইসলামী রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিনিধিদল বা জ্ঞানপিপাসুগণ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। প্রয়োজনের তাগিদে অনেক সময় আয়েশা (রা) কেও বিভিন্ন শহর বা অঞ্চলের নেতৃবৃন্দের সাথে পত্র যোগাযোগ করতে হয়েছে। লিখনী বিদ্যার সাথে তাঁর তেমন পরিচয় না থাকলেও অন্যের মাধ্যমে তিনি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো লিখে নিতেন। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে তাঁর পত্রের ভাব ও ভাষা ছিল একান্তই নিজস্ব। তাঁর পত্রাবলিতেও সাহিত্যের প্রবীণ সাহিত্যিকগণ সাহিত্যমূল্য বিবেচনা করে নিজেদের রচনাবলীতে স্থান দিতে আগ্রহী হয়েছেন। ইবন আবদি রাব্বিহি রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আল-ইক্বদুল ফরীদ এর ৪র্থ খণ্ডে আয়েশা (রা)-এর অনেক পত্র সঙ্কলিত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে নিম্নে একটি পত্রের উল্লেখ করা হলো–

আয়েশা (রা) বসরায় পৌঁছে তথাকার এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব যায়েদ ইবন সূহানকে পত্র লিখেছেন এভাবে–

مِنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ إِلَى إِبْنِهِ الْخَالِصِ زَيْدِبْنِ صَوْحَانَ، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ : فَإِنَّ أَبَاكَ كَانَ رَأْسًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَسَيِّدًا فِي الْإِسْلَامِ وَإِنَّكَ مِنْ أَبِيْكَ بِمَنْزِلَةِ الْمُصَلِّيْ مِنَ السَّابِقِ يُقَالُ : كَانَ أَوْ لُحِقَ وَقَدْ بَلَغَكَ الَّذِيْ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ مِنْ مَصَابِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ وَنَحْنُ قَادِمُوْنَ عَلَيْكَ وَ الْعَيَانِ أَشْفَى لَكَ مِنَ الْخَيْرِ فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِيْ هٰذَا فَثَبِّطِ النَّاسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ وَالسَّلَامُ ـ

"মু'মিনদের জননী আয়েশা (রা)-এর পক্ষ থেকে তাঁর একনিষ্ঠ সন্তান যায়েদ ইবন সুহানের প্রতি লিখিত। তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর কথা এই যে, তোমার পিতা জাহিলী যুগে সর্দার ছিলেন। ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পরও তিনি নেতৃত্বের আসনে সমাসীন ছিলেন। তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে মাসবুক মুসল্লীর অবস্থানে আছো, যাকে বলা যায় প্রায় কিংবা সুনিশ্চিতভাবে লাহিক হয়েছ। নিশ্চয়ই তুমি অবগত আছ যে, খলিফা ওসমান ইবনে আফফান (রা) হত্যার মাধ্যমে ইসলামে কি বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা এসেছি তোমার কাছে, প্রত্যক্ষ দেখা সংবাদের চেয়ে তোমায় অধিক স্বস্তি দেবে। তোমার কাছে আমার এ পত্র পৌঁছানোর পর মানুষকে আলী ইবন আবু তালিব (রা)-এর পক্ষাবলম্বন থেকে বিরত রাখবে। তুমি স্বগৃহে অবস্থান করতে থাকো, যতক্ষণ না আমার পরবর্তী নির্দেশ তুমি পাও। ওয়াস সালাম।"

কাব্য সাহিত্যে আয়েশা (রা)-এর অবদান : আরব জাতি কাব্য কবিতার সাথে অধিক পরিচিত ছিল। স্বভাবতই তারা ছিল কাব্য প্রিয়। কাব্য ও নারী ছিল তাদের সকল কাজের জীবনী শক্তি। জাহেলী যুগ থেকেই আরবরা কাব্য চর্চায় অভ্যস্ত ছিল। ওকায মেলায় প্রতিবছর উন্মুক্ত কাব্য প্রতিযোগিতা হত। কারো সম্মান মর্যাদা বর্ণনা বা কারো কুৎসা বা নিন্দা রটনার প্রধান হাতিয়ার ছিল কবিতা। জাহেলী যুগে আরবের কোন কবির স্থান বা মর্যাদার উল্লেখ করতে যেয়ে ইবন রাশীক আল-কায়রোয়ানী বলেন : "আরবের কোন কবি গোত্রের একজন কবি কাব্য জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করলে অন্যান্য গোত্র কর্তৃক অভিনন্দিত হতো। বিয়ের অনুষ্ঠানের পর মেয়েরা বাদ্য বাজিয়ে ফূর্তি করতো। নানা রকম খাদ্যের

আয়োজন করা হতো। আবাল, বৃদ্ধা, বণিতা সবাই মিলে উল্লাস করতো। কারণ তাদের মতে, একজন কবি হলো মান মর্যাদার রক্ষক, বংশের প্রতিরোধক এবং সুনাম-সুখ্যাতির প্রসারক"।

ইসলাম আগমনের পরও আরবদের মাঝে কাব্যচর্চার এ শানিতধারা ব্যাপকভাবে অব্যাহত থাকে। তাদের অনেকেই কাব্যচর্চায় পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। ইবন কুতায়বা-এর ভাষায়– اَلشُّعَرَاءُ الْمَعْرُوْفُوْنَ بِالشِّعْرِ عِنْدَ عَشَائِرِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَالْاِسْلَامِ اَكْثَرُ مِنْ اَنْ تُحِيْطَ بِهِمْ مُحِيْطٌ . অর্থাৎ, জাহিলী ও ইসলামী যুগে যারা কবিতার জন্য তাদের সমাজ ও গোত্রে খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁদের সংখ্যা এক অধিক যে, কেউ তা গণনা করতে পারবে না।"

আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আমাদের নিকট (মদীনায়) আসেন, আনসারদের প্রতিটি গৃহে তখন কাব্য চর্চা হতো। পুরুষদের পাশাপাশি আরবের মেয়েরাও কাব্য চর্চা করতো।

উম্মুল মু'মিনূন আয়েশা (রা) তাঁর প্রথম স্মৃতিশক্তিকে কুরআন ও হাদীস চর্চার পাশাপাশি কাব্য চর্চা ও তা সংরক্ষণের কাজে লাগিয়েছিলেন। তাঁর পরিবারেও কাব্য চর্চা হতো। আবূ বকর (রা) নিজেও একজন কবি ছিলেন। আয়েশা (রা)-এর বর্ণনা থেকেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনায় আগমন করলেন, আবূ বকর (রা) ও বিলাল (রা) মদীনায় এসে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আমি তাঁদের উভয়ের নিকট গিয়ে বললাম, আব্বাজান! আপনার কেমন লাগছে? হে বিলাল (রা) আপনার কেমন অনুভূত হচ্ছে? আয়েশা (রা) বলেন : আবু বকর (রা) জ্বরে আক্রান্ত হলে নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করতেন–

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِىْ اَهْلِهٖ * وَالْمَوْتُ اَدْنٰى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهٖ .

"প্রত্যেক ব্যক্তি তার পরিজনের মাঝে দিনাতিপাত করছে, অথচ মৃত্যু তার জুতার ফিতার চেয়েও অধিক নিকটবর্তী"।

পিতার কাছ থেকেই তিনি কাব্য বিষয়ের বিভিন্ন জ্ঞান তথা এর আঙ্গিক চিত্রকল্প, ছন্দ, লালিত্য, ভাব-ভাষা প্রভৃতি শিখে নিয়েছেন এবং পরবর্তীতে তিনি এ বিষয়ে

বুৎপত্তি অর্জনেও সক্ষম হয়েছিলেন। মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদের নিম্নের উক্তি তার সাক্ষ্য বহন করে। তিনি বলেন : مَا كُنْتُ أَعْلَمُ أَحَدًا فِيْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَلَا فَرِيْضَةً مِّنْ عَائِشَةَ ـ "রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের মধ্যে কবিতা ও ফারাইয বিষয়ে আয়েশা (রা)-এর থেকে অধিক জ্ঞানী আর কাউকে জানি না"। তাঁর ভাগিনে উরওয়া ইবন যুবাইরও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইসলাম পূর্ব ও পরবর্তী যুগে কবিদের অনেক কবিতা আয়েশা (রা)-এর মুখস্থ ছিল। তিনি সে সকল কবিতার অংশ বিশেষ বিভিন্ন সময় উদ্ধৃতি আকারে পেশ করতেন। হাদীসের গ্রন্থাবলিতে তাঁর বর্ণিত কিছু কবিতা বা পংক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়।

আয়েশা (রা) এর মাঝে কাব্য রস আস্বাদনের প্রবল আগ্রহ ছিল। অনেক কবি তাদের স্বরচিত কবিতা তাঁকে শুনাতেন। হাসসান ইবন সাবিত (রা) ছিলেন আনসারদের সেরা কবি। ইফকের ঘটনায় জড়িয়ে পড়ার কারণে তাঁর প্রতি আয়েশা (রা) এর মনোভাব তিক্ত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি আয়েশা (রা)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁকে কবিতা শুনাতেন। হাসসান ইবন সাবিত (রা) ছিলেন আনসারদের সেরা কবি। হাসসান (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সভা কবি। আয়েশা (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলছেন : হাসসান! যতক্ষণ তুমি আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ থেকে কাব্যের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে প্রতিরোধ করতে থাকবে, জিব্রাইল আমীন (আ)-এর সাহায্য তুমি লাভ করবে। তিনি আরো বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ কথাও বলতে শুনেছি যে, হাসসান তাদের যথাযথ প্রত্যুত্তর দিয়ে দুশ্চিন্তা ও কষ্ট থেকে মুক্ত করেছেন। এসব কথা বর্ণনার পর আয়েশা (রা) হাসসান ইবন সাবিত (রা) এর নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করেন–

١. هَجَوْتَ مُحَمَّدًا فَأَجِبْتُ عَنْهُ * عِنْدَ اللّٰهِ فِيْ ذٰلِكَ الْجَزَاءُ

٢. هَجَوْتَ مُحَمَّدًا بِرًّا حَنِيْفًا * رَسُوْلُ اللّٰهِ شِيْمَتُهُ الْوَفَاءُ

٣. فَإِنَّ أَبِيْ وَوَالِدَهُ وَعِرْضِيْ * لِعَرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وَقَاءُ

٤. فَمَنْ يَهْجُوْ رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْكُمْ * وَيَمْدَحُهُ وَيَنْصُرُهُ سَوَاءٌ

٥. وَ جِبْرَئِيْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ فِيْنَا * وَ رُوْحُ الْقُدُسِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءٌ.

১. "তুমি মুহাম্মদ(সা)-এর কুৎসা রচনা করেছো, আমি তার জবাব দিয়েছি। আমার এ কাজের পুরস্কার রয়েছে আল্লাহর সমীপে।

২. তুমি মুহাম্মদের নিন্দা করেছো। অথচ তিনি নেককার, ধার্মিক ও আল্লাহর রাসূল। প্রতিশ্রুতি পালন যার চারিত্রিক ভূষণ।

৩. আমার পিতা-পিতাসহ, আমার মান-সম্মান সবই তোমাদের আক্রমণের হাত হতে মুহাম্মদের মান-সম্মান রক্ষার জন্য ঢাল স্বরূপ।

৪. তোমাদের মধ্য থেকে কেউ মুহাম্মদের কুৎসা, প্রশংসা বা সহায়তা করুক না কেন, সবই তার জন্য সমান।

৫. আল্লাহর বার্তাবাহক ও পবিত্র আত্মা জিব্রাঈল আমাদের মধ্যে আছেন, যার সমকক্ষ কেউ নেই।

তৃতীয় খলীফা উসমান (রা)-এর শাহাদাত বরণকে কেন্দ্র করে মদীনায় গোলযোগ সৃষ্টি হলে আয়েশা (রা) তা অবহিত হয়ে নিম্নের কাব্য চরণটি আবৃত্তি করেন–

وَلَوْاَنَّ قَوْمِيْ طَاعَتْنِيْ سَرَاتُهُمْ * لَاَنْقَذْتُهُمْ مِّنَ الْحِبَالِ وَ الْخَبَلِ.

"যদি আমার সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ আমার কথা মানতো তবে আমি তাদের এ ফাঁদ ও ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারতাম।"

আয়েশা (রা) নিজে যেমন কবিতার প্রতি আসক্ত ছিলেন, তেমনি অন্যদের গঠনমূলক কবিতা চর্চা ও অনুশীলনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি বলেন–

حَسَنٌ وَّ مِنْهُ قَبِيْحٌ، خُذْ بِالْحَسَنِ وَدَعِ الْقَبِيْحَ مِنْهُ الشِّعْرُ.

কিছু কবিতা ভাল আছে, আবার কিছু খারাপও আছে, তোমরা খারাপটি ছেড়ে দিয়ে ভালটি গ্রহণ কর"। আয়েশা (রা) আরো বলেন : رَوُّوْا اَوْلَادَكُمُ الشِّعْرَ تَعْذُبْ اَلْسِنَتُهُمْ "তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে কবিতা শিখাও। তা হলে তাদের ভাষা সুমধুর ও লাবণ্যময় হবে"।

এছাড়াও চিকিৎসা, ইতিহাস, কালাম শাস্ত্র, বিবাদমান সমস্যা ও প্রভৃতি বিষয়েও আয়েশা (রা)-এর কম-বেশী দখল ছিল।

মোটকথা উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) ছিলেন উম্মতে মুহাম্মদিয়ার কাছে একটি নাম, একটি ইতিহাস ও একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। হাদীস বিষয়ে তাঁর অনবদ্য অবদান মুসলিম উম্মাহ চিরদিন শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। মহিলা বিষয়ক অনেক শারঈ বিধান মুসলিম নারী সমাজ আয়েশা (রা)-এর মাধ্যমেই জানতে পেরেছে। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা, প্রখর মেধা ও মনন এবং অপরিসীম ধৈর্য ও সহনশীলতা হাদীস সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। হাদীস ও অন্যান্য বিষয়ে তাঁর গৌরবোজ্জ্বল অবদান সম্পর্কে যথাযথ মূল্যায়ন কল্পে বিস্তৃতভাবে ও স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্যে গবেষণা হওয়া প্রয়োজন।

ওফাত : আমীর মু'আবিয়ার শাসনামলে ৫৮ হিজরীতে ১৭ রমযান ৬৮ বছর বয়সে আয়েশা (রা) ইন্তেকাল করেন। তাঁর ওছিয়ত মোতাবেক রাতের বেলা তাকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। মদীনার তৎকালীন গভর্নর আবূ হুরায়রা (রা) তাঁর সালাতে জানাযা পড়ান। আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের ও ওরওয়াহ বিন জুবায়ের দুই সহোদর জানাযার পর তাঁর লাশ কবরে নামান।

আয়েশা (রা)-এর মৃত্যু সংবাদে ঐ রাতের বেলায়ও পুরুষ ছাড়াও প্রচুর পরিমাণে মহিলার সমাগম ঘটে। তাঁর মৃত্যু সংবাদ সকলকে এত ব্যথাতুর করেছিল যে, মাসরুক বলেন, 'নিষিদ্ধ না হলে আমি উম্মুল মু'মিনীনের জন্য মাতমের আয়োজন করতাম।' আর আবূ আইউব আনসারী বলেন, 'আমরা আজ মাতৃহারা শিশুর মত এতিম হলাম।'

৩. উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রা)

উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রা) জান্নাতী।

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ جِبْرِيْلُ رَاجِعْ حَفْصَةَ فَاِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ وَاِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِى الْجَنَّةِ ـ

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : জিবরীল আমাকে বলেছে যে, আপনি হাফসা (রা) থেকে প্রত্যাবর্তন করুন, কেননা সে অধিক রোযাদার ও অধিক নফল সালাত আদায়কারী এবং সে জান্নাতে আপনার স্ত্রী।

(হাকেম : সহীহ আল জামে আস্‌সাগীর লি আলবানী, ৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং-৪৭২৭)

ওমর (রা)-এর উক্তি : মা হাফসা! তুমি নাকি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সমানে সমানে উত্তর দিয়ে থাক? হাফসা বললেন, হ্যাঁ, অনেক সময় তাই হয়। আমি বললাম, খবরদার! কখনো এরূপ করবে না। তুমি মনে কর না যে, তোমার রূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মুগ্ধ করেছে, বরং তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি বিনয়ীভাব প্রকাশ করবে।'

নাম ও বংশ পরিচয় : তাঁর নাম হাফসা। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) তাঁর পিতা ছিলেন। মায়ের নাম যয়নব বিনতে মাযউন। তাঁর বংশ তালিকা হাফসা বিনতে ওমর ইবনে খাত্তাব ইবনে নওফেল ইবনে আবদুল ওযযা ইবনে রিবাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কুরাত ইবনে রিযাহ ইবনে আদী ইবনে লুয়াই ইবনে ফিহির ইবনে মালিক।

জন্ম ও ইসলাম গ্রহণ : হাফসা (রা) নবুওয়্যাতের পাঁচ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। এ সময় কোরাইশগণ কা'বাঘর পুন:নির্মাণ করছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ছিলেন তাঁর সহোদর। তিনি কবে, কীভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তা

পরিষ্কার করে জানা যায় না। শুধু এতটুকু জানা যায় যে, ওমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের প্রভাব সমগ্র পরিবারের ওপর পড়ে। ফলে তাঁর গোটা বংশের লোক ইসলাম কবুল করে। হাফসাও এ সময়ে পিতা-মাতা ও স্বামীসহ ইসলাম কবুল করেন।

প্রথম স্বামী : তাঁর স্বামী ছিলেন প্রখ্যাত সাহাবী খুনাইস ইবনে হুযাইফা ইবনে কায়েস ইবনে আদী। তিনি বনু সাহম বংশের লোক ছিলেন। মদীনায় হিজরতকালে স্বামী খুনাইস (রা)-এর সাথে হাফসা (রা)ও মদীনায় হিজরত করেন। পরবর্তীতে বদর যুদ্ধ সংঘটিত হলে খুনাইস (রা) তাতে অংশগ্রহণ করেন এবং মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হন।

বিধবা হয়ে পিতার গৃহে : তার স্বামী অল্প কয়েকদিন পর ইন্তেকাল করেন। সময়টা ছিল দ্বিতীয় হিজরীর ১৭ রমযান। স্বামীর মৃত্যু হলে বিধবা হাফসা (রা) পিতৃগৃহে ফিরে আসেন। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান।

মেয়ের বিবাহের জন্য ওমরের প্রস্তাব : হাফসা (রা) বিধবা হয়ে পিতৃগৃহে ফিরে আসার পর পিতা হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই ওমর (রা) মেয়ের পুনরায় বিয়ে দেয়ার ব্যাপারে চেষ্টা শুরু করেন। প্রথমে তিনি আবূ বকর সিদ্দিক (রা)-এর সাথে তাঁকে বিয়ে দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং আবূ বকর (রা)-এর সাথে সরাসরি কথা বলেন। কিন্তু আবূ বকর (রা) কোন উত্তর না দিয়ে সম্পূর্ণ চুপ থাকেন। আবূ বকর (রা)-এর এ নীরবতা ওমর (রা) ভালভাবে মেনে নিতে পারেন নি। তাই ওসমান (রা)-এর নিকট তাঁর কন্যা হাফসাকে বিয়ে দেয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। এ সময়ে ওসমান (রা) বিপত্নীক ছিলেন। মানে তাঁর স্ত্রী নবী নন্দিনী রোকাইয়া (রা) কিছুদিন আগে ইন্তেকাল করেন। কিন্তু তবুও ওসমান (রা)-এ প্রস্তাব এড়িয়ে গিয়ে জানিয়ে দেন যে আপাতত তিনি বিয়ের চিন্তা-ভাবনা করছেন না।

হাফসার স্বভাব : আসলে হাফসা (রা) ছিলেন রাগী মেজাজের মানুষ যা আবূ বকর (রা) বা ওসমান (রা)-এর মত নরম স্বভাবের মানুষেরা পছন্দ করতেন না। যে কারণে তাঁরা উভয়েই ভদ্রভাবে বিষয়টা এড়িয়ে গেছেন। সকলের তো জানা– স্বয়ং ওমর (রা) নিজেই ছিলেন অসম্ভব কঠোর প্রকৃতির মানুষ। কথায় বলে না, 'বাপকা বেটা, সিপাহীকা ঘোড়া।' ঠিক তেমনি হাফছা (রা) ছিলেন 'বাপকা বেটি'। যা হোক হাফসা (রা)-কে বিয়ে করার ব্যাপারে আবূ বকর (রা) ও

ওসমান (রা)-এর অনীহা ওমর (রা)-কে বেশ লজ্জায় ফেলেছিল। এ জন্য তিনি বিষয়টি সবিস্তারে রাসূলﷺ-কে অবহিত করেন।

সকলের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, এ সেই ওমর (রা) যাঁর ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে জিবরাইল (আ) উপস্থিত হয়ে বললেন, 'মুহাম্মদﷺ! ওমরের ইসলাম গ্রহণে আসমানের অধিবাসীরা উৎফুল্ল হয়েছেন।' আর ইতোপূর্বে ইসলাম গ্রহণকারীরা তো খুশিতে ফেটে পড়লেন। কারণ তারা জানতেন, ওমরের ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে ইসলামের ইতিহাস ভিন্ন দিকে মোড় নিবে। সত্যিই তাই ওমর ইসলাম গ্রহণের পর পরই অন্য মুসলমানদেরকে নিয়ে কা'বায় গিয়ে সালাত আদায় করলেন– যা ছিল মুসলমানদের জন্য অভাবনীয় এবং বিস্ময়কর। কারণ ইতোপূর্বে ৪০/৫০ জন ইসলাম কবুল করলেও প্রকাশ্যে তাঁরা কা'বা ঘরে গিয়ে সালাত আদায় করার সাহস করেন নি। ওমর (রা) এখানেই ক্ষান্ত হননি, তিনি আল্লাহ, রাসূল ও ইসলামের প্রধান শত্রু আবূ জেহেলের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি নিজেই বলেছেন, 'আমি তার দরজায় করাঘাত করলাম। আবূ জেহেল বেরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি মনে করে?' আমি বললাম, 'আপনাকে এ কথা জানাতে এসেছি যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদﷺ-এর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁর আনীত বিধান বাণীকে মেনে নিয়েছি।' এ কথা শোনা মাত্র সে আমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল এবং বললো, 'আল্লাহ তোকে কলঙ্কিত করুক এবং যে খবর নিয়ে তুই এসেছিস তাকেও কলঙ্কিত করুক।'

বুঝতেই পারছেন অবস্থা কি। মূলত এখান থেকেই ইসলাম ও কুফরের মধ্যে প্রকাশ্য বিরোধ শুরু হয়। তারপর! তারপর তো কত ঘটনা, কত সংঘর্ষ-সংগ্রাম, কত বিজয়। আর এ জন্যই আল্লাহর রাসূলﷺ ওমর (রা) সম্পর্কে বলেছেন, 'ওমরের জিহ্বা ও অন্ত:করণে আল্লাহ তা'আলা সত্যকে স্থায়ী করে দিয়েছেন। তাই সে 'ফারুক'। অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর দ্বারা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করে দিয়েছেন।

রাসূলﷺ নিজেই প্রস্তাব দেন বিবাহের : মুহাম্মদﷺ সব দিক ভেবে চিন্তে ওমর (রা)-এর মর্ম বেদনার কথা উপলব্ধি করলেন এবং তাঁকে কন্যাদায়গ্রস্থতা থেকে মুক্ত করার জন্য নিজেই হাফসাকে বিয়ে করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। হিজরী তৃতীয় সনে এ বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এতে করে ওমর (রা) যার পরনাই খুশি হন। অন্যদিকে একজন বিশিষ্ট শহীদ সাহাবীর নিঃসন্তান বিধবা স্ত্রীর দুঃখময় নিঃসঙ্গ জীবনের অবসান ঘটে।

রাসূল ﷺ যখন হাফসা (রা)-কে বিয়ে করে ঘরে তুলে নিলেন, তখন একদিন আবূ বকর (রা) ওমর (রা)-এর সাথে দেখা করে বললেন, 'ওমর! যখন তুমি আমার নিকট হাফসার বিয়ের প্রস্তাব করেছিলে, তখন আমার নীরবতা তোমাকে ব্যথিত করেছিল। কিন্তু আমার নীরব থাকার কারণ ছিল এই যে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ হাফসা সম্পর্কে নিজেই আলোচনা করেছিলেন। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অবশ্যই হাফসাকে স্বীয় পত্নীত্বে বরণ করে নেবেন। এ গোপন কথাটি আমি আর কারও নিকট প্রকাশ করিনি। যদি রাসূল ﷺ হাফসাকে বিয়ে না করতেন, তাহলে অবশ্যই আমি তাকে বিয়ে করতাম।'

হাফসাকে বিবাহ করার কারণ : ঐতিহাসিকদের মতে, রাসূল ﷺ হাফসা (রা)-কে প্রধানত তিনটি কারণে বিয়ে করেছিলেন–

১. মুহাম্মদ ﷺ যে ইসলামের বিজয় নিশানকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেবেন তা তিনি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অনুভব করেছিলেন এবং আল্লাহ তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করেছিলেন। ওমর (রা)-কে পুরস্কারস্বরূপ ও তাঁর মর্যাদাকে সমুন্নত করার জন্য আল্লাহ্র রাসূল হাফসা (রা)-কে বিয়ে করেন এবং উভয়ের মধ্যকার আত্মীয়তার বন্ধনকে সুদৃঢ় করেন। শুধুমাত্র রাসূল ﷺ-এর সাথে এ আত্মীয়তার বন্ধনের কারণেই কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ ওমর (রা)-কে স্মরণ করবে। এটি একটি সুদূর প্রসারী তাৎপর্যপূর্ণ মর্যাদা।

২. হাফসা (রা)-কে নিজের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে আল্লাহর রাসূল ﷺ হাফসা (রা)-এর মর্যাদাকে এত উচ্চে সমুন্নত করেছেন যে, শুধুমাত্র রাসূল ﷺ-এর সাথে বিয়ে হওয়ার কারণে হাফসা (রা) মুহাম্মদ ﷺ-এর অন্যান্য স্ত্রীদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবেন এবং সে নিশ্চয়তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রদান করেছেন।

৩. আল্লাহর রাসূল ﷺ হাফসা (রা)-কে বিয়ে করার মাধ্যমে ওমর (রা)-কে কন্যাদায়মুক্ত করেন এবং সকল প্রকার নিন্দার হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করেন।

রাসূলের সাথে হাফসার আচরণ : পূর্বেই জানিয়েছি যে, হাফসা (রা) একটু কড়া মেজাজের মানুষ ছিলেন। এমনকি তিনি অনেক সময় রাসূল ﷺ-এর সাথেও কথা কাটাকাটি করতেন। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, 'একদা ওমর (রা) কোন একটি বিষয় নিয়ে গভীর চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। এমন সময় ওমরের স্ত্রী এসে বললেন, তুমি কি নিয়ে বেশি চিন্তা করছ? ওমর (রা) বললেন, আমার বিষয়

সম্পর্কে খোঁজ নেবার অধিকার তুমি কোথায় পেলে? প্রত্যুত্তরে ওমরের স্ত্রী বললেন, তুমি আমার কথা পছন্দ কর না। কিন্তু তোমার মেয়ে হাফসা সমানে সমানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে প্রতিবাদ করে থাকে। ওমর (রা) বলেন, আমি তখনই হাফসার নিকট চলে আসলাম এবং তাকে জিজ্ঞেস করলাম, মা হাফসা! তুমি নাকি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সমানে সমানে উত্তর দিয়ে থাক? হাফসা বললেন, হ্যাঁ, অনেক সময় তাই হয়। আমি বললাম, খবরদার! কখনো এরূপ করবে না। তুমি মনে কর না যে, তোমার রূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মুগ্ধ করেছে, বরং তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি বিনয়ীভাব প্রকাশ করবে।'

হাফসা (রা)-এর এ ধরনের আচরণের কারণে একবার তো রাসূল ﷺ তাঁকে এক তালাক পর্যন্ত দিয়ে বসেন। অবশ্য হাফসার রাতভর নফল ইবাদত ও দিনের বেলা রোযা রাখার কথা স্মরণ করিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাসূল ﷺ-কে তাঁকে (হাফসাকে) গ্রহণ করে নেয়ার জন্য নির্দেশ দেন। রাসূল ﷺ আল্লাহ্‌র নির্দেশ মত কাজ করেন।

হাফসার সাথে রাসূলের ভালবাসা : এত কিছুর পরও রাসূল ﷺ হাফসাকে প্রচণ্ড ভালবাসতেন। অনেক গোপন কথাও তাঁকে বলতেন। একবার তিনি হাফসার সাথে একটি গোপন বিষয়ে আলাপ করেন এবং অন্য কারো কাছে না প্রকাশ করার জন্য বলেন। কিন্তু নারীসুলভ মানসিকতার কারণে তিনি তা আয়েশা (রা)-এর কাছে বলে দেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই রাসূল ﷺ হাফসা (রা)-এর ওপর রাগান্বিত হন। এরপর এ বিষয়কে কেন্দ্র করে সূরা তাহরীমে আল্লাহ ঘোষণা করেন–

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا ۚ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ۚ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَٰذَا ۖ قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ.

অর্থ: 'আর রাসূল যখন তাঁর এক স্ত্রীর কাছে একটি গোপন কথা বলেন, আর তিনি তা ফাঁস করে দেন, আল্লাহ তাকে সে সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি তাঁর স্ত্রীর নিকট প্রকাশ করলে তিনি বলেন, কে আপনাকে এটা বলে দিয়েছে? তিনি বললেন, যিনি মহাজ্ঞানী সর্বজ্ঞ, তিনি আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন।'

(সূরা তাহরীম : আয়াত-৩)

এ ঘটনাটিই হলো তাহরীমের ঘটনা । পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে যখন আয়েশা (রা) ও হাফসা (রা) একমত হয়ে বিষয়টি মিটিয়ে ফেলার উদ্যোগ নিলেন, তখন এ আয়াত নাযিল হয়-

اِنْ تَتُوْبَآ اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا ۚ وَاِنْ تَظٰهَرَا عَلَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ.

অর্থ : 'তোমরা উভয়ে আল্লাহ্র নিকট তওবা করলে তা তোমাদের জন্য উত্তম। কেননা তোমাদের দিল সঠিক ও নির্ভুল পথ থেকে সরে গিয়েছে। আর তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলে আল্লাহ্ই তো তাঁর প্রভু, জিবরাঈল এবং নেককার ঈমানদারগণ তো আছেই, এসবের পর আল্লাহ্র ফেরেশতারা তাঁর সহায়ক রয়েছেন।' [সূরা তাহ্রীম: আয়াত-৪]

মুনাফিকরা সব সময় তাদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য নানা ধরনের ফাঁক ফোকর খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। এ আয়াতে ঐসব মুনাফিকদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং তাদের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলা হয়েছে, 'হাফসা আর আয়েশা যদি বিরোধ চায় আর মুনাফিকরা যদি ষড়যন্ত্র করে তা দিয়ে ফায়দা হাসিল করতে চায়, তাহলে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সাহায্য করবেন। আর আল্লাহ্ তার সাথে আছেন, জিবরাঈল ফেরেশতা এবং দুনিয়ার নেককার মু'মিনগণ।

আয়েশা ও হাফসার সাময়িক দ্বন্দ্ব : তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে, 'একদা উম্মুল মু'মিনীন সাফিয়া (রা) কাঁদতে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি উত্তর দিলেন, আমাকে হাফসা বলেছে যে, আমি ইয়াহূদীর মেয়ে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তুমি নবী বংশের মেয়ে। তোমার বংশে বহু নবী আবির্ভূত হয়েছেন। বর্তমানে তুমি নবীর স্ত্রী। সুতরাং হাফসা তোমার ওপর কোন বিষয়ে গৌরব করতে পারে?'

আরো বর্ণিত আছে, 'একদিন আয়েশা ও হাফসা সাফিয়াকে বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তোমার চেয়ে অধিক প্রিয় ও মর্যাদাশালীনী। আমরা তাঁর স্ত্রী এবং একই রক্তধারার অধিকারীণী। সাফিয়া এ কথায় ক্ষুণ্ন হলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অভিযোগ পেশ করলেন। উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি একথা কেন বলনি যে, তোমরা আমার চেয়ে অধিক সম্মানিতা

কেমন করে হতে পারঃ আমার স্বামী স্বয়ং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ, আমার পিতা হারুন (আ) ও আমার চাচা মূসা (আ)।

আসলে হাফসা ও আয়েশা (রা)-এর মধ্যে খুবই মধুর সম্পর্ক ছিল। অনেক সময় তাঁরা একত্রে রাসূল ﷺ-এর সফর সঙ্গী হতেন।

ইতিহাস খ্যাত হবার কারণ : হাফসা (রা)-এর নাম যে কারণে ইতিহাসের পাতায় ও মু'মিনদের মনে অত্যন্ত মর্যাদার সাথে লেখা হয়ে আছে তাহলো তিনি ছিলেন পবিত্র কুরআনের সংরক্ষক বা হেফাজতকারী। ইয়ামামার যুদ্ধে বহুসংখ্যক কারী ও কুরআনের হাফেজ শহীদ হয়েছিলেন। 'আবূ বকর (রা)-এর খেলাফতকালে ১১ হিজরী সালে যিলহজ্জ মাসে ইয়ামামা নামক স্থানে কিছুসংখ্যক ধর্মত্যাগীর সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

এ যুদ্ধে মুসলিম সেনাপতি ছিলেন খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) এবং ধর্মত্যাগী সেনাপতি ছিলো মুসায়লামা কাযযাব। এ যুদ্ধে এত বেশি সংখ্যক কুরআনের হাফেজ শহীদ হয়েছিলেন যে, এর ফলে মক্কা মদীনায় হাফেজের সংখ্যা অনেক কমে যায়। ওমর (রা) এ ঘটনায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে আবূ বকর (রা)-এর কাছে আসলেন আল কুরআন সংকলনের সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। অনেক আলাপ আলোচনা ও চিন্তা ভাবনার পর যায়েদ ইবনে সাবিতের ওপর কুরআন সংকলনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। যায়েদ (রা) সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় এবং তৎকালীন আরবের প্রখ্যাত কারী ও হাফিজদের সহায়তায় কঠোর পরিশ্রমে পবিত্র কুরআনের একটি পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন। এটি ছিল আবূ বকর (রা)-এর খেলাফতকালে সর্বজন স্বীকৃত সরকারী পাণ্ডুলিপি।

আবূ বকর (রা) জীবদ্দশায় পাণ্ডুলিপিটি তাঁর কাছে সংরক্ষিত ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর কুরআনের এ পাণ্ডুলিপিটি ওমর (রা)-এর অধিকারে সংরক্ষিত থাকে। তাঁর ইন্তেকালের পর হাফসা (রা) কুরআনের এ পাণ্ডুলিপিটি অত্যন্ত যত্নসহকারে নিজের কাছে সংরক্ষিত করে রাখেন। খলিফা ওমর (রা)-এর খিলাফতকালে পবিত্র কুরআনের এ মূল পাণ্ডুলিপি থেকে নকল করে এক লক্ষ পাণ্ডুলিপি তৈরি করে বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো হয়।

কিন্তু ওসমান (রা)-এর খেলাফতের সময় হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান নামক এক সাহাবী যুদ্ধ উপলক্ষে আযারবাইজান গমন করে ইরাক ও সিরিয়াবাসীদের মধ্যে কুরআন পাঠে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ্য করেন। পরে তিনি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে এ বিষয়ে ওসমান (রা)-কে অবহিত করেন এবং কুরআনের উচ্চারণে এ

পার্থক্য দূরীভূত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার সুপারিশ করেন। ওসমান (রা) বিষয়টির গুরুত্ব গভীরভাবে উপলব্ধি করে এ ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ওসমান (রা) জানতেন যে আবূ বকর (রা)-এর সময়ে তৈরিকৃত কুরআনের মূল পাণ্ডুলিপিটি হাফসা (রা)-এর কাছে সংরক্ষিত আছে। ফলে তিনি হাফসার নিকট এ মর্মে খবর পাঠান যে, তিনি যেন অবিলম্বে তাঁর কাছে সংরক্ষিত পবিত্র কুরআনের পাণ্ডুলিপিটি পাঠিয়ে দেন এবং হাফসা (রা)-এর পাঠানো পাণ্ডুলিপিটির ভিত্তিতে কুরআনের নকল তৈরি করে তাঁর পাণ্ডুলিপিটি ফেরত দেয়া হবে।

হাফসা (রা) তাঁর পাণ্ডুলিপিটি খলিফা ওসমানের কাছে পাঠিয়ে দেন। ওসমান কয়েকজন লেখক যেমন– যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা) সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) এবং আবদুর রহমান ইবনে হারিস ইবনে হিশামকে কুরআনের নকল তৈরির কাজে নিয়োজিত করেন। ওসমান (রা) এ মর্মে নির্দেশ প্রদান করেছিলেন যে, কুরআনের লিখন ও পঠনে যদি মত পার্থক্য সৃষ্টি হয় তাহলে যেন কোরায়শী রীতিতেই কুরআন লেখা হয় কেননা কোরায়শী ভাষায়ই আল কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

ওসমান (রা)-এর নির্দেশে এমনিভাবে কোরায়শী রীতিতেই পবিত্র কুরআনকে সংরক্ষিত করা হয় যার অবিকল পাণ্ডুলিপি আজ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। এমনিভাবে পবিত্র কুরআন সংরক্ষণের ইতিহাস পর্যালোচনা করে আমরা দেখতে পাই মুসলমানরা যখন পবিত্র কুরআনের লিখন ও পঠনে চরম এক অনিশ্চয়তার মাঝে ছিল তখন হাফসা (রা)-এর নিকট সংরক্ষিত কুরআনের মূল পাণ্ডুলিপিটিই মুসলমানদের সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে। যদি হাফসা (রা) যত্নসহকারে এ পাণ্ডুলিপিটি সংরক্ষণ না করতেন তবে ওসমান (রা)-এর পক্ষে হয়তো সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভবপর হতো না। হাফসা (রা) পবিত্র কুরআনের সর্বজন স্বীকৃত পাণ্ডুলিপিটি এমনিভাবে সংরক্ষণ করে কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের অন্তরে অম্লান ও চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।'

হাফসা (রা)-এর সাদা-সিধে জীবন : হাফসা (রা) ব্যক্তিগত জীবনে রাগী স্বভাবের হলেও তিনি ছিলেন অসম্ভব ইবাদত বন্দেগী একজন মানুষ। এ আল্লাহভীরু মহীয়ষী নারী রাত্রি জেগে যেমন তাহাজ্জুদ আদায় করতেন, তেমনি দিনের বেলা রোযা রাখতেন। যে কারণে তিনি আল্লাহর প্রিয় বান্দীতে পরিণত হতে পেরেছিলেন। তিনি খুবই সাধারণ জীবন যাপন করতেন। মৃত্যুকালে তিনি

সহোদর আবদুল্লাহকে ডেকে বলেন, 'যৎসামান্য আসবাবপত্র যা আছে, বিষয়-সম্পত্তি সবই যেন আল্লাহর রাহে গরীব-মিসকিনদের মাঝে বিলিয়ে দেয়া হয়।'

শিক্ষার প্রতি হাফসা (রা)-এর গভীর আগ্রহ : তৎকালীন আরবে নারীগণ শিক্ষার ক্ষেত্রে ছিলেন অনেক পিছিয়ে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রচলন তখন নারী ও পুরুষ কারো ক্ষেত্রেই তেমন ছিল না। হাফসা (রা)-এর পক্ষেও অন্যান্যদের ন্যায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের কোন সুযোগ হয়নি, কিন্তু মহান শিক্ষক ও প্রিয় স্বামী রাসূল ﷺ এবং পিতা ওমর (রা)-এর সুষ্ঠু তত্ত্বাবধানে থেকে ধর্মীয় বিষয়সহ অন্যান্য বিষয়েও জ্ঞান অর্জনের অপূর্ব সুযোগ পান। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারিণী। শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি তাঁর আগ্রহও ছিল প্রবল। দ্বীনী বিষয়ে যে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল বিভিন্ন ঘটনা থেকে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

একদা রাসূল ﷺ বললেন, আমি আশা করি বদর ও হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারী কোন সাহাবী জাহান্নামে যাবে না। হাফসা (রা) এতে আপত্তি উত্থাপন করে বলেন, আল্লাহ তা'আলা তো বলেছেন– وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا

অর্থ: "তোমাদের সকলকে জাহান্নামে হাযির করা হবে।" [সূরা মারইয়াম–৭১]

নবী করীম ﷺ বললেন, হ্যাঁ, তা ঠিক, তবে এ কথাও তো আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا

অর্থ: "অতঃপর আমি আল্লাহ ভীরু লোকদের নাজাত দেব এবং জালিমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেব।" [সূরা মারইয়াম : ৭২]

হাফসা (রা)-এর এ বাক্যালাপে মুগ্ধ হয়ে এবং তাঁর মধ্যে শেখা ও জানার প্রবল আগ্রহ লক্ষ্য করে রাসূল ﷺ সব সময় তাঁকে বিভিন্ন জিনিস শেখানো এবং জ্ঞানীরূপে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। শিফা বিন্‌ত আবদুল্লাহ (রা) নামে এক মহিলা সাহাবী লেখা-পড়া জানতেন। হাফসা (রা) তাঁর নিকট থেকেই লেখা শিখেন। রাসূল ﷺ তার সকল স্ত্রীর শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে মহান ও আদর্শ শিক্ষকের ভূমিকা পালন করেন।

এ শিফা (রা) নামলা নামক এক প্রকার ক্ষতরোগ নিরাময়ের ঝাড়-ফুঁক জানতেন। জাহিলী যুগে তিনি এ ঝাড়-ফুঁক করতেন। একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, আমি জাহিলী জীবনে ঝাড়-ফুঁক করতাম। আপনি অনুমতি দিলে সে মন্ত্র আপনাকে শুনাবো। রাসূল ﷺ শুনে বললেন, এ

Contents

ঝাড়-ফুঁকটি তুমি হাফসাকে শিখিয়ে দাও। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, রাসূল ﷺ শিফা (রা)-কে বলেন : তুমি কি হাফসা (রা)-কে এ 'নামলার' মন্ত্রটি শিখিয়ে দেবে না, যেমন তাঁকে লেখা শিক্ষা দিয়েছ?

এসব বর্ণনা হতে হাফসা (রা)-এর জ্ঞান চর্চার আগ্রহ-উদ্দীপনা এবং এ বিষয়ে নবী ﷺ-এর ভূমিকা অবগত হওয়া যায়।

হাদীস শিক্ষা ও বর্ণনায় তাঁর অবদান

পিতা ওমর (রা)-এর কাছে লেখাপড়া শিখেছিলেন হাফসা (রা)। রাসূল ﷺ স্বয়ং ছিলেন তাঁর শিক্ষক। হাফসা (রা) রাসূল ﷺ-এর নিকট থেকে কুরআন, হাদীস, ফিকাহ, উসূল এবং শরীয়তের অন্যান্য বিষয় আদ্যপান্ত শিক্ষা লাভ করেন। যে কারণে নারীদের জন্য প্রয়োজনীয় সব জ্ঞানে তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। কুরআন হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে তিনি পারদর্শী ছিলেন। অনেক প্রখ্যাত সাহাবীই তাঁর ছাত্রদের পর্যায়ভুক্ত ছিলেন। এ ব্যাপারে পুরুষদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, হামযা ইবনে আবদুল্লাহ, হারেসা ইবনে ওয়াহাব, আবদুর রহমান ইবনে হারেস (রা) প্রমূখ এবং মহিলাদের মধ্যে সাফিয়া বিনতু আবূ ওবায়দা এবং উম্মে মুবাশশির আনসারিয়ার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। হাফসা (রা)-এর জ্ঞান ও প্রতিভা সারা বিশ্বে এখনো মশহুর হয়ে আছে যা মুসলিম জাহানের কল্যাণ সাধনে অকল্পনীয় সহায়ক হয়েছে।

শিফা (রা)-এর নিকট থেকে হাফসা (রা) যেখানে রাসূলের নির্দেশে নামলার মন্ত্র শিখেছেন, সে ক্ষেত্রে দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হাদীসের জ্ঞান রাসূল ﷺ থেকে অর্জন করবেন, এটাই স্বাভাবিক।

নবীপত্নী হিসেবে রাসূল ﷺ-কে কাছ থেকে দেখার, তাঁর থেকে অনেক কিছু জানার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। যার ফলশ্রুতিতে হাদীস শিক্ষা ও বর্ণনায় তিনি উজ্জ্বল অবদান রেখেছেন।

তাঁর থেকে মোট ৬০ (ষাট) টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এগুলো তিনি খোদ রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং স্বীয় পিতা ওমর (রা) থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসগুলোর মধ্যে চারটি হাদীস মুত্তাফাকুন আলাইহি এবং ছয়টি হাদীস ইমাম বুখারী (রা) এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া আমাদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীস পুনরুক্তিসহ সহীহ বুখারীতে ১১ টি, সহীহ মুসলিমে ১৪ টি, জামি আত-তিরমিযীতে ১২টি, সুনান আবূ দাউদে ৬টি, সুনান আন-নাসাঈতে ৪০টি এবং সুনান ইবন মাজায় ৭টি সংকলিত হয়েছে।

তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীসের কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো

١. عَنْ حَفْصَةَ (رضى) أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوْا بِعُمْرَةٍ لَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ ؟ قَالَ : إِنِّى لَبَدْتُ رَأْسِى وَقَلَّدْتُ هَدْيِى فَلاَ أَحِلُّ حَتّٰى أَنْحَرَ .

১. হাফসা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! মানুষের কি হলো যে তারা ওমরার ইহরাম হতে হালাল হয়ে গেল, অথচ আপনি উমরা হতে হালাল হননি। তিনি বললেন : আমার কুরবানীর জন্তুর গলায় চিহ্ন লাগিয়ে দিয়েছি। কুরবানী না করা পর্যন্ত আমি হালাল হবো না।

(বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ.-২১২)

٢. عَنْ حَفْصَةَ (رضى) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : خَمْسٌ مِّنَ الدَّوَابِّ لاَحَرَجَ عَلٰى مَنْ قَتَلَهُنَّ : اَلْغُرَابُ وَ الْحَدَاةُ وَالْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ .

২. হাফসা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পাঁচটি জন্তু হত্যা করায় কোন পাপ নেই। সেগুলো হলো : কাক, চিল, ইঁদুর, বিচ্ছু এবং দু'চোখের উপর কালো দাগ বিশিষ্ট পাগলা কুকুর। (বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ.-২৪৬)

٣. عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضى) أَنَّ حَفْصَةَ (رضى) أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْاَذَانِ لِصَلٰوةِ الصُّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلٰوةُ .

৩. ইবন ওমর (রা) বলেন, হাফসা (রা) তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন যে, মুয়ায্‌যিন যখন ফজরের আযান শেষ করতেন এবং সকালের উদয় হতো তখন নবী ﷺ ফরয সালাতে দাঁড়াবার পূর্বে হালকাভাবে দু'রাক'আত সালাত পড়তেন।

(মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃ.-২৪৬)

٤. عَنْ حَفْصَةَ (رضى) قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ -

৪. হাফসা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সিয়ামদার অবস্থায় (স্ত্রীদেরকে) চুম্বন করতেন। (মুসলিম ১ম খণ্ড পৃ.-২৪৬)

٥. عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَفْصَةَ (رضى) زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ لَمْ يَجْمَعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ -

৫. সালিম ইবন আবদুল্লাহ তাঁর পিতা হতে তিনি হাফসা (রা) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে দৃঢ়ভাবে সিয়ামের নিয়ত বা সংকল্প না করবে, তার সিয়াম হবে না।

(সুনানে আবু দাউদ ১ম খণ্ড-পৃ. ৩৩৩)

৬. হাফসা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বিছানায় শুতে আসতেন তখন তিনি তাঁর ডান হাতকে গালের নিচে রেখে এ দু'আ তিনবার পড়তেন–

رَبِّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تُبْعَثُ عِبَادَكَ

"হে প্রভু! তোমার বান্দাদেরকে যে দিন উত্থিত করবে সে দিনের আযাব হতে আমায় রক্ষা কর। (মুসনাদে আহমাদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩১৯)

ওফাত : আমীর মুয়াবিয়ার শাসনামলে হিজরী ৪৫ সনে ৬৩ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর দিনেও হাফসা (রা) রোযা ছিলেন এবং রোযা অবস্থায়ই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তৎকালীন মদীনার শাসনকর্তা মারওয়ান বিন হাকাম তাঁর জানাযার সালাত্ পড়ান। আবূ হোরায়রা (রা) কবর পর্যন্ত তাঁর লাশ বহন করে নিয়ে যান। এরপর আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ও তাঁর পুত্রগণ লাশ কবরস্থ করেন। জান্নাতুল বাকী নামক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। রাসূল ﷺ-এর ঔরসে তাঁর কোন সন্তান জন্মলাভ করেনি। মূলত তিনি ছিলেন নিঃসন্তান।

৪. মারইয়াম (عليها السلام)

মারইয়াম বিনতে ইমরান, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ ﷺ, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর স্ত্রী খাদীজা ও ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া জান্নাতী রমণীদের সরদার হবে–

عَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَيِّدَاتُ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ بَعْدَ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ فَاطِمَةُ وَخَدِيْجَةُ وَاٰسِيَةُ امْرَاَةُ فِرْعَوْنَ .

জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : জান্নাতী রমণীদের সরদার মারইয়াম বিনতে ইমরান এর পরে ফাতেমা, খাদীজা ও ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া।

(তাবরানী : সিলসিলা আহাদিস সহীহা লি আলবানী; হাদীস নং-১৪৩৪))

নাম ও পরিচয় : মারইয়াম (عليها السلام) ছিলেন ঈসা (عليه السلام)-এর মাতা। বাইবেলের ইংরেজি অনুবাদে তাঁকে Mary নামে উল্লেখ করা হয়েছে এবং উর্দূ ও আরবী বঙ্গানুবাদে সাধারণত কুরআন কারীম-এর অনুসরণ করে মারইয়াম (عليها السلام) শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে।

ইয়াহুদীদের ধর্মীয় সাহিত্যে মারইয়াম মূসা (عليه السلام) ও হারূন (عليه السلام)-এর বোনের নাম কুরআন কারীমে মারইয়াম বিনতে ইমরান (ইমরানের কন্যা) (যা সূরা তাহরীমের ১২ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে : ১২) এবং উখ্‌ত হারূন' (হারুনের ভগ্নী) (সূরা মারইয়ামের ২৮ নং আয়াতে] নামেও উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর জন্ম ও প্রাথমিক অবস্থার বিবরণ সূরা আলে ইমরানে বর্ণিত হয়েছে এবং পরবর্তী অবস্থা, বিশেষত ঈসা (عليه السلام)-এর জন্মের বিশদ বর্ণনা এসেছে সূরা মারইয়ামেই।

আল্লামা ইব্‌ন কাছীর মারইয়াম (عليها السلام)-কে সুলায়মান (عليه السلام)-এর বংশধর বলে উল্লেখ করেছেন এবং ইহাও উল্লেখ করেছেন যে, কুরআন মাজীদে আল্লাহ্‌র বাণী–

إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ـ

"আদমকে, নূহকে ও ইবরাহীম (ﷺ)-এর বংশধর এবং ইমরান-এর বংশধরকে আল্লাহ বিশ্বজগতে মনোনীত করেছেন" (সূরা আলে ইমরান : ৩৩) আয়াতে ইমরান শব্দটি দ্বারা মারইয়াম (ﷺ)-এর পিতাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। ইব্‌ন কাছীর মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার-এর বর্ণনায়, ইমরান- এর বংশ তালিকা নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন।

মারইয়াম (ﷺ)-এর জন্ম : উল্লেখিত ইমরান মূসা (ﷺ)–এর পিতা এবং দ্বিতীয় ইমরান মারইয়াম (ﷺ)-এর পিতা। আর উভয়ের মধ্যে প্রায় ১৮০০ বৎসরের ব্যবধান- এর কোনও সন্তান ছিল না। তাঁর স্ত্রী হান্না বিন্‌ত ফাকুয- তিনি ছিলেন বন্ধ্যা যিনি পরবর্তী সময়ে মারইয়াম (ﷺ)-এর মা হন। একদিন হান্না একটি পাখিকে ঠোঁটের সাহায্যে তার বাচ্চাকে আহার করতে দেখলেন। তখন তাঁর অন্তরে খুব আঘাত লাগল এবং সন্তানের কামনায় তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে তিনি আল্লাহ্‌র নিকট হাত তুলে দু'আ করলেন।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দু'আ কবুল করলেন এবং কিছুদিন পরেই তিনি আশান্বিত হলেন। এ আশান্বিত অবস্থায়ই তিনি মানত করলেন যে, ভাবী সন্তানকে তিনি বায়তুল মাকদাস এর খিদমতে উৎসর্গ করবেন। যেমন কুরআন মাজীদে উল্লিখিত হয়েছে–

اِذْقَالَتِ امْرَاَةُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ مَافِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ وَضَعْتُهَآ اُنْثٰى وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى وَاِنِّيْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّيْٓ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ

যখন ইমরানের স্ত্রী বলেছিল : হে আমার রব! আমার গর্ভে যা আছে তা একান্ত তোমার জন্য আমি উৎসর্গ করলাম। অতএব তুমি আমার নিকট থেকে তা কবুল

কর, তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। অতঃপর যখন সে উহাকে প্রসব করল, তখন সে বলল : হে আমার রব! আমি তো কন্যা প্রসব করেছি। সে যা প্রসব করেছে আল্লাহ তা ভাল করেই জানেন। ছেলে সন্তান কন্যা সন্তানের মত নয়! আমি উহার নাম মারইয়াম রেখেছি এবং অভিশপ্ত শয়তান থেকে তার ও তার বংশধরদের জন্য তোমার আশ্রয় নিচ্ছি। (সূরা আলে ইমরান : ৩৫-৩৬)

আল্লামা ইবনে কাসীর লিখেছেন যে, মারইয়াম-এর মা কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ায় এ জন্য আক্ষেপ করেছিলেন যে, তখনকার সময়ে ইয়াহুদীগণ বায়তুল মাকদাস এর খেদমতের জন্য তাদের পুত্র সন্তানদেরকে উৎসর্গ করত।

হান্না তাঁর মানতের নিয়্যত পরিবর্তন করলেন না, অবশ্য মারইয়াম-এর পক্ষে যেহেতু পুরুষ খাদিম ও পুরোহিতদের ন্যায় দায়িত্ব পালন করা অসম্ভব ছিল, এজন্য তাঁকে ইবাদত বন্দেগীর জন্য উৎসর্গ করে দেন এবং এ শিশুর জন্য ও তার পরবর্তী বংশধরদের জন্য আল্লাহ্র নিকট এ দু'আ করলেন, "হে আল্লাহ! তুমি তাকে অভিশপ্ত শয়তান থেকে রক্ষা কর।"

একজন মা তার কলিজার টুকরা সন্তানের জন্য যে হাদিয়া ও উপঢৌকন পেশ করতো, তন্মধ্যে এ দু'আ সর্বশ্রেষ্ঠ উপঢৌকন। সায়্যিদ কুতুব- এর ভাষায় এ হৃদয়-নিঃসৃত বাণী এবং অন্তরের আবেগ ও আকুতি- আপন সন্তানকে অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয়ে সোপর্দ করে দেয়া ইহা অপেক্ষা উত্তম ও কল্যাণকর আর কোন জিনিসই ছিল না।

আল্লাহ তা'আলা মারইয়ামের মাতার এ অন্তর-নিঃসৃত দু'আ কবুল করেছিলেন। আবু হুরায়রা : নবী করীম ﷺ হতে নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন—

مَا مِنْ مَّوْلُوْدٍ يُوْلَدُ مَسَّهُ الشَّيْطَانُ حِيْنَ يُوْلَدُ فَيَتَسَهَّلُ صَارِخًا مِنْ مَسِّهِ اِيَّاهُ اِلاَّ مَرْيَمَ وَابْنَهَا .

সকল শিশুই জন্মগ্রহণের সময় শয়তান তাকে স্পর্শ করে। অতঃপর তার সে স্পর্শের ফলে শিশু চীৎকার করে কেঁদে উঠে। কিন্তু মারইয়াম ও তাঁর পুত্র শয়তানের এ স্পর্শ থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন।

ইব্ন কাসীর এ বিষয়-বস্তুর ওপর কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেছেন (তাফসীরুল- কুরআনিল- আজীম, ১ম, ৩৫৯০)

মারইয়াম (عليها السلام) প্রতিপালন : কুরআন মাজীদে মারইয়াম (عليها السلام)-এর মায়ের দু'আ কবুল হওয়া এবং তাঁর উত্তম হাতে প্রতিপালিত হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে–

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَّأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا .

"তার পালনকর্তা তাকে সাগ্রহে কবুল করলেন এবং তাকে উত্তমরূপে লালন-পালন করলেন এবং তিনি তাকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে রেখেছিলেন।" (সূরা আলে ইমরান : ৩৭)

ইব্‌ন কাছীর ইব্‌ন ইসহাক এর সূত্রে লিখেছেন যে, শৈশবেই মারইয়াম-এর পিতা ইন্তেকাল করেন এবং তিনি এতীম হয়ে যান। অন্য আর একজনের সূত্রে এ কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ঐ সময়ে বনী ইসরাঈল গোত্রের মধ্যে ভীষণ দূর্ভিক্ষ চলেছিল, এজন্য তাঁর তত্ত্বাবধানের প্রশ্ন দেখা দিল। কারণ যা-ই হউক না কেন, এটাই সঠিক ঘটনা যে, তাঁর তত্ত্বাবধানের প্রশ্নটি অবশ্যই উঠেছিল।

এ পরিপ্রেক্ষিতে কুরআন মাজীদের আলোকে এ কথা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, মারইয়াম-এর মা তাঁকে উপাসনালয়ে সোপর্দ করে দেয়ার মানত করেছিলেন, যাতে গোটা জীবন তিনি ইবাদত বন্দেগীতে কাটাতে পারেন। আর যেহেতু তিনি কন্যা সন্তান ছিলেন সেহেতু এটা খুবই জটিল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, উপাসনালয়ের বিভিন্ন পুরোহিতের মধ্যে কে তাঁর অভিভাবক নিযুক্ত হবেন। সকল পুরোহিতই তাঁর নিজের তত্ত্বাবধানে রাখার আগ্রহী ছিলেন। কুরআন মাজীদের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মারইয়াম এর তত্ত্বাবধানের বিষয়টি নিয়ে তুমুল বাক-বিতণ্ডা হয় এবং অবশেষে পুরোহিতগণের মধ্যে লটারী করে ইহার শান্তিপূর্ণ মীমাংসা বলে স্থিরীকৃত হল। এ বিষয়ে কুরআন মাজীদের ঘোষণা–

ذٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ص وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ .

"ইহা অদৃশ্য বিষয়ের খবর যা তোমাকে ঐশী বাণী দ্বারা অবহিত করছি। মারইয়াম-এর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাদের মধ্যে কে গ্রহণ করবে, এর জন্য যখন

তারা (উপসনালয়ের পুরোহিতগণ) তাদের কলম নিক্ষেপ করতে ছিল তুমি তখন তাদের নিকট ছিলে না এবং তারা যখন বাদানুবাদ করছিল, তখনও তুমি তাদের নিকট ছিলে না' (সূরা আলে ইমরান : ৪৪)।

আবু বকর ইবনু'ল আরাবী এর বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন, যাকারিয়া বললেন : মারইয়াম-এর তত্ত্বাবধানের আমিই বেশী হকদার, কারণ তার খালা হল আমার স্ত্রী। বনী ইসরাঈল গোত্রের ব্যক্তিবর্গ বলল : আমাদেরই বেশী হক, কারণ সে আমাদের আলিম-এর কন্যা। অতএব লটারী করার সিদ্ধান্ত হল এবং এ শর্ত আরোপ করা হল যে, প্রত্যেকে প্রবাহমান পানিতে তার কলম ফেলবে। যার কলম স্থির থাকবে এবং স্রোতের সাথে ভেসে যাবে না, সে-ই তত্ত্বাবধায়ক হবে। এরপর ইবনুল আরাবী নবী করীম ﷺ-এর নিম্নোক্ত হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন–

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَجَرَتِ الْأَقْلَامُ وَعَالَ قَلَمُ زَكَرِيَّا وَكَانَتْ آيَةً لِأَنَّهُ نَبِيٌّ تَجْرِي الْآيَاتُ عَلَيْهِمْ.

সকলের কলমই ভেসে গেল শুধু যাকারিয়ার কলম স্থির রইল। এটা ছিল একটি মু'জিযা, কারণ তিনি নবী ছিলেন। অতএব তাদের ওপর তাঁর মু'জিযা কার্যকর হল' (আহকামুল কুরআন, কায়রো ১৩৩১ হি. ১ খ. ১১৪ আরও দ্র. আল-বিদায়া : ওয়ান-নিহায়া : ২য় খ, ৫৮)

যা হউক, কুরআন মাজীদে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, উপাসনালয়ের এ পবিত্র আমানাত অর্থাৎ মারইয়াম (عليها السلام) যাকারিয়া (عليه السلام)-এর তত্ত্বাবধানে আসলেন। ইব্ন কাছীর ইব্ন ইসহাক ইব্ন জারীর এবং অন্যান্য মুফাসসির এ অভিমত ব্যক্ত করে বলেছেন যে, যাকারিয়া মারইয়াম এর খালু ছিলেন, ---- কারো কারো মতে এ মতটিও উল্লেখ করেছেন যে, তিনি মারইয়াম এর ভগ্নীপতি ছিলেন। কারণ হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে, সেখানে তিনি ইয়াহইয়া ও ঈসা-র সাক্ষাত পেলেন, তাঁরা ছিলেন পরস্পর খালাতো ভাই। কিন্তু স্বয়ং ইবনে কাছীরে আর একটি উত্তম ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

আর তা كَفَّلَهَا زَكَرِيَّا (যাকারিয়াকে তাঁর তত্ত্বাবধায়ক করলেন)। এর সহিহ অধিক সঙ্গতিপূর্ণ। তা হল– আল্লাহ তা'আলা যাকারিয়াকে তাঁর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করলেন তাঁর নেক আমল ও কল্যাণের কারণে, যাতে তিনি যাকারিয়ার অগাধ ইলম ও আমাল-ই সালিহ (নেক কাজ) আয়ত্ত করতে পারেন

দলীল-প্রমাণের দ্বারা এটাই প্রমাণিত করবার চেষ্টা করেছেন যে, যাকারিয়া (আলাইহিস সালাম)-এর মারইয়াম (আলাইহাস সালাম)-এর খালার স্বামী ছিলেন। এ মতটিই অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। কারণ পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, মারইয়াম এর মা পূর্বে বন্ধ্যা ও নিঃসন্তান ছিলেন। আল্লাহর নিকট তাঁর প্রার্থনায় একমাত্র কন্যা মারইয়াম (আলাইহাস সালাম)-এর জন্ম হয়]।

পরিণত বয়সে মারইয়াম (আলাইহাস সালাম) : মারইয়াম (আলাইহাস সালাম) যখন পরিণত বয়সে পৌঁছলেন তখন বাইতুল মাকদাস-এর উপাসনালয়ে একটি কক্ষে ইয়াহুদীগণ (যাকে মিহরাব বলে থাকে) দিবারাত্র ইবাদতে লিপ্ত থাকতে লাগলেন। আর যখনই যাকারিয়া (আলাইহিস সালাম) খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য তাঁর নিকট গমন করতেন তখনই তাঁর কক্ষে আল্লাহর নি'আমত (ফল-ফলাদি) দেখতে পেতেন। কুরআন মাজীদে উল্লেখিত হয়েছে–

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۙ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۖ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاۤءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

'যখনই যাকারিয়া (আলাইহিস সালাম) কক্ষে তার সাথে সাক্ষাত করতে যেত, তখনই তার নিকট খাবার সামগ্রী দেখতে পেত। সে বলত, হে মারইয়াম! এসব তুমি কোথা থেকে পাও। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযিক দান করেন'।

(সূরা আলে ইমরান : ৩৭)

যাকারিয়া (আলাইহিস সালাম) তাঁর নিকট শীতকালে গ্রীষ্মকালীন ফল এবং গ্রীষ্মকালে শীতকালীন ফল দেখতে পেতেন' (তাফসীরুল কুরআনিল আযীম ১ম ৩৬০ আরও দ্র, আল-বিদায়া : ওয়ান-নিহায়া, ২খ, ৫৮) এরই সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি ঘটনা ফাতিমাতুয যাহরা (রা) প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়ে থাকে যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, বেটী তুমি এটা কোথায় পেয়েছো? তিনি বললেন, হে পিতা! উহা আল্লাহর পক্ষ থেকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযিক দান করেন।

তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফাতিমা (রা)-কে মারইয়াম (আলাইহাস সালাম)- এর সাথে সামঞ্জস্যশীল বলে আখ্যায়িত করলেন এবং সে খাবারে এতই বরকত হল যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

তাঁর সকল পত্নী, আলী, ফাতিমা ও হাসান হুসাইন (রা) সকলেই তৃপ্তিসহকারে পেট ভর্তি করে ভক্ষণ করলেন ও বাকী খাবার প্রতিবেশীদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হল। (দ্র. উল্লিখিত গ্রন্থ, ১খ. ৩৬০)।

মহৎতি নারী মারইয়াম (عليها السلام) : কুরআন মাজীদে মারইয়াম (عليها السلام)-কে সতী-সাধ্বী, নেককার এবং তখনকার সময়ে বিশ্বের নারী নেত্রী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর তাকওয়া, পরহেযগার ও ইবাদতের কথা উল্লেখ করত তাঁর উচ্চ মর্যাদা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, ফেরেশতা তাঁর নিকট আগমন করে–

وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ . يٰمَرْيَمُ اقْنُتِىْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِىْ وَارْكَعِىْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ .

"আর যখন ফেরেশতাগণ বলেছিল হে মারইয়াম! আল্লাহ্ তোমাকে মনোনীত ও পবিত্র করেছেন এবং বিশ্বের নারীদের মধ্যে তোমাকে মনোনীত করেছেন। হে মারইয়াম! তোমার পালনকর্তার অনুগত হও ও সিজদা কর এবং যারা রুকূ করে তাদের সাথে রুকূ কর। (সূরা আলে ইমরান : ৪২-৪৩)

ঈসা (عليه السلام)-এর জন্মের সুসংবাদ : কুরআন মাজীদে সে সময়ের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে যখন কুমারী মারইয়ামকে ফেরেশ্‌তা এসে একটি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ জানালেন তখন তিনি যারপর সে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলেন–

اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ق اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ . وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ . قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ ط قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ط اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ .

"আর, যখন ফেরেশতাগণ বলল, হে মারইয়াম! আল্লাহ তোমাকে তাঁর পক্ষ থেকে একটি কথার সুসংবাদ দিচ্ছেন। তার নাম মাসীহ্ মারইয়াম তনয় ঈসা, সে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত এবং সান্নিধ্যপ্রাপ্তগণের অন্যতম হবে। সে দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলবে এবং সে হবে নেককারদের একজন। সে বলল, হে আমার পালনকর্তা। আমাকে তো কোন পুরুষ স্পর্শ করে নি। আমার সন্তান হবে কিভাবে? তিনি বললেন, এভাবেই আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন, 'হও" এবং তা হয়ে যায়" (সূরা আলে ইমরান : ৪৫-৪৭)।

ঈসা মাসীহ্-এর অলৌকিক জন্মের বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে সূরা মারইয়ামে। কুরআন মাজীদে এত স্পষ্টভাবে এ অলৌকিক জন্মের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যে, তাতে আর কোনও প্রকার সন্দেহের সুযোগ থাকে না। ইয়াহুদী ও খৃষ্টানগণ যেহেতু মাসীহ - এর জন্ম প্রসঙ্গে বহু অলীক কল্প-কাহিনী প্রসিদ্ধ করে রেখেছিল, সেহেতু সূরা মারইয়াম-এ ঈসা (عليه السلام)-এর জন্মের উল্লেখ করে বলা হয়েছে : (হে রাসূল!) বর্ণনা কর এ গ্রন্থে উল্লিখিত মারইয়ামের কথা, যখন সে তাঁর পরিবারবর্গ থেকে আলাদা হয়ে নিরালায় পূর্বদিকে একস্থানে আশ্রয় নিল, অতঃপর তাদের থেকে নিজকে আড়াল করবার জন্য সে পর্দা করল।

অতঃপর আমি তার নিকট আমার রূহ (জিবরাঈল)- কে পাঠালাম, সে তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল। মারইয়াম বলল, তুমি যদি আল্লাহকে ভয় কর তবে আমি তোমার থেকে দয়াময়ের আশ্রয় নিচ্ছি। সে বলল, আমি তো কেবল তোমার প্রতিপালক-প্রেরিত। তোমাকে এক পবিত্র পুত্র হওয়ার সুসংবাদ দিচ্ছি। সে বলল কীভাবে আমার পুত্র হবে যখন আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করে নাই এবং আমি ব্যভিচারিণীও নই?" সে বলল, এমনিতেই হবে। তোমার পালনকর্তা বলেছেন, এটা আমার জন্য সহজসাধ্য এবং আমি তাকে এজন্য সৃষ্টি করব যেন সে হয় মানুষের জন্য এক নিদর্শন ও আমার নিকট থেকে এক অনুগ্রহ। এতে এক স্থিরীকৃত বিষয়।

তৎপর সে গর্ভে উহাকে ধারণ করল। অতঃপর তাসহ এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেল। প্রসব-বেদনা তাকে এক খেজুর গাছের নীচে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। সে বলল, হায়, তার পূর্বে আমি যদি মৃত্যুবরণ করতাম ও লোকের স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হতাম। ফেরেশতা তার পার্শ্ব থেকে ডেকে তাকে বলল, তুমি দুঃখ করো না, তোমার পাদদেশে তোমার পালনকর্তা এক নহর সৃষ্টি করেছেন, তুমি

তোমার দিকে খেজুর গাছের ডালা নাড়া দাও, উহা তোমাকে তাজা খেজুর দান করবে, সুতরাং আহার কর, পান কর ও চক্ষু জুড়াও। মানুষের মধ্যে কাউকে যদি তুমি দেখ তখন বলিও, আমি দয়াময়ের উদ্দেশ্যে মৌনতা অবলম্বনের মানত করেছি।

অতএব আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের সাথে বাক্যালাপ করব না। অতঃপর সে সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হল। তারা বলল, হে মারইয়াম! তুমি এক আশ্চর্য কাণ্ড করে বসেছ। হে হারূন- ভগ্নী তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিল না এবং তোমার মাও ছিল না ব্যভিচারিণী। অতঃপর মারইয়াম সন্তানের প্রতি ইঙ্গিত করল।

তাঁরা বলল, যে কোলের শিশু তার সাথে আমরা কেমন করে কথা বলব? সে বলল, আমিতো আল্লাহর বান্দা তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন, আমাকে নবী নির্বাচন করেছেন, যেখানেই আমি থাকি না কেন, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন জীবিত আছি ততদিন সালাত ও যাকাত আদায় করতে- আর আমাকে আমার মায়ের প্রতি অনুগত করেছেন এবং তিনি আমাকে করেন নাই উদ্ধত ও হতভাগ্য। আমার প্রতি শান্তি যেদিন আমি জন্ম লাভ করেছি। যেদিন আমার মৃত্যু হবে এবং যেদিন আমি জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হবো।

ইবুন কাছীর ঈসা (عليه السلام)-এর অলৌকিক জন্ম প্রসঙ্গে বর্ণনা দিতে গিয়ে এ রহস্য বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা" عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ (মারইয়াম-তনয়) বলে ঈসা (عليه السلام)- কে তাঁর মায়ের সাথে সম্পর্কিত করেছেন এজন্য যে তাঁর কোন পিতা ছিল না। (তাফসীরুল- কুরআনিল আজীম, ১ খ, ৩৬৪)।

ইবনুল আরাবী (মৃ. ৫৪২ হি.) লিখেছেন যে, তিনি ৪৮৫ হি. বায়ত লাহাম- এ খৃষ্টানদের গির্জার একটি গুহা দেখলেন, সেখানে একটি মস্ত খেজুর ডালা ছিল এবং সেখানকার পাদ্রীগণ সর্ব-সম্মতভাবে উহাকে جِذْعُ مَرْيَمَ বা মারইয়াম- এর খেজুর ডালা বলে অভিহিত করত।

তাবারী ঈসা (عليه السلام)-এর অলৌকিক জন্ম প্রসঙ্গে বর্ণনা দিতে গিয়ে সেখানে এ কথা প্রমাণ করেছেন যে, মু'জিযা : কেবল যে নবীগণ হতেই প্রকাশিত হবে তা নয়, বরং নবী নন এমন ব্যক্তি হতেও উহা প্রকাশ হতে পারে (আর তখন এ অলৌকিক ঘটনাকে কারামাত বলা হয়)। সেখানে এ বিষয়টিও স্পষ্টভাবে উল্লেখ

করেছেন যে, মারইয়াম নবী ছিলেন না (মাজমাউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, বৈরূত ১৯৫৬ খৃ. ১৬ খ. ৩৬)।

মাওলানা হিফজুর রাহমান সীউহারবী মারইয়াম (عليها السلام)-এর নবী হওয়া না হওয়া প্রসঙ্গে বিস্তারিত ও তথ্যবহুল আলোচনা করেছেন এবং পক্ষ-বিপক্ষ উভয় দলের দলিল-প্রমাণ বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন (কাসাসুল কুরআন, করাচী ১৯৭২ খৃ. ৪ খ, ২২- ২৩)। আল্লামা কুরতবী উল্লেখ করেছেন যে, খ্রিস্টানদের ধারণা অনুযায়ী মারইয়াম (عليها السلام)-এর বয়স ছিল ৫০ বৎসরের কিছু ওপরে। কেহ কেহ ৫৬ বৎসর বলে উল্লেখ করেছেন।

এখানে মারইয়াম (عليها السلام) প্রসঙ্গে ইয়াহুদী খৃষ্টানদের ধারণার সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা সমীচীন হবে। সূরা নিসায় ইয়াহুদীদের ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডের উল্লেখ করে কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে যে, তারা অন্যান্য জঘন্য অপরাধের পাশাপাশি মারইয়াম (عليها السلام)-এর ওপর অপবাদ আরোপের জঘন্য অপরাধও করেছিল−

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا .

ইয়াহুদীগণ (লা'নতপ্রাপ্ত হয়েছিল) তাদের কুফুরীর কারণে এবং মারইয়ামকে জঘন্য অপবাদ দেয়ার কারণে। (সূরা নিসা : ১৫৬)

যেমন সূরা মারইয়াম- এ উল্লেখিত হয়েছে− ইয়াহুদীগণ প্রথমে মারইয়াম প্রসঙ্গে সন্দেহ পোষণ করে। কিন্তু ঈসা (عليه السلام)- এর অলৌকিক জন্মের প্রমাণ যখন তাঁর দোলনা থেকে মু'জিযাসুলভ কথা বলার মাধ্যমে পেল তখন হতবাককারী এ মহান ব্যক্তিত্ব প্রসঙ্গে ইয়াহুদীদের আর কোনরূপ সন্দেহ রইল না।

অতঃপর তারা সতী- সাধ্বী মারইয়াম (عليها السلام)-কে পরবর্তী ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত কোন অপবাদ দেয় নাই, আর ঈসা (عليه السلام)- কেও কখনও অবৈধ সন্তান বলে তিরস্কার করে নি। ঈসা (عليه السلام)-এর বয়স যখন ত্রিশ বৎসর হল এবং তিনি নবুওয়াতের কাজ আরম্ভ করলেন এবং চারিত্রিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা পেশ করলেন, তখন ইয়াহুদীগণ যারা প্রতীক্ষিত ঈসা মাসীহ-এর সাথে সামরিক সংঘর্ষে মাশগুল হবে বলে পূর্বেই স্থির করে রেখেছিল− তাই তাঁর বিরোধী হয়ে গেল। তারা কেবল ঈসা (عليه السلام) প্রসঙ্গে কটুক্তি ও নিন্দাবাদ করেই ক্ষান্ত হল না, বরং তাঁর সতী-সাধ্বী মাকে গুরুতর অপবাদ দিতে শুরু করে তখন থেকেই ইয়াহুদী সাহিত্যে মারইয়াম (عليها السلام)-এর গর্ভে ঈসা (عليه السلام)-এর অলৌকিক জন্ম অস্বীকার করা হয়।

সুতরাং নিবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং সুসমাচারসমূহের সূত্রে এ কথা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, ঈসা (عليه السلام)-এর জন্ম অলৌকিক ছিল না। যেমন লুকের সুসমাচারের সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে : "We are able, however. to advance a step further, whole sections of the first two chapters of L. K. bear witness against the virgin birth" Encyclopaedia Biblica লণ্ডন, ৩খ, ৩৯৫)। উপরন্তু Origin of Virgin theory_

এর বিভিন্ন কারণ চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে আর এ কথাও প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, মারইয়াম (عليها السلام) কোন উচ্চ পর্যায়ের আধ্যাত্মিক মর্যাদার অধিকারিণী ছিলেন না, বরং তিনিও ওয়ারিসী সূত্রে প্রাপ্ত পাপের কলংক থেকে বেঁচে থাকতে পারেন নি। খৃষ্টানগণ মারইয়াম (عليها السلام)- কে সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে অতিশয় বাড়াবাড়ি করে থাকে। তাদের শিল্প সঙ্গীত ও সাহিত্যে মারইয়াম (عليها السلام) একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছেন।

খৃস্টানদের নিকট মারইয়াম (Mary) এর ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে যা তাঁকে প্রদত্ত বিভিন্ন সময়ের উপাধি থেকে আঁচ করা যায়। যথা– কুমারী মাতা (Virgin mother), দ্বিতীয় হাওয়া ' (Second Eve) প্রভু মাতা (Mother of God) চির কুমারী (Ever Virgin) প্রভৃতি। বিস্তারিত জানার জন্য দ্র. The New Encyclopaedia Britannica শিকাগো ১৯৭৪ খৃ. ৬খ, ৬৬২)।

এ বিষয়ে একটি বিশেষ কথা উল্লেখযোগ্য যে, খোদ সুসমাচার- সমূহে মারইয়াম (عليها السلام) প্রসঙ্গে এ আদব ও সম্মানের উল্লেখ অনুপস্থিত। যথা: মথি লিখিত সুসমাচারে আছে, যখন তিনি জনতার নিকট এ সকল কথা বলেছেন এমন সময়ে দেখল, তাঁর মাতা ও ভাই বাহিরে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তাঁর সাথে কথা বলতে চেয়েছিলেন। কেহ তাঁকে বলল : আপনার মা ও ভ্রাতারা বাহিরে দণ্ডায়মান আছেন এবং আপনার সাথে আলাপ আলোচনা করতে চেয়েছেন।

জবাবে তিনি সংবাদ দাতাকে বললেন : আমার মাতা কে? আমার ভ্রাতারাই বা কারা? পরে তিনি তাঁর অনুসারীদের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন : এই দেখ, আমার মাতা ও আমার ভ্রাতারা, কেননা যে কেহ আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে সে আমার ভ্রাতা, ভগিনী ও মাতা। কুরআন কারীম, যা আল্লাহ তা'আলার সংরক্ষিত ও শাশ্বত বাণী এবং যার পদ্ধতি সাময়িক ও রাজনৈতিক

কল্যাণের উর্ধ্বে, ইয়াহুদীদের পদ্ধতি ও খৃষ্টানদের মতামতের স্পষ্ট বিরোধিতা করে, ইয়াহুদী ও খৃস্টান উভয় দলের ভুলগুলো চিহ্নিতও করে দেয়। তাতে মারইয়াম (عليها السلام) একজন পুণ্যাত্মা, পরহেযগার, সতী-সাধ্বী, ইবাদতকারিণী, বিশ্ব-নারীদের নেত্রী, ফেরেশতার সাথে বাক্যালাপকারিণী এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট মুনাজাতকারিণী, অতি উচ্চ পর্যায়ের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী নারী বলে বর্ণিত হয়েছে (দ্র. ৩ : ৩৬-৩৭,৪২, ৪৫)। সুরা, মা'য়েদায় তাঁকে সিদ্দীকা (অতি সত্যবাদিনী) বলা হয়েছে। সূরা, আল-আম্বিয়ায় মারইয়াম (عليها السلام) -এর উজ্জ্বল চরিত্রের কথা এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে–

وَالَّتِىْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنٰهَا وَابْنَهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ -

আর স্মরণ কর সে নারীকে, যে নিজ সতীত্বকে রক্ষা করেছিল, অতঃপর তার মধ্যে আমি আমার রূহ আত্মা ফুঁকে দিয়েছিলাম, এবং তাকে ও তাঁর পুত্রকে করেছিলাম বিশ্ববাসীর জন্য এক নিদর্শন"(সূরা আল আম্বিয়া : ৯১)।

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِىْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ -

(আল্লাহ তা'আলা আরও দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন) ইমরান-তনয়া মারইয়াম এর- যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল। ফলে আমি তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং সে তার পালনকর্তার বাণী ও তাঁর কিতাবসমূহ সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। সে ছিল অনুগতদের একজন। (সূরা তাহরীম : ১২)

৫. আছিয়া (عليها السلام)

মারইয়াম বিনতে ইমরান, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ ﷺ, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর স্ত্রী খাদীজা ও ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া জান্নাতী রমণীদের সরদার হবে।

عَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَيِّدَاتُ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ بَعْدَ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ فَاطِمَةُ وَخَدِيْجَةُ وَاٰسِيَةُ امْرَاَةُ فِرْعَوْنَ ـ

জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : জান্নাতী রমণীদের সরদার মারইয়াম বিনতে ইমরান এর পরে ফাতেমা, খাদীজা ও ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া।

(তাবরানী : সিলসিলা আহাদিস সহীহা লি আলবানী; হাদীস নং-১৪৩৪))

পরিচিতি : আছিয়া (রা) ফিরআউন-এর স্ত্রী, তিনি একজন পূত চরিত্রের অধিকারিণী ছিলেন। বনী ইসরাঈল-এর সাথে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আছিয়া (রা) সম্পর্কে মূসা (عليه السلام)-এর চাচী অথবা ফুফী ছিলেন।

কুরআন কারীমে আছিয়া (রা)-এর নাম উল্লেখ নাই। অবশ্য ইমরাআতু ফির'আউন (অর্থাৎ ফির'আউনের স্ত্রী) শব্দাকারে দুই স্থানে উল্লেখ রয়েছে : ২৮ : ৯ ও ৬৬ : ১১। হাদীসে ফির'আউনের স্ত্রী আছিয়া (রা)-র নাম উল্লেখ রয়েছে আল-খাতীব আত-তাবরীযী, মিশকাত, দিল্লী, পৃ. ৫৭৩)।

বনী ইসরাঈলকে দুর্বল করে দমানোর উদ্দেশ্যে একদা ফির'আউন পরিকল্পনা করল যে, ভবিষ্যতে তাদের মধ্যে ছেলে সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাদেরকে হত্যা করা হবে এবং কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত রাখা হবে। ইতিমধ্যে মূসা (عليه السلام) জন্মগ্রহণ করলে তাঁর মাতা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। আল্লাহ তা'আলার আদেশক্রমে তাঁর মাতা তাঁকে (কাঠের তৈরি বাক্সে রেখে) নদীতে ভাসিয়ে দেন। এ বাক্সটি ফির'আউন পরিবারের হস্তগত হয়েছিল। শিশুটির প্রতি তাদের দয়া

হল এবং ফির'আউনের স্ত্রী (ইমরাআতু ফির'আউন) বললেন, "এ শিশুটি আমাদের চক্ষুর প্রশান্তিদায়ক হবে, তাকে হত্যা করবে না"। এভাবে এসে মূসা (عليه السلام)-কে শুধু ফির'আউনের ব্যক্তিবর্গের হাত হতেই রক্ষা করেন নাই, বরং তাঁকে ফির'আউনের প্রাসাদে লালন-পালনেরও ব্যবস্থা করেন।

সূরাতুত-তাহরীমায় আছিয়া (রা)-এর ঈমানের বিবরণ রয়েছে। মুফাসসিরগণ বলেন যে, যখন মূসা (عليه السلام) ফির'আউনের যাদুকরদেরকে পরাস্ত করেছেন তখন আছিয়া তাঁর প্রতি ঈমান আনেন। এতে ফির'আউনকে তাঁকে বিভিন্ন উপায়ে নির্যাতন করতে থাকে। ফির'আউনের নির্দেশে তাঁকে ভারী পাথরচাপা দিয়ে রাখা হয়। এ অবস্থায় তিনি দু'আ করেন—

اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِىْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَنَجِّنِىْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ۔

"হে পালনকর্তা! তোমার জান্নাতে আমার জন্য একটি ঘর তৈরি করিও এবং আমাকে উদ্ধার কর ফিরআউন ও তার দুষ্কৃতি হতে, আমাকে উদ্ধার কর সীমালংঘনকারী সম্প্রদায় থেকে।" (সূরা–৬৬ তাহরীম : আয়াত-১১)

সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহ তা'আলা আছিয়া (রা)-এর রূহকে তাঁর নিজের নিকট তুলে নিলেন।

আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা ফির'আউন এসে আছিয়া (রা)-এর প্রতি নির্যাতন চালাচ্ছিল তখন মূসা (عليه السلام) পার্শ্ববর্তী রাস্তা দিয়ে গমন করছিলেন। এ নির্যাতন প্রত্যক্ষ করে মূসা (عليه السلام) দু'আ' করলেন, "হে আল্লাহ! আপনি আছিয়া (রা)-এর জ্বালা-যন্ত্রণা দূর করে দিন।" অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আছিয়া (রা)-কে জান্নাতে তাঁর জন্য নির্ধারিত বাসস্থান দেখিয়ে দেন, এতে তিনি স্মিত হাস্য করলেন।

(দ্র. মুহাম্মদ বাকির মাজলিসী, হায়াতু'ল-কুলূব, পৃ. ৩৭৯)।

আছিয়া (রা) জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠা নারীদের অন্যতমা।

৬. উম্মু সুলাইম (রা)

তালহা (রা)-এর স্ত্রী উম্মু সুলাইমকেও নবী কারীম ﷺ জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। বেলাল (রা)-কে নবী কারীম ﷺ জান্নাতে একটি ঘরের সুসংবাদ দিয়েছেন।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُرِيْتُ الْجَنَّةَ فَرَاَيْتُ امْرَاَةَ اَبِىْ طَلْحَةَ ثُمَّ سَمِعْتُ خَشْخَشَةً اَمَامِىْ فَاِذَا بِلَالٌ ـ

জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আমাকে জান্নাত দেখানো হল, আমি আবু তালহা (রা)-এর স্ত্রী উম্মু সুলাইমকে সেখানে দেখতে পেলাম, অতঃপর আমি সামনে অগ্রসর হয়ে কোন মানুষের চলার আওয়াজ পেলাম, হঠাৎ দেখলাম বেলাল (রা) কে।

(মুসলিম : কিতাবুল ফাযায়েল, বাব মিন ফাযায়েল উম্মে সুলাইম)

পরিচিতি : উম্মু সুলাইম (রা) বিন্‌ত মিলহান ইব্‌ন খালিদ ইবন জুনদুব ইবন 'আমির ইবন গানাম 'আদী ইবন নাজ্জার। তাঁর প্রকৃত নাম সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে, সাহ্‌লা, রুমায়লা রুমায়'আ, উনায়ফা, গুমায়সা, রুমায়সা ইত্যাদি নামের উল্লেখ আছে। তাঁর মাতা মুলায়কা বিনত মালিকও ছিলেন নাজ্জার গোত্রের। সে গোত্রেরই মালিক ইবন নাদীর নামীয় এক ব্যক্তি ছিল তাঁর স্বামী। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিখ্যাত খাদিম আনাস (রা) তাঁদেরই পুত্র ছিলেন।

ইসলাম গ্রহণ : তিনি অন্যান্য আনসারীর সঙ্গে প্রথম দিকেই ইসলাম গ্রহণ করেন। এজন্য তাঁর স্বামী রাগান্বিত হয়ে সিরিয়ায় চলে যায় এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করে। তারপর নাজ্জার গোত্রীয় আবূ তালহা তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। কিন্তু তিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ না করায় উম্মু সুলাইম (রা) সম্মতি দেন নাই। অতঃপর আবূ তালহা ইসলাম গ্রহণে রাযী হয়ে উম্মু সুলাইম-এর সম্মুখে

কালিমা তায়্যিবা পাঠ করেন। তখন মাতার নির্দেশে আনাস (রা) আবু তালহার সঙ্গে তাঁর মাতার পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা করেন।

পুত্র আনাসকে রাসূলের খেদমতে অর্পণ : রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরত করে মদীনায় আগমন করলে উম্মু সুলাইম (রা) পুত্র আনাসকে সঙ্গে নিয়ে রাসূল ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হন এবং বলেন, "আমার পুত্র আনাসকে আপনার খেদমতে পেশ করছি। আপনি তাকে কবূল করুন এবং তার জন্য দু'আ' করুন।" রাসূলুল্লাহ ﷺ আনাসের জন্য দু'আ করলেন। মদীনায় মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের যে ব্যবস্থা রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছিলেন, সে সম্পর্কিত বৈঠক উম্মু সুলাইমের গৃহেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

যুদ্ধের অবদান : উম্মু সুলাইম (রা) অতি উৎসাহের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে কয়েকটি জিহাদে শরীক হন। মুসলিমের একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মু সুলাইম (রা) এবং কয়েকজন আনসারী মহিলাকে যুদ্ধের সময় তাঁর সঙ্গে নিতেন, যাতে তাঁরা মুজাহিদদেরকে পানি পান করাতে এবং তাঁদের মধ্যে কেহ আহত হলে তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করতে পারেন। উহুদ যুদ্ধে মুসলিমগণ যখন মুশরিকদের অকস্মাৎ আক্রমণে কিছুটা বিপদগ্রস্ত হয়েছিলেন তখনও উম্মু সুলাইম (রা) দৃঢ়তার সাথে তাঁর কর্তব্য পালন করে যেতে ছিলেন। তাঁর পুত্র আনাস বর্ণনা করেছেন, তিনি উম্মু'ল-মু'মিনীন আয়েশা (রা) ও উম্মু সুলাইমকে মশক ভর্তি করে পানি আনতে এবং আহতদের তা পান করতে দেখেছেন (বুখারী, কিতাবুল-মাগাযী, বাব ১৮)।

হুনায়ন-এর যুদ্ধেও উম্মু সুলাইম (রা) তরবারি হস্তে উপস্থিত ছিলেন। তরবারি দিয়ে তিনি কি করবেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলে উম্মু সুলাইম (রা) বলেন, "কোন মুশরিক নিকটে আসলে আমি তার পেট কর্তন করব।" এ উত্তর শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্মিত হাস্য করেন। খায়বারের যুদ্ধেও (৭ম হি.) তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মুল-মু'মিনীন সাফিয়্যা (রা)-কে বিবাহ করেন। উম্মু সুলাইম তখন সাফিয়্যা (রা)-কে নববধূর সাজে সাজিয়ে দিয়েছিলেন।

পঞ্চম হিজরীতে উম্মুল মু'মিনীন যয়নব (রা)-এর সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিবাহ সম্পন্ন হলে সুলাইম বড় এক পাত্রে ফিরনি প্রস্তুত করে রাসূলুল্লাহ এর খেদমতে উপস্থিত করেন। রাসূল ﷺ-এর অত্যধিক ভালবাসতেন। প্রায়ই তিনি

দ্বিপ্রহরে তাঁর গৃহে বিশ্রাম করতেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র দেহ হতে স্বেদ বিন্দু এবং তাঁর কোমল কেশ পড়ে গেলে তাও উম্মু সুলাইম সংগ্রহ করে রাখতেন। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর গৃহে তাঁর মশকে মুখ লাগিয়ে পানি পান করেন। উম্মু সুলাইম (রা) তখনই মশকটির মুখ কেটে নিজের কাছে সংরক্ষিত করেন।

বিদুষী উম্মু সুলাইম (রা) কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর পুত্র আনাস (রা), 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা), যায়েদ ইবন ছাবিত (রা), আবূ সালামা (রা) ও 'আমর ইবন 'আসিম (রা) তাঁর নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ফিক্‌হী মাসাইল সম্পর্কেও ভাল জ্ঞান রাখতেন। একবার 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস এবং যায়েদ ইবন ছাবিত (রা)-এর মধ্যে একটি মাসআলা সম্পর্কে মতবিরোধ হলে তাঁরা সিদ্ধান্তের জন্য উম্মু সুলাইমের স্মরণাপন্ন হয়েছিলেন। তিনি স্ত্রীলোক সংক্রান্ত মাসআলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নিঃসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করতেন।

মহৎ চরিত্রের অধিকারিণী উম্মু সুলাইম (রা) তাঁর প্রথম স্বামী ইসলাম গ্রহণ না করায় তাঁকে পরিত্যাগ করেন। আবূ তালহা বিবাহের প্রস্তাব দিলে তিনি ইসলাম গ্রহণের শর্ত আরোপ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, "তুমি যে ইলাহ-এর 'ইবাদত কর তার তো মৃত্তিকা হতে উৎপন্ন কাষ্ঠ দ্বারা নির্মিত। আর বৃক্ষের পূজা করতে তোমার কি লজ্জা করে না?" (ইসাবা, ৪খ, ৪৬১)

ধৈর্যশীলা উম্মু সুলাইম (রা) : পরম ধৈর্যশীলা উম্মু সুলাইম তাঁর অতি স্নেহের পুত্র আবূ 'আমির ইন্তেকাল করলে শুধু সবর অবলম্বন করেন নাই বরং স্বামী আবূ তালহা সন্ধ্যায় বাড়ি আসলে শোক সম্বরণ করে প্রতিদিনের মত যত্ন সহকারে তাঁর আহারের ব্যবস্থা করেন এবং রাত্রে তাঁর কাছেই শয়ন করেন।

পরে শোক সংবাদটি এভাবে তাঁকে শোনান : কেহ তোমার নিকট সাময়িকভাবে কিছু গচ্ছিত রাখলেও পরে ফেরত চাইলে তুমি কি তা ফেরত দিতে অস্বীকার করবে? আবূ তালহা বলেন, কখনই নয়। উম্মু সুলাইম আরও বলেন, 'ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বলেন, "এ রাত্রিটি তোমাদের উভয়ের জন্য বরকতময় রাত্রি ছিল।" সে রাত্রিতেই তিনি গর্ভবতী হন এবং পুত্র জন্মিলে তার নাম রাখা হয় 'আবদুল্লাহ।

একবার তাঁর স্বামী আবু তালহা গৃহে এসে তাঁকে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ক্ষুধার্ত আছেন, কিছু খাদ্য পাঠিয়ে দাও।" উম্মু সুলাইম পুত্র আনাসের মারফত

কিছু রুটি একটি কাপড়ে জড়িয়ে পাঠিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আনাসকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাকে কি আবূ তালহা আমাদেরকে আহারের দাওয়াত দিতে পাঠিয়েছে?"

আনাস বললেন, 'হ্যাঁ রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিকট উপস্থিত সাহাবীদের সাথে নিয়ে আবূ তালহার গৃহে গমন করলেন। খাদ্য পরিমাণে খুব স্বল্প হওয়ায় আবূ তালহা খুব বিচলিত হলেন। কিন্তু উম্মু সুলাইম স্থির চিত্তে বললেন, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সবই জানেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ গৃহে প্রবেশ করলে সে কয়টি রুটি ও সামান্য কিছু তরকারি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মুখে পরিবেশন করলেন। আল্লাহ তাতে এমন বরকত দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাথের সাহাবীগণ তৃপ্তি সহকারে আহার করলেন।

হাদীসে অনেক সৎ গুণের অধিকারিণী উম্মু সুলাইম-এর ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর মৃত্যু সন জানা নেই। অনুমিত হয়, তিনি খিলাফাতে রাশিদার আমলের প্রথম দিকেই ইন্তেকাল করেন। এক মতে তিনি খলীফা 'উছমান (রা)-এর খিলাফাত আমলে ইন্তেকাল করেন। তাঁর প্রথম স্বামীর ঔরসে আনাস ও দ্বিতীয় স্বামীর ঔরসে 'আবদুল্লাহ এ দুই পুত্র ছিলেন।

৭. যয়নব বিন্‌ত রাসূলুল্লাহ ﷺ

পরিচিতি : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা সায়্যিদা যয়নব (রা) যিনি আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত বরণ করেন। উম্মুল মু'মিনীন "আয়েশা (রা) তাঁর প্রসঙ্গে নবী করীম ﷺ-এর বাণী উল্লেখ করেছেন–

هِيَ خَيْرُ بَنَاتِيْ أُصِيْبَتْ فِيَّ -

"সে ছিল আমার সবচেয়ে ভালো কন্যা। আমাকে ভালোবাসার কারণেই তাকে কষ্ট পেতে হয়েছে।" (হায়াতুস সাহাবা-১/৩৭২)

যয়নবের (রা) সম্মানিতা মা উম্মুল মু'মিনীন খাদীজাতুল কুবরা (রা)। যিনি মুহাম্মদ ﷺ- এর রিসালাতের প্রতি সর্বপ্রথম ঈমান আনার (বিশ্বাস স্থাপনের) অনন্য গৌরবের অধিকারীনী। তাঁর মহত্ত্ব ও মর্যাদা এত বিশাল যে, বিগত সমূহের নারীদের মধ্যে কেবল মারইয়ামের (আ) সাথে যা তুলনীয়।

ইমাম আজ-জাহাবী বলেন–

زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَاَكْبَرُ اَخَوَاتِهَا مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ السَّيِّدَاتِ -

"যয়নব হলেন নবী করীম ﷺ-এর মেয়ে এবং তাঁর হিজরতকারিণী সায়্যিদাত বোনদের মধ্যে সকলে বড়।" (সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৪৬)

আবু আমর বলেন, যয়নব (রা) তাঁর পিতার কন্যাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। এ বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই। আর যারা ভিন্নমত পোষণ করেন তারা ভুলের মধ্যে আছেন। তাদের দাবীর প্রতি গুরুত্ব প্রদানের কোন হেতু নেই। তবে মতপার্থক্য যে বিষয়ে আছে তা হলো, নবী করীম ﷺ-এর ছেলে- মেয়েদের মধ্যে যয়নব প্রথম সন্তান, না কাসিম? বংশবিদ্যা বিশারদদের একটি দলের মতে আল-কাসিম প্রথম ও যয়নব দ্বিতীয় সন্তান। ইবনুল কালবী যয়নব (রা)-কে প্রথম

সন্তান বলেছেন। ইবনে সা'দের মতে, যয়নব (রা) কন্যাদের মধ্যে সবার বড়।

ইবন হিশাম নবী করীম ﷺ-এর সন্তানদের ধারাবাহিকতা এভাবে সাজিয়েছেন–

أَكْبَرُ بَنِيْهِ الْقَاسِمُ، ثُمَّ الطَّيِّبُ، ثُمَّ الطَّاهِرُ، وَاكْبَرُ بَنَاتِهِ رُقَيَّةُ، ثُمَّ زَيْنَبُ، ثُمَّ أُمُّ كُلْثُوْمَ، ثُمَّ فَاطِمَةُ.

"নবী করীম ﷺ-এর বড় ছেলে আল কাসিম, তারপর যথাক্রমে আত-তায়্যিব ও আত- তাহির। আর বড় কন্যা রুকাইয়া, তারপর যথাক্রমে যয়নব, উম্মু কুলসুম ও ফাতিমা।" (আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যা-১/১৯০)

পিতা মুহাম্মাদ ﷺ এর নবুওয়াত প্রাপ্তির দশ বছর পূর্বে যয়নব (রা)-এর জন্ম হয়। তখন নবী করীম ﷺ-এর বয়স ত্রিশ এবং মা খাদীজা (রা)-এর পঁয়তাল্লিশ বছর। যয়নব (রা)-এর শৈশব জীবনের তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তাঁরও জীবনটি সম্পূর্ণ অন্ধকারেই রয়ে গেছে। তাঁর জীবন প্রসঙ্গে যতটুকু জানা যায় তা তাঁর বিয়ের সময় থেকে।

বিবাহ : নবী করীম ﷺ-এর কন্যাদের মধ্যে সর্বপ্রথম যয়নব (রা)-এর বিয়ে অল্প বয়সে অনুষ্ঠিত হয়। তখনও পিতা মুহাম্মদ ﷺ নবুওয়্যাত প্রাপ্ত হননি।

ইমাম-আজ-জাহাবী এ মত গ্রহণ করতে পারেননি। তিনি বলেন–

ذَكَرَ اِبْنُ سَعْدٍ اَنَّ اَبَا الْعَاصِ تَزَوَّجَ بِزَيْنَبَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ وَهٰذَا بَعِيْدٌ.

ইবনে সা'দ উল্লেখ করেছেন যে, আবুল 'আস যয়নবকে আবদুল উয্যা নবুওয়্যাতের পূর্বে বিয়ে করেন। এ এক অবাস্তব কথা।

(সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৪৬)

যা হোক স্বামী আবুল 'আস ইবন আর-রাবী" ইবন আবদুল উয্যা ছিলেন যয়নবের খালাতো ভাই। মা খাদীজা (রা)-এর আপন ছোট বোন হালা বিন্ত খুওয়াইলিদের সন্তান।

বিয়ের সময় মা খাদীজা (রা)-এর উপহার : বিয়ের সময় বাবা-মা কন্যাকে যে সকল উপহার সামগ্রী দিয়েছিলেন তার মধ্যে ইয়ামেনী আকীকের একটি হারও ছিল। হারটি দিয়েছিলেন মা খাদীজা (রা)। পিতা মুহাম্মদ ﷺ ওহী লাভ করে নবী হলেন। কন্যা যয়নব (রা) তাঁর মার সাথে মুসলমান হলেন।

স্বামী আবুল 'আসের ইসলাম গ্রহণ না করা : স্বামী আবুল 'আস তখন ইসলাম গ্রহণ করেননি। নবী করীম ﷺ মদীনায় হিজরত করলেন। পরে যয়নব (রা) স্বামীকে মুশরিক অবস্থায় মক্কায় রেখে মদীনায় হিজরত করেন।

নবী করীম ﷺ যয়নব (রা) ও আবুল 'আসের মধ্যের গভীর সম্পর্ক এবং ভদ্রোচিত কর্মপদ্ধতির প্রায়ই প্রশংসা করতেন।

আবুল 'আস যেহেতু শিরকের ওপর স্থির ছিলেন, এ কারণে ইসলামের বিধান অনুযায়ী উচিত ছিল, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়া। কিন্তু নবী করীম ﷺ মক্কায় সে সময় শক্তিহীন ছিলেন। ইসলামী শক্তি তেমন শক্তিশালী ছিল না। তাছাড়া কাফিরদের জুলুম- অত্যাচারের প্লাবন সবেগে প্রবাহমান ছিল। এদিকে ইসলামের প্রচার প্রসারের গতি ছিল মন্থর ও প্রাথমিক পর্যায়ের। এ সকল কারণে তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ না ঘটানোই নবী করীম ﷺ সমীচীন মনে করেন।

আবুল 'আস স্ত্রী যয়নব (রা)-কে খুবই ভালোবাসতেন এবং সম্মানও করতেন। কিন্তু তিনি পূর্বপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করে প্রিয়তমা স্ত্রীর নতুন দ্বীন কবুল করতে কোনভাবেই রাজী হলেন না। এ অবস্থা চলতে লাগলো। এদিকে নবী করীম ﷺ ও কুরাইশদের মধ্যে মারাত্মক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত আরম্ভ হয়ে গেল। কুরাইশরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো :

তোমাদের সর্বনাশ হোক! তোমরা মুহাম্মাদের কন্যাদের বিয়ে করে তার দুশ্চিন্তা নিজেদের ঘাড়ে তুলে নিয়েছো। তোমরা যদি এ সকল কন্যাকে তার নিকট ফেরত পাঠাতে তাহলে সে তোমাদের ছেড়ে তাদেরকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়তো। তাদের মধ্যে অনেকে এ কথা সমর্থন করে বললো– এ তো অতি চমৎকার যুক্তি।' তারা দল বেধে আবুল 'আসের নিকট গমন করে বললো, আবুল 'আস, তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তার পিতার নিকট পাঠিয়ে দাও। তার পরিবর্তে তুমি যে কুরাইশ সুন্দরীকে চাও, আমরা তাকে তোমার সাথে বিয়ে দেব। আবুল 'আস বললেন, আল্লাহর কসম! না তা হয়না। আমার স্ত্রীকে আমি ত্যাগ করতে পারিনা। তার পরিবর্তে সমস্ত মহিলা আমাকে দিলেও আমার তা পছন্দ নয়।" এ কারণে রাসূল ﷺ তাঁর আত্মীয়তাকে খুব ভালো মনে করতেন এবং প্রশংসা করতেন।

যয়নব (রা) স্বামী আবুল 'আসকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। স্বামীর প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও ত্যাগের অবস্থা নিম্নের ঘটনা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

নবুওয়্যাতের ১৩ তম বছরে নবী করীম ﷺ মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন। যয়নব (রা) স্বামীর সাথে মক্কায় থেকে যান। কুরাইশদের সাথে মদীনার মুসলমানদের সামরিক সংঘাত আরম্ভ হলো। কুরাইশরা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বদরে একত্রিত হলো। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আবুল 'আস কুরাইশদের সাথে বদরে গেলেন। কারণ, কুরাইশদের মধ্যে তাঁর যে স্থান তাতে না গমন করে কোন উপায় ছিল না।

বদরের বন্দীদের সাথে আবুল 'আস : বদরে কুরাইশরা শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। তাদের বেশ কিছু নেতা নিহত হয় এবং বহু সংখ্যক যোদ্ধা বন্দী হয়। আর বাকীরা পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! এ বন্দীদের মধ্যে নবী করীম ﷺ জামাই যয়নব (রা)-এর স্বামী আবুল 'আসও ছিলেন। ইবন ইসহাক বলেন, আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর ইবন নু'মান (রা) তাঁকে বন্দী করেন। তবে আল-ওয়াকিদীর মতে খিরাশ ইবন আস- সাম্মাহর (রা) হাতে তিনি বন্দী হন।

বদরের বন্দীদের মুক্তিপণ : বদরের বন্দীদের প্রসঙ্গে মুসলমানদের সিদ্ধান্ত হলো, মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া হবে। বন্দীদের সামাজিক মর্যাদা এবং ধনী-গরীব প্রভেদ অনুযায়ী এক হাজার থেকে চার হাজার দিরহাম মুক্তিপণ নির্ধারিত হলো। বন্দীদের প্রতিনিধিরা ধার্যকৃত মুক্তিপণ নিয়ে মক্কা-মদীনা ছুটাছুটি আরম্ভ করে দিল। নবী দুহিতা যয়নব (রা) স্বামী আবুল 'আসের মুক্তিপণসহ মদীনায় লোক পাঠালেন।

আবুল 'আসের মুক্তিপণ : আল-ওয়াকিদীর মতে আবুল 'আসের মুক্তিপণ নিয়ে মদীনায় আগমন করেছিল তাঁর ভাই আমর ইবন রাবী। যয়নব মুক্তিপণ দিরহামের বদলে একটি হার প্রেরণ করেছিলেন। এ হারটি তাঁর মা খাদীজা (রা) বিয়ের সময় তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। নবী করীম ﷺ হারটি দেখেই বিমর্ষ হয়ে পড়লেন এবং নিজের বিষণ্ন মুখটি একখানা পাতলা বস্ত্র দিয়ে ঢেকে ফেললেন। জান্নাতবাসিনী প্রিয়তমা স্ত্রী ও অতি আদরের কন্যার স্মৃতি তাঁর মানসপটে ভেসে উঠেছিল।

কিছুক্ষণ পর নবী করীম ﷺ সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন: যয়নব তার স্বামীর মুক্তিপণ হিসেবে এ হারটি প্রেরণ করেছে। তোমরা ইচ্ছে করলে তার বন্দীকে ছেড়ে দিতে পার এবং হারটিও তাকে ফেরত দিতে পার। সাহাবীরা বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সন্তুষ্টির জন্য আমরা তাই করবো। সাহাবীরা রাজী হয়ে গেলেন। তাঁরা আবুল 'আসকে মুক্তি দিলেন, আর সে সাথে ফেরত দিলেন তাঁর মুক্তিপণের হারটি। তবে নবী করীম ﷺ যয়নবকে মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন।

নবী করীম ﷺ যয়নব (রা)-কে নেওয়ার জন্য আবুল 'আসের সংঙ্গে যায়েদ ইবনে হারিছাকে (রা) প্রেরণ করেন। তাঁকে "বাতান' অথবা "জাজ" নামক স্থানে অপেক্ষা করতে বলেন! যয়নব (রা) মক্কা থেকে সেখানে পৌছলে তাঁকে নিয়ে মদীনায় চলে আসতে বলেন। আবুল 'আস মক্কায় পৌছে যয়নব (রা)-কে মদীনায় যাওয়ার অনুমতি দেন।

যয়নব (রা) সফরের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত আছেন, এমন সময় হিন্দ বিনত উতবা এসে উপস্থিত হলো। প্রস্তুতি দেখে বললো : মুহাম্মাদের কন্যা, তুমি কি তোমার বাবার নিকট যাচ্ছো? যয়নব (রা) বললেন, এ মুহূর্তে তো তেমন উদ্দেশ্য নেই, তবে ভবিষ্যতে আল্লাহর যা ইচ্ছা হয়। হিন্দ বিষয়টি বুঝতে পেরে বললো : বোন, এটা গোপন করার কি আছে। সত্যিই যদি তুমি যাও, তাহলে পথে দরকার পড়ে এমন কোন কিছু দরকার হলে রাগ না রেখে বলে ফেলতে পার, আমি তোমার খিদমতের জন্য প্রস্তুত আছি।

নারীদের মধ্যে শত্রুতার সে বিষাক্ত প্রভাব তখনও বিস্তার লাভ করেনি যা পুরুষদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। এ কারণে যয়নব (রা) বলেন : হিন্দ যা বলেছিল, অন্তরের কথাই বলেছিল। অর্থাৎ আমার যদি কোন জিনিসের দরকার হতো, তাহলে অবশ্যই সে তা পূরণ করতো। কিন্তু সে সময়ের অবস্থা চিন্তা করে আমি অস্বীকার করি।

যয়নব (রা) কিভাবে মক্কা থেকে মদীনায় পৌছেন সে বিষয়ে সীরাতের গ্রন্থসমূহের বিভিন্ন রকম বর্ণনা পাওয়া যায়। এখানে কতিপয় উল্লেখ করা হলো :

ইবন ইসহাক বলেন, সফরের প্রস্তুতি শেষ হলে যয়নব (রা)-এর দেবর কিনানা ইবন রাবী একটি উট এনে দাঁড় করালো। যয়নব উটের পিঠের হাওদায় উঠে বসলেন। আর কিনানা নিজের ধনুকটি কাঁধে ঝুলিয়ে তীরের আটিটি হাতে নিয়ে দিনে দুপুরে উট হাঁকিয়ে অদূরে জী-তুয়া' উপত্যকায় তাঁদের দু জনকে ধরে ফেললো। কিনানা কুরাইশদের আচরণে ক্ষিপ্ত হয়ে কাঁধের ধনুকটি হাতে নিয়ে তীরের ধমকি শ্রবণ করে সামনে ছড়িয়ে দিয়ে বললো : তোমাদের কেউ যয়নবের নিকটে যাওয়ার চেষ্টা করলে তার সিনা হবে আমার তীরের লক্ষ্যস্থল। কিনানা ছিল একজন দক্ষ তীরন্দাজ। তার নিক্ষিপ্ত কোন তীর সচরাচর লক্ষ্যভ্রষ্ট হতো না। তার এ হুমকি আবু সুফইয়ান ইবন হারব শ্রবণ করে তার দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে বললো :

'ভাতিজা, তুমি যে তীরটি আমাদের দিকে তাক করে রেখেছো তা একটু ফিরাও। আমরা তোমার সাথে একটু আলাপ করতে চাই। কিনানা তীরটি নামিয়ে বললো, কি বলতে চান, বলে ফেলুন। আবু সুফইয়ান বললো :

তোমার কাজটি ঠিক হয়নি। তুমি প্রকাশ্যে দিনে দুপুরে মানুষের সামনে দিয়ে যয়নবকে নিয়ে বের হয়েছো, আর আমরা বসে বসে তা দেখছি। গোটা আরববাসী জানে বদরে আমাদের কী অবস্থা হয়েছিল এবং যয়নবের বাপ আমাদের কী সর্বনাশটাই না করেছে। তুমি যদি এভাবে প্রকাশ্যে তার কন্যাকে আমাদের নাকের উপর দিয়ে নিয়ে যাও তাহলে সবাই আমাদেরকে কাপুরুষ ধারণা করবে এবং এ কাজটি আমাদের জন্য অপমান বলে বিবেচনা করবে। তুমি আজ যয়নবকে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাও। কিছুদিন সে স্বামীর ঘরে থাকুক। এ দিকে জনগণ যখন বলতে শুরু করবে যে, আমরা যয়নবকে মক্কা থেকে যেতে বাধা দিয়েছি, তখন একদিন তুমি গোপনে তাঁকে তার বাবার নিকট পৌছে দিও।'

কিনানা আবু সুফিয়ানের কথা মেনে নিয়ে যয়নবসহ মক্কায় ফিরে এল। যখন ঘটনাটি মানুষের মধ্যে জানাজানি হয়ে গেল, তখন একদিন রাতের অন্ধকারে সে আবার যয়নবকে নিয়ে মক্কা থেকে বের হলো এবং ভাইয়ের নির্দেশ মত নির্দিষ্ট স্থানে তাঁকে তাঁর পিতার প্রতিনিধির হাতে তুলে দিল। যয়নব (রা) যায়েদ ইবন হারিছার (রা) সাথে মদীনায় পৌছলেন।

তাবারানী উরওয়া ইবন যুবাইর থেকে বর্ণনা করেছেন। এক ব্যক্তি যয়নব বিন্ত নবী করীম(ﷺ)কে সাথে নিয়ে মক্কা থেকে বের হলে কুরাইশদের দুই ব্যক্তি পিছু ধাওয়া করে তাদের ধরে ফেলে। তারা যয়নব (রা)-এর সংগী লোকটিকে কাবু করে যয়নব (রা)-কে উটের পিঠ থেকে ফেলে দেয়। তিনি একটি পাথরের উপর ছিটকে পড়লে দেহ ফেটে রক্ত বের হয়ে যায়। এ অবস্থায় তারা যয়নব (রা)-কে মক্কায় আবু সুফিয়ানের নিকট নিয়ে যায়। আবু সুফিয়ান তাঁকে বনী হাশিমের কন্যাদের নিকট সোপর্দ করে। পরে তিনি মদীনায় হিজরত করেন। উঠের পিঠ থেকে ফেলে দেয়ায় তিনি যে আঘাত পান, আমরণ সেখানে ব্যথা অনুভব করতেন এবং সে ব্যথায় শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেন। এজন্য তাঁকে শহীদ মনে করা হতো।

আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন। নবী করীম(ﷺ)-এর কন্যা যয়নব কিনানার সাথে মক্কা থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে বের হলো। মক্কাবাসীরা তাদের পিছু ধাওয়া

করলো। হাব্বার ইবনুল আসওয়াদ সর্বপ্রথম যয়নবকে ধরে ফেললো। সে যয়নবের উটটি তীরবিদ্ধ করলে সে পড়ে গিয়ে আঘাত পেল। সে সন্তান সম্ভাবা ছিল। এ আঘাতে তার গর্ভের সন্তানটি নষ্ট হয়ে যায়। অতঃপর বনু হাশিম ও বনু উমাইয়া তাঁকে নিয়ে বিবাদ আরম্ভ করে দিল। অবশেষে সে হিন্দ বিন্‌ত উতবার নিকট থাকতে লাগলো। হিন্দ প্রায়ই তাকে বলতো, তোমার এ বিপদ তোমার বাবার জন্যেই হয়েছে।

একদিন নবী করীম ﷺ যায়েদ ইবন হারিছাকে বললেন, তুমি কি যয়নবকে আনতে পারবে? যায়েদ রাজি হলো। নবী করীম ﷺ যায়েদকে একটি আংটি দিয়ে বললেন, এটা নিয়ে যাও, যয়নবের নিকট পৌছাবে।'আংটি নিয়ে যায়েদ মক্কার দিকে চললো। মক্কার উপকণ্ঠে সে এক রাখালকে ছাগল চরাতে দেখলো। সে তাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কার রাখাল? বললো, "আবুল 'আসের"। আবার জিজ্ঞেস করলো, ছাগলগুলো কার? বললো, যয়নব বিনতে মুহাম্মাদের। যায়েদ কিছু দূর রাখালের সাথে চললো। তারপর তাকে বললো, 'আমি যদি একটি জিনিস তোমাকে দেই, তুমি তা যয়নবের নিকট পৌছে দিতে পারবে? রাখাল রাজি হলো। যায়েদ তাকে আংটিটি দিল, আর রাখাল সেটি যয়নবের হাতে পৌছে দিল।

সেই দু ব্যক্তির একজন হাব্বার ইবন আল-আসওয়াদ। সে ছিল খাদীজার (রা) চাচাতো ভাইয়ের ছেলে। তাই সম্পর্কের দিক থেকে সে যয়নবের মামাতো ভাই। আর দ্বিতীয়জন ছিল নাফে ইবন আবদি কায়েস অথবা খালিদ ইবন আবদি কায়েস। তাদের এমন অহেতুক বাড়াবাড়িমূলক আচরণের জন্য নবী করীম ﷺ ভীষণ বিরক্ত হন। তাই তিনি নির্দেশ দেন :

إِنْ ظَفَرْتُمْ بِهَبَّارِ بْنِ الأَسْوَدِ وَالرَّجُلِ الَّذِيْ سَبَقَ مَعَهُ إِلَى زَيْنَبَ، فَحَرِّقُوْهُمَا بِالنَّارِ.

'যদি তোমরা হাববার ইবন আল- আসওয়াদ ও সে ব্যক্তিটি যে তার সাথে যয়নবের দিকে এগিয়ে যায়, হাতের মুঠোয় পাও, তাহলে তাকে আগুনে পুড়িয়ে ফেল। কিন্তু পরদিন তিনি আবার বলেন :

إِنِّيْ كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ بِتَحْرِيْقِ هٰذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِنْ أَخَذْتُمُوْهُمَا، ثُمَّ رَأَيْتُ أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلاَّ اللّٰهُ. فَإِنْ ظَفَرْتُمْ فَاقْتُلُوْهُمَا ـ

'আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম, যদি তোমরা এ দু ব্যক্তিকে ধরতে পার,আগুনে পুড়িয়ে মারবে। কিন্তু পরে আমি ভেবে দেখলাম এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো জন্য কাউকে আগুন দিয়ে শাস্তি দেয়া উচিত নয়। তাই তোমরা যদি তাদেরকে ধরতে পার, হত্যা করবে। কিন্তু পরে তারা মুসলমান হয় এবং নবী করীম ﷺ তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। (বুখারী, কিতাবুল জিহাদ: বাবু লা ইউ'য়াজ্জাবু বিআজবিল্লাহ ; আল- ইসাবা: হাব্বার ইবন আল- আসওয়াদ ৩য় খণ্ড; আনসাবুল আশরাফ - ১/৩৫৫৭,৩৯৮, সিয়ারু আল'লাম আন-নুবালা-২/২৪৭, ইবন হিশাম- ১/৬৫৭)

যয়নব রাখালকে জিজ্ঞেস করলো, তোমাকে এটি কে দিয়েছে? বললো, একটি লোক। আবার জিজ্ঞেস করলো, তাকে কোথায় ছেড়ে এসেছো? বললো, তুমি আমার উটের পিঠে আমার সামনে বস।' যয়নব বললো, না, আপনিই আমার সামনে বসুন। এভাবে যয়নব যায়েদের (রা) পিছনে বসে মদীনায় পৌঁছলেন। নবী করীম ﷺ প্রায়ই বলতেন, আমার সবেচেয়ে উত্তম কন্যাটি আমার জন্যই কষ্ট ভোগ করেছে। সীরাতের গ্রন্থসমূহে যয়নব (রা)-এর মক্কা থেকে মদীনা পৌঁছার ঘটনাটি একাধিক সূত্রে পৃথকভাবে বর্ণিত হতে দেখা যায়।

যেহেতু তাঁদের দুজনের মধ্যের সম্পর্ক অতি চমৎকার ছিল, এ কারণে যয়নব (রা)-এর মদীনায় চলে যাওয়ার পর আবুল 'আস অধিকাংশ সময় খুবই বিমর্ষ থাকতেন। একবার তিনি যখন সিরিয়া সফরে ছিলেন তখন যয়নব (রা)-এর কথা স্মরণ করে নিম্নের পংক্তি দুটি আওড়াতে থাকেন :

ذَكَرْتُ زَيْنَبَ لَمَّا وَرَكَتْ أَرَمًا + فَقُلْتُ سُقْيًا لِشَخْصٍ يَسْكُنُ الْحَرَمَا.

بِنْتُ الْأَمِيْنِ جَزَاهَا اللّٰهُ صَالِحَةً + وَكُلُّ بَعْلٍ يُثْنِيْ بِالَّذِيْ عَلِمَا ـ

"যখন আমি "আরিম" নামক স্থানটি পার হলাম তখন যয়নবের কথা মনে হলো। বললাম, আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে সজীব রাখুন যে হারামে বসবাস করছেন। আমীন মুহাম্মদের ﷺ কন্যাকে আল্লাহ্ তা'আলা উত্তম প্রতিদান দিন। আর প্রত্যেক স্বামী সে কথার প্রশংসা করে যা তার ভালো জানা আছে।"

(তাবাকাত-৮/৩২; আনসাবুল আশরাফ-১/৩৯৮)

মক্কার কুরাইশদের যে বিশেষ গুণের কথা কুরআনে ঘোষিত হয়েছে–

رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ -

শীতকালে ইয়ামেনের দিকে এবং গ্রীষ্মকালে শামের দিকে তাদের বাণিজ্য কাফিলা গমন করে।

আবুল 'আসের মধ্যেও এ গুণটির পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। মক্কা ও শামের মধ্যে সবসময় তাঁর বাণিজ্য কাফেলা যাতায়াত করতো। তাতে কমপক্ষে একশো উটসহ দুইশো আরোহী থাকতো। তাঁর ব্যবসায়িক বুদ্ধি, সততা ও আমানতদারিতার জন্য মানুষ তাঁর নিকট নিজেদের পণ্যসম্ভার নিশ্চিন্তে সমর্পণ করতো। ইবন ইসহাক বলেন, অর্থ-বিত্ত, আমানদতারী ও ব্যবসায়ী হিসেবে তিনি মক্কার গণমান্য মুষ্টিমেয় ব্যক্তিবর্গের অন্যতম ছিলেন।

স্ত্রী যয়নব (রা) থেকে বিচ্ছেদের পর আবুল 'আস মক্কায় অবস্থান করতে লাগলেন। হিজরী ৬ষ্ঠ সনের জামাদি-উল আওয়াল মাসে তিনি কুরাইশদের ১৭০ উটের একটি বাণিজ্য কাফিলা নিয়ে সিরিয়া যান। বাণিজ্য শেষে মক্কায় প্রত্যাবর্তনের পথে কাফিলাটি যখন মদীনার নিকটবর্তী স্থানে তখন নবী করীম ﷺ সংবাদ পেলেন।

তিনি এক শত সত্তর সদস্যের একটি বাহিনীসহ যায়েদ ইবন হারিছাকে (রা) প্রেরণ করলেন কাফিলাটিকে ধরার জন্য। ঈস নামক স্থানে দুটি দল মুখোমুখি হয়। মুসলিম বাহিনী কুরাইশ কাফিলার বাণিজ্য সম্ভারসহ সকল লোককে বন্দী করে মদীনায় নিয়ে যায়। তবে আবুল 'আসকে ধরার জন্য তারা তেমন চেষ্টা চালালো না। তিনি পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেন।

অবশ্য মূসা ইবন উকবার মতে, আবু বাশীর ও তাঁর বাহিনী আবুল 'আসের কাফিলার উপর হামলা চালায়। উল্লেখ্য যে, এ আবু বাশীর ও আরও কতিপয় লোক হুদায়বিয়ার সন্ধির পর ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে সন্ধির শর্তানুযায়ী মদীনাবাসীরা তাঁদের আশ্রয় দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করে। ফলে মক্কা থেকে পালিয়ে তাঁরা লোহিত সাগরের তীরবর্তী এলাকায় বসবাস করতে থাকেন।

তাঁরা সংঘবদ্ধভাবে মক্কার বাণিজ্য কাফিলার উপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে লুটপাট করতে থাকেন। তাঁরা কুরাইশদের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ান। তাঁদের ভয়ে কুরাইশদের ব্যবসায়-বাণিজ্য বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। অবশেষে মক্কার

কুরাইশরা বাধ্য হয়ে তাদেরকে মদীনায় ফিরিয়ে নেয়ার জন্য নবী করীম ﷺ-কে অনুরোধ করে।

যা হোক, আবুল 'আস তাঁর কাফেলার এ পরিণতি দেখে মক্কায় গমন না করে ভীত সন্ত্রস্তভাবে রাতের অন্ধকারে চুপে চুপে মদীনায় প্রবেশ করলেন এবং সোজা যয়নব (রা)-এর নিকট পৌছে আশ্রয় চাইলেন। যয়নব তাঁকে নিরাপত্তার আশ্বাস দিলেন। কেউ কিছুই জানলো না।

রাত পার হলো। নবী করীম ﷺ সালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে গেলেন। তিনি মিহরাবে দাঁড়িয়ে আল্লাহু আকবার" বলে তাকবীর তাহরীমা বেঁধেছেন। পিছনের মুকতাদীরাও তাকবীর তাহরীমা শেষ করেছে। এমন সময় পিছনে মহিলাদের কাতার থেকে যয়নব (রা)-এর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো- ওহে জনমণ্ডলী, আমি মুহাম্মদের ﷺ কন্যা যয়নব। আমি আবুল 'আসকে নিরাপত্তা দিয়েছি, আপনারাও তাঁকে নিরাপত্তা দিন।

"নবী করীম ﷺ সালাত শেষ করে লোকদের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, আমি যা শুনেছি তোমরাও কি তা শুনছো?"

লোকেরা জবাব দিল, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! রাসূল ﷺ বললেন, যার হাতে আমার জীবন, সে সত্তার কসম, আমি এ ঘটনার কিছুই জানি না। কী আশ্চর্য! মুসলমানদের একজন দুর্বল সদস্যরাও শত্রুকে নিরাপত্তা দেয়। সে সকল মুসলমানদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা দিয়েছে।

অতঃপর নবী করীম ﷺ ঘরে গিয়ে কন্যাকে বললেন, আবুল 'আসের থাকার সম্মানজনক ব্যবস্থা করবে। তবে জেনে রেখ, তুমি আর তার জন্য হালাল নও। যতক্ষণ সে মুশরিক থাকবে। যয়নব (রা) পিতার নিকট আবেদন জানালেন আবুল 'আসের কাফিলার লোকদের অর্থসম্পদসহ মুক্তিদানের জন্য।

নবী করীম ﷺ সে বাহিনীর লোকদের আহ্বান করলেন যারা আবুল 'আসের কাফিলার উট ও লোকদের ধরে নিয়ে এসেছিল। তিনি তাদের বললেন, আমার ও আবুল 'আসের মধ্যে যে সম্পর্ক তা তোমরা জান। তোমরা তার বাণিজ্য সম্ভার আটক করেছো। তার প্রতি সদয় হয়ে তার মালামাল ফেরত দিলে আমি আনন্দিত হবো। আর তোমরা রাজী না হলে আমার কোন আপত্তি নেই। আল্লাহর অনুগ্রহ হিসেবে তোমরা তা ভোগ করতে পার। তোমরাই সে মালের অধিক হকদার। তারা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তার সবকিছুই ফেরত দিচ্ছি।

আবুল 'আসের ইসলাম গ্রহণ : আবুল 'আস চললেন তাদের সাথে মালামাল বুঝে নিতে। রাস্তায় তারা আবুল 'আসকে বললো, শোন আবুল 'আস, কুরাইশদের মধ্যে তুমি একজন মর্যাদাবান ব্যক্তি। তাছাড়া তুমি নবী করীম ﷺ চাচাতো ভাই এবং তাঁর কন্যার স্বামী। তুমি এক কাজ কর। ইসলাম গ্রহণ করে মক্কাবাসীদের এ মালামালসহ মদীনায় থেকে যাও। বেশ আরামে থাকবে। আবুল 'আস বললেন, তোমরা যা বলছো তা ঠিক নয়। আমি আমার নতুন দ্বীনের জীবন আরম্ভ করবো শঠতার মাধ্যমে?

আবুল 'আস তাঁর কাফিলা ছাড়িয়ে নিয়ে মক্কায় পৌছলেন। মক্কায় প্রত্যেকের মাল বুঝিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আমার নিকট তোমাদের আর কোন কিছু পাওনা আছে কি? তারা বললো না। আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমরা তোমাকে একজন চমৎকার প্রতিশ্রুতি পালনকারী রূপে পেয়েছি।

আবুল 'আস বললেন, আমি তোমাদের হক পূর্ণরূপে আদায় করেছি। এখন আমি ঘোষণা করছি–

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ তাঁর একজন বান্দা ও রাসূল।"

মদীনায় অবস্থানকালে আমি এ ঘোষণা দিতে পারতাম। কিন্তু তা দেইনি এ জন্যে যে, তোমরা মনে করতে আমি তোমাদের সম্পদ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যেই এমন করেছি। আল্লাহ যখন তোমাদের যার যার মাল ফেরত দানের তাওফীক আমাকে দিয়েছেন এবং আমি আমার দায়িত্ব থেকে নাজাত পেয়েছি, তখনই আমি ইসলামের ঘোষণা দিচ্ছি।'

এটি হিজরী সপ্তম সনের মুহাররম মাসের ঘটনা। এরপর আবুল 'আস (রা) জন্মভূমি মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় নবী করীম ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হন।

নবী করীম ﷺ সম্মানের সাথে আবুল 'আসকে (রা) গ্রহণ করেন এবং তাঁদের বিয়ের প্রথম আকদের ভিত্তিতে স্ত্রী যয়নব (রা)-কেও তাঁর হাতে সোপর্দ করেন।

যয়নব (রা) স্বামী আবুল 'আসকে তাঁর পৌত্তলিক অবস্থায় মক্কায় রেখে এসেছিলেন। এ কারণে স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটেছিল বলে ধরে নেয়া যায়। পরে আবুল 'আস যখন ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় আসলেন তখন নবী করীম ﷺ যয়নবকে তাঁর নিকট ফিরিয়ে দিলেন। এখন প্রশ্ন হলো,

প্রথম আকদের ভিত্তিতে যয়নবকে প্রত্যার্পণ করেছিলেন, না আবার নতুন আক্বদ হয়েছিল? এ বিষয়ে দুই রকম বর্ণনা পাওয়া যায়। আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বলেন–

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ اِبْنَتَهُ اِلٰى اَبِى الْعَاصِ بَعْدَ سِنِيْنَ بِنِكَاحِهَا الْاَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ صَدَاقًا .

'নবী করীম ﷺ তাঁর কন্যাকে অনেক বছর পর প্রথম বিয়ের ভিত্তিতে আবুল 'আসের নিকট ফিরিয়ে দেন এবং কোন রকম নতুন মোহর ধার্য করেননি।

(ইবনে হিশাম-১/৬৫৮-৫৯; তিরমিজী (১১৪৩); ইবনে মাজাহ; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৪৯)

ইমাম শা'বী বলেন–

اَسْلَمَتْ زَيْنَبُ وَهَاجَرَتْ، ثُمَّ اَسْلَمَ اَبُو الْعَاصِ بَعْدَ ذٰلِكَ وَمَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا .

'যয়নব ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হিজরতও করেন। তারপর আবুল 'আস ইসলাম গ্রহণ করেন। নবী করীম ﷺ তাদের বিবাহ- বিচ্ছেদ ঘটাননি।'

(তাবাকাত-৮/২৪৯)

এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, তখনও পর্যন্ত সূরা আল- মুমতাহিনার নিম্নের আয়াতটি নাযিল হয়নি–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ، اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ، فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ، لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ .

"হে ঈমানদারগণ, যখন তোমাদের নিকট ঈমানদার নারীরা হিজরত করতে আসে তখন তাদেরকে পরীক্ষা কর। আল্লাহ্ তাদের ঈমান প্রসঙ্গে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জান যে তারা ঈমানদার, তবে আর তাদেরকে কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠিও না। এরা কাফিরদের জন্যে হালাল নয় এবং কাফিররা এদের জন্যে হালাল নয়।" (সূরা–৬০ মুমতাহিনাহ : আয়াত-১০)

আলোচ্য আয়াত ব্যক্ত করছে যে, যে মহিলা কোন কাফির পুরুষের স্ত্রী ছিল, এরপর সে মুসলমান হয়ে গেছে, তার বিয়ে কাফিরের সাথে এমনিতেই বাতিল হয়ে গেছে। এখন তারা পরস্পরের জন্যে হারাম।

একই ধরণের কথা কাতাদাও বলেছেন। তিনি বলেন–

ثُمَّ اُنْزِلَتْ بَرَائَةٌ بَعْدُ فَاِذَا اَسْلَمَتْ اِمْرَاةٌ قَبْلَ زَوْجِهَا ، فَلاَسَبِيْلَ لَهٗ عَلَيْهَا ، اِلاَّ بِخِطْبَةٍ -

'এ ঘটনার পরে অবতীর্ণ হয় সূরা 'আল- বারায়াত'। অতঃপর কোন স্ত্রী তার স্বামীর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করলে নতুন করে আক্বদ ব্যতীত স্ত্রীর ওপর স্বামীর কোন ধরনের অধিকার থাকতো না।' (তাবাতাক-৮/৩২)

কিন্তু তার পূর্বে মুসলিম মহিলারা স্বামীর ইসলাম গ্রহণের পর নতুন আক্বদ ব্যতীতই স্বামীর নিকট ফিরে যেতেন।

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ عَلٰى اَبِى الْعَاصِ بِنِكَاحٍ جَدِيْدٍ وَمَهْرٍ جَدِيْدٍ -

রাসূল ﷺ নতুন বিয়ে ও নতুন মোহরের ভিত্তিতে যয়নবকে আবুল 'আসের নিকট প্রত্যার্পণ করেন। ইমাম আহমাদ বলেন : এটি একটি দুর্বল হাদীস।

(তিরমিজী (১১৪২); তাবাকাত-৮/৩২; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৪৮)

সনদের দিক দিয়ে আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনাটি যদিও অপর বর্ণনাটির ওপর প্রাধান্যযোগ্য, তবুও ফকীহগণ দ্বিতীয়বার আক্বদের বর্ণনাটির ওপর আমল করেছেন। তাঁরা ইবন আব্বাসের (রা) বর্ণনাটির এরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, যেহেতু দ্বিতীয় আক্বদের সময় মোহর ও অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত ছিল, তাই তিনি প্রথম আক্বদ বলে বর্ণনা করেছেন। অন্যথায় এ ধরণের বিচ্ছেদে দ্বিতীয়বার আক্বদ আবশ্যক। ইমাম সুহায়লীও এরূপ কথা বলেছেন।

যয়নব (রা) পিতা নবী করীম ﷺ ও স্বামী 'আস (রা) উভয়কে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। ভালো দামী পোশাক পরতে আগ্রহী ছিলেন। আনাস বিন মালেক (রা) একবার তাঁকে একটি রেশমী চাদর গায়ে দেয়া অবস্থায় দেখতে পান। চাদরটির পাড় ছিল হলুদ বর্ণের।

ওফাত : যয়নব (রা)-এর ইন্তেকালের অল্প কিছুদিন পর তাঁর স্বামী আবুল 'আসও (রা) ইন্তেকাল করেন। বালাজুরী বলেন, ইসলাম গ্রহণের পর তিনি নবী করীম ﷺ-এর সাথে কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি এবং হিজরী ১২ সনে ইন্তেকাল করেন। যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা) ছিলেন তাঁর মামাতো ভাই। মৃত্যুর আগে তাঁকেই উত্তরাধিকারী বানিয়ে যান।

৮. রুকাইয়া বিন্‌ত মুহাম্মদ ﷺ

পরিচিতি : নবী করীম ﷺ ও খাদীজা (রা)-এর দ্বিতীয় কন্যা রুকাইয়া (রা)। পিতা নবী করীম ﷺ-এর নবুওয়্যাত লাভের সাত বছর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। যুবাইর ও তাঁর চাচা মুস'আব যিনি একজন কুষ্টিবিদ্যা বিশারদ, তারা ধারণা করেছেন, রুকাইয়া (রা) নবী করীম ﷺ-এর ছোট কন্যা। জুরজানী এ মত সমর্থন করেছেন। তবে অধিকাংশের মতে যয়নব (রা) হলেন বড়, আর রুকাইয়া দ্বিতীয়। ইবন হিশামের মতে, রুকাইয়্যা কন্যাদের মধ্যে বড়।

মুহাম্মদ ইবন ইসহাক সংকলিত একটি বর্ণনামতে, নবী করীম ﷺ-এর বয়স যখন ত্রিশ তখন যয়নব (রা)-এর জন্ম হয় এবং তেত্রিশ বছর বয়সে জন্ম হয় রুকাইয়ার (রা)। যা হোক, সীরাত বিশেষজ্ঞরা রুকাইয়াকে নবী করীম ﷺ-এর দ্বিতীয় কন্যা বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

প্রথম বিবাহ : নবী করীম ﷺ -এর নবুওয়্যাত লাভের পূর্বে মক্কার আবু লাহাবের পুত্র উতবার সাথে রুকাইয়া (রা)-এর প্রথম বিয়ে হয়। নবী করীম ﷺ নবুওয়্যাত লাভ করলেন। কুরাইশদের সাথে তাঁর বিরোধ যখন চরম আকার ধারণ করে তখন তারা নবী করীম ﷺ-কে কষ্ট দেয়ার সকল পথ ও পন্থা বেছে নেয়। তারা সকল নীতি-নৈতিকতার মাথা খেয়ে সিদ্ধান্ত নেয় যে মুহাম্মদের বিবাহিত কন্যাদের স্বামীর ওপর চাপ প্রয়োগ অথবা প্রলোভন দেখিয়ে প্রত্যেকের স্ত্রীকে তালাক দেবে এবং পরে তাদের পিতৃগৃহে পাঠিয়ে দেবে। তাতে অন্তত মুহাম্মাদের মনোকষ্ট ও দুশ্চিন্তা বাড়বে এবং নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। যেমন চিন্তা তেমন কাজ। তারা প্রথমে গেল নবী করীম ﷺ -এর বড় কন্যার স্বামী আবুল 'আস ইবন রাবী'র নিকট। আবদার জানালো তাঁর স্ত্রী যয়নব বিনত মুহাম্মদকে তালাক দিয়ে পিতৃগৃহে পাঠিয়ে দেওয়ার। কিন্তু তিনি তাদের মুখের ওপর সাফ 'না' বলে দিলেন। নির্লজ্জ কুরাইশ নেতৃবৃন্দ এমন জবাব শ্রবণ করেও থামলো না। তারা গেল রুকাইয়ার (রা) স্বামী উতবা ইবন আবী লাহাবের নিকট এবং তার স্ত্রীকে তালাক দানের জন্যে চাপ প্রয়োগ করলো। পাশাপাশি এ

প্রলোভনও দিল যে, সে কুরাইশ গোত্রের যে সুন্দরীকেই চাইবে তাকে তার স্ত্রী বানিয়ে দেয়া হবে। বিবেকহীন উতবা তাদের প্রস্তাব মেনে নিল। সে রুকাইয়ার বিনিময়ে সা'ঈদ ইবনুল 'আস' মতান্তরে আবান ইবন সা'ঈদ ইবনুল 'আসের একটি কন্যাকে পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলো। কুরাইশ নেতারা সানন্দে তার এ দাবী মেনে নিল। তাদের না মানার কোন কারণও ছিল না। তাদের তো প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে কোনভাবে এবং যতটুকু পরিমাণেই হোক নবী করীম ﷺ-কে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করা। নবী করীম ﷺ-এর একটু কষ্টতেই তাদের মানসিক প্রশান্তি। নরাধম উতবা তার স্ত্রী রুকাইয়াকে (রা) তালাক দিল।

তবে এ বিষয়ে আরেকটি বর্ণনা এই যে, যখন উতবা পিতা-মাতার নিন্দায় সূরা 'লাহাব'- تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ অবতীর্ণ হয় তখন আবু লাহাব ও তার স্ত্রী উম্মু জামীল- "হাম্মালাতাল হাতাব" তারা পুত্র উতবাকে বলল যদি তাকে বিদায় না কর তাহলে তোমার সাথে আমাদের আর কোন সম্পর্ক নেই। মাতা পিতার অনুগত সন্তান মা-বাবাকে খুশী করার জন্যে স্ত্রী রুকাইয়াকে তালাক দেয়। উল্লেখ্য যে, উতবার সাথে রুকাইয়ার কেবল আক্‌দ হয়েছিল। স্বামী- স্ত্রী হিসেবে বসবাসের আগেই তালাকের এ ঘটনা ঘটে।

রুকাইয়া (রা)-এর দ্বিতীয় বিয়ে : উসমান (রা) তাঁর ইসলাম গ্রহণ ও বিয়ের ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, আমি পবিত্র কা'বার আঙ্গিনায় কতিপয় বন্ধুর সাথে বসে ছিলাম। এমন সময় কোন এক ব্যক্তি এসে আমাকে জানালো যে, নবী করীম ﷺ তাঁর কন্যা রুকাইয়াকে উতবা ইবন আবী লাহাবের সাথে বিয়ে দিয়েছেন। যেহেতু রুকাইয়্যা রুপ-লাবণ্য এবং ঈর্ষণীয় গুণ- বৈশিষ্ট্যের জন্যে স্বাতন্ত্রের অধিকারিণী ছিলেন, এ কারণে তাঁর প্রতি আমার খানিকটা মানসিক দুর্বলতা ছিল। আমি তাঁর বিয়ের সংবাদ শ্রবণ করে কিছুটা অস্থির হয়ে পড়লাম। তাই উঠে সোজা বাড়ী চলে গেলাম। তখন আমাদের বাড়ীতে থাকতেন আমার খালা সা'দা। তিনি ছিলেন একজন 'কাহিনা" (ভবিষ্যদ্বক্তা)। আমাকে দেখেই তিনি হঠাৎ নিম্নের কথাগুলো বলতে শুরু করলেন–

اَبْشِرْ وَحُيِّيْتَ ثَلاَثًا وِتْرًا، ثُمَّ ثَلاَثًا وَثَلاَثًا اُخْرٰى، ثُمَّ بِاُخْرٰى كَىْ تَتِمَّ عَشْرًا، لَقِيْتَ خَيْرًا وَوُقِيْتَ شَرًّا نَكَحْتَ وَاللّٰهِ حَصَانًا زَهْرًا، وَاَنْتَ بِكْرٌ وَلَقِيْتَ بِكْرًا ـ

Contents

(হে উসমান) তোমার জন্য সুসংবাদ। তোমার প্রতি তিনবার সালাম। আবার তিনবার সালাম। তারপর আবার তিন বার। শেষে একবার সালাম। তাহলে মোট দশটি সালাম পূর্ণ হয়ে যায়। আল্লাহর ইচ্ছায় তুমি শুভ ও কল্যাণের সাথে মিলিত হবে এবং অকল্যাণ থেকে দূরে থাকবে। আল্লাহর কসম, তুমি একজন ফুলের কুঁড়ির মত সতী-সাধ্বী সুন্দরী কন্যাকে বিয়ে করেছো। তুমি একজন কুমার, এক কুমারী পাত্রীই লাভ করেছো'।

তাঁর এমন কথাতে আমি ভীষণ আশ্চর্য বনে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, খালা। আপনি এসব কী বলছেন? তিনি বললেন–

عُثْمَانُ، يَاعُثْمَانُ، يَاعُثْمَانُ لَكَ الْجَمَالُ وَلَكَ الشَّأْنُ هٰذَا نَبِيٌّ مَعَهُ الْبُرْهَانُ اَرْسَلَهُ بِحَقِّهِ الدَّيَّانُ وَجَاءَ التَّنْزِيْلُ وَالْفُرْقَانُ فَاتَّبِعْهُ لَايَغُرَّنَّكَ الْاَوْثَانُ ـ

উসমান, উসমান, হে উসমান। তুমি সুন্দরের অধিকারী, তোমার জন্যে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইনি নবী, তাঁর সাথে আছে দলিল-প্রমাণ। তিনি সত্য-সঠিক রাসূল। তাঁর ওপর আমি এবারও কিছু বুঝলাম না।

আমি তাকে একটু বিশ্লেষণ করে বলার জন্যে অনুরোধ করলাম। এবার তিনি বললেন–

اِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ جَاءَ بِتَنْزِيْلِ اللّٰهِ يَدْعُوْبِهٖ اِلَى اللّٰهِ، مِصْبَاحُهُ مِصْبَاحٌ وَدِيْنُهُ فَلَاحٌ، مَايَنْفَعُ الصَّبَاحُ وَلَوْ وَقَعَ الرِّمَاحُ وَسَلَّتِ الصِّفَاحُ وَمُدَّتِ الرِّمَاحُ ـ

মুহাম্মদ ইবন' আব্দুল্লাহ যিনি আল্লাহর রাসূল, কুরআন নিয়ে এসেছেন। আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন। তাঁর প্রদীপই প্রকৃত প্রদীপ, তাঁর দ্বীনই সফলতার মাধ্যম। মারামারি কাটাকাটি হৈচৈ কোন মঙ্গল বয়ে আনবে না।'

তাঁর এ কথা আমাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করলো। আমি ভবিষ্যতের করণীয় বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করলাম। আমি প্রায়ই আবু বকরের নিকট গিয়ে বসতাম। দুদিন পর আমি যখন তাঁর নিকট গেলাম তখন সেখানে কেউ ছিলনা। আমাকে চিন্তিত অবস্থায় বসে থাকতে দেখে তিনি প্রশ্ন করলেন, আজ তোমাকে

এত চিন্তিত মনে হচ্ছে কেন? তিনি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, তাই আমি আমার খালার বক্তব্যের সারকথা তাঁকে বললাম।

আমার কথা শ্রবণ করে তিনি বললেন : উসমান, তুমি একজন বুদ্ধিমান মানুষ। সত্য-মিথ্যার পার্থক্য যদি তুমি করতে না পার তাহলে সেটা হবে একটা আশ্চর্যের বিষয়। তোমার স্ব-জাতির লোকেরা যে মূর্তিগুলির উপাসনা করে, সেগুলো কি পাথরের তৈরী নয়- যারা কোন কিছু শুনে না, দেখে না এবং কোন উপকারও অপকারও করার ক্ষমতা তারা রাখেনা? উসমান বললেন, আপনি যা বলেছেন, তা সম্পূর্ণ সত্য।

আবূ বকর বললেন, তোমার খালা যে কথা বলেছেন তা সত্য। মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ তাঁর বাণী মানুষের নিকট পৌছানোর জন্যে তাঁকে প্রেরণ করেছেন। যদি তুমি তাঁর নিকট যাও এবং মনোযোগ সহকারে তাঁর কথা শ্রবণ কর, তাতে ক্ষতির কী আছে? তাঁর এ কথার পর আমি নবী করীম ﷺ নিকট গেলাম। আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, তাঁদের এ আলোচনার কথা শুনে নবী করীম ﷺ নিজেই উসমান (রা)-এর নিকট যান। নবী করীম ﷺ বলেন, শোন উসমান, আল্লাহ তোমাকে জান্নাতের দিকে ডাকছেন, তুমি সে আহ্বানে সাড়া দাও। আমি আল্লাহর রাসূল- তোমাদের তথা সমগ্র সৃষ্টি জগতের প্রতি আমাকে পাঠানো হয়েছে।

আল্লাহই জানেন তাঁর এ কথার মধ্যে কী এমন শক্তি ছিল। আমি নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললাম। অবলীলাক্রমে আমার মুখ থেকে উচ্চারিত হলো কালেমায়ে শাহাদাত–

اَشْهَدُ اَنْ لَااِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ـ

এ ঘটনার পর মক্কাতেই উসমানের (রা) সাথে রুকাইয়ার (রা) বিয়ে আকদ সম্পন্ন হয়।

রুকাইয়্যার ইসলাম গ্রহণ, বাই'আত ও হিজরা : রুকাইয়া (রা) তাঁর মা উম্মুল মু'মিনীন খাদীজা (রা) ও বড় বোন যয়নব (রা)-এর সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। অন্য নারীরা যখন নবী করীম ﷺ-এর বাই'আত করেন তখন তিনিও বাই'আত করেন।

নবুওয়্যাতের পঞ্চম বছরে তিনি স্বামী উসমান (রা)-এর সাথে হাবশায় হিজরত করেন। আসমা বিন্ত আবু বকর (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল ﷺ ও আবু

বকর হেরা গুহায় অবস্থান করতেন আর আমি তাঁদের দুজনের খাবার নিয়ে যেতাম। একদিন উসমান (রা) নবী করীম ﷺ-এর নিকট হিজরতের অনুমতি চাইলে তাঁকে হাবশায় যাওয়ার অনুমতি দান করেন। অতঃপর তাঁরা স্বামী-স্ত্রী মক্কা ছেড়ে হাবশার দিকে রওয়ানা হন। তারপর আমি আবার যখন তাঁদের খাবার নিয়ে গেলাম তখন নবী করীম ﷺ জানতে চান : উসমান ও রুকাইয়া কি চলে গেছে? বললাম : জী হ্যাঁ, তাঁরা চলে গেছেন। তখন তিনি আমার পিতা আবূ বকরকে (রা) শুনিয়ে বললেন–

اِنَّهُمَا الْاَوَّلُ مَنْ هَاجَرَ بَعْدَ اِبْرَاهِيْمَ وَلُوْط ـ

'নিশ্চয় তারা দুজন ইবরাহীম ও লূত- এর পর প্রথম হিজরতকারী।

(আনসাবুল 'আশরাফ-১/১৯৯; হায়াতুস সাহাবা-১/৩৪৬)

কিছুদিন হাবশায় অবস্থানের পর তাঁরা আবার মক্কায় ফিরে আসেন। মক্কার কাফিরদের অপতৎপরতার মাত্রা তখন আরো বৃদ্ধি পেয়ে বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়েছিল। তাই সেখানে অবস্থান করা সমীচীন মনে করলেন না। আবার হাবশায় ফিরে গেলেন।

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। উসমান ইবন আফ্ফান (রা) তাঁর স্ত্রী রুকাইয়াকে (রা) নিয়ে হাবশার দিকে বেরিয়ে গেলেন। তাঁদের সংবাদ নবী করীম ﷺ-এর নিকট আসতে দেরী হলো। এর মধ্যে এক মহিলা হাবশা থেকে মক্কায় এলো। সে বললো : মুহাম্মদ, আমি আপনার জামাতাকে তার স্ত্রীসহ যেতে দেখেছি। রাসূল ﷺ জানতে চাইলেন : তুমি তাদের কি অবস্থায় দেখেছো? সে বললো : দেখলাম সে তার স্ত্রীকে একটি দুর্বল গাধার উপর বসিয়ে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। নবী করীম ﷺ তখন মন্তব্য করলেন :

'আল্লাহ তাদের সাথী হোন। লূত আলাইহিস সালামের পরে উসমান প্রথম ব্যক্তি যে সস্ত্রীক হিজরত করেছে।

তাঁরা দ্বিতীয়বার বেশ কিছুদিন হাবশায় অবস্থান করার পর মক্কায় ফিরে আসেন এবং কিছুদিন মক্কায় অবস্থান করে পরিবার-পরিজনসহ আবার চিরদিনের জন্য মদীনায় হিজরত করেন।

রুকাইয়্যা (রা) মা হন : দ্বিতীয়বার হাবশায় অবস্থানকালে রুকাইয়ার (রা) পুত্র আবদুল্লাহর জন্ম হয়। এ আব্দুল্লাহর নামেই উসমান (রা)-এর উপনাম হয় আবু আবদিল্লাহ। এর পূর্বে হাবশায় প্রথম হিজরতের সময় তার গর্ভের একটি সন্তান

নষ্ট হয়ে যায়। কাতাদা বলেন, উসমান (রা)-এর ঔরসে রুকাইয়া (রা)-এর কোন সন্তান হয়নি। ইবন হাজার বলেন, এটা কাতাদার একটি ধারণা মাত্র। এমন কথা তিনি ব্যতীত আর কেউ বলেননি। তবে আবদুল্লাহর পরে রুকাইয়ার (রা) আর কোন সন্তান হয়নি।

আবদুল্লাহর বয়স যখন মাত্র ছয় বছর তখন হঠাৎ একদিন একটি মোরগ তার একটি চোখে ঠোকর দেয় এবং তাতে তার চেহারা ফুলে সমস্ত দেহে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এ দুর্ঘটনায় হিজরী চতুর্থ সনের জামাদিউল আউয়াল মাসে সে ইন্তিকাল করে। নবী করীম ﷺ তাঁর জানাযার সালাত পড়ান এবং উসমান (রা) কবরে নেমে তার দাফন কাজ সম্পন্ন করেন।

রুকাইয়্যার ইন্তেকাল : মদীনায় পৌছার পর রুকাইয়া (রা) হিজরী দ্বিতীয় সনে রোগাক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হন। তখন ছিল বদর যুদ্ধের সময়কাল। নবী করীম ﷺ যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি উসমানকে (রা) তাঁর রুগ্ন স্ত্রীর সেবা-শুশ্রুষার জন্যে মদীনায় রেখে নিজে বদরে গমন করেন। হিজরতের এক বছর সাত মাস পরে পবিত্র রমজান মাসে রুকাইয়া ইন্তেকাল করেন। উসামা ইবন যায়েদ (রা) বলেন, আমরা যখন নবী করীম ইবন হারিছা বদরে বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে হাজির হন। রাসূল ﷺ আমাকে উসমানের সাথে মদীনায় রেখে গিয়েছিলেন।

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, তারা যখন রুকাইয়ার (রা) দাফন কাজে ঠিক সে সময় উসমান (রা) দূর থেকে আসা একটি তাকবীর ধ্বনি শ্রবণ করে উসামার (রা) নিকট জানতে চান এটা কী? তাঁরা তাকিয়ে দেখতে পেলেন যায়েদ ইবন হারিছা (রা) নবী করীম ﷺ-এর উটনীর উপর সওয়ার হয়ে আছেন এবং বদরে মক্কার কুরাইশ নেতাদের হত্যার সংবাদ ঘোষণা করছেন।

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস বলেন, রুকাইয়ার (রা) ইন্তেকালের পর রাসূল ﷺ বলেন—

اَلْحِقِىْ بِسَلَفِنَا الصَّالِحِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ -

তুমি আমাদের পূর্বসূরী উসমান ইবন মাজউনের সাথে মিলিত হও।

(আল ইসাবা-৪/৩০৪)

নারীরা কাঁদতে থাকে। এ সময় ওমর (রা) এসে তাঁর হাতের চাবুক উঁচিয়ে পেটাতে উদ্যত হন। নবী করীম ﷺ হাত দিয়ে তাঁর চাবুকটি ধরে বলেন, ছেড়ে

দাও। তারা তো কান্নাকাটি করছে। অন্তর ও চোখ থেকে যা বের হয়, তা হয় আল্লাহ্ ও তাঁর অনুগ্রহ থেকে। আর হাত ও মুখ থেকে যে ক্রিয়া প্রকাশ পায় তা হয় শয়তান থেকে। ফাতিমা (রা) নবী করীম ﷺ-এর পাশে কবরের ধারে বসেছিলেন। নবী করীম ﷺ নিজের পোশাকের কোনা দিয়ে তাঁর চোখের পানি মুছে দিচ্ছিলেন।

ইবন সা'দ উপরিউক্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, সকল বর্ণনাকারীর নিকট এটাই সর্বাধিক সঠিক বলে বিবেচিত যে, রুকাইয়ার (রা) মৃত্যু ও দাফনের সময় রাসূল ﷺ বদরে ছিলেন। সম্ভবত এটা নবী করীম ﷺ অন্য কন্যার মৃত্যুর সময়ের ঘটনা। আর যদি রুকাইয়ার মৃত্যু সময়ের হয় তাহলে সম্ভবত রাসূল ﷺ বদর থেকে ফিরে আসার পরে কবরের পাশে গিয়েছিলেন, আর নারীরাও তখন ভীড় করেছিলেন। মুসনাদে ইমাম আহমাদের একটি বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূল ﷺ-এর অনিচ্ছার কারণে উসমান (রা)-এর বদলে আবু তালহা (রা) কবরে নেমে রুকাইয়াকে (রা) শায়িত করেন। এ ক্ষেত্রেও একই প্রশ্ন উঠেছে যে, তা কেমন করে সম্ভব? রাসূল ﷺ তো তখন বদরে। তাই মুহাদ্দিসগণ বলেছেন, এটা উম্মু কুলসুমের (রা) দাফনের সময়ের ঘটনা। তাছাড়া অপর একটি বর্ণনায় উম্মু কুলসুমের (রা) নাম রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, উম্মু কুলসুম (রা) নবী করীম ﷺ-এর তৃতীয় কন্যা রুকাইয়ার (রা) মৃত্যুর পর উসমান (রা) তাঁকে বিয়ে করেন। কিছুদিন পর তিনি ইন্তেকাল করেন।

রুকাইয়া (রা) খুবই রূপ-লাবণ্যের অধিকারিণী ছিলেন। দুররুল মানছুর" গ্রন্থে এসেছে : তিনি ছিলেন দারুণ রূপবতী। হাবশায় অবস্থানকালে সেখানকার একদল বখাটে লোক তাঁর রূপ-লাবণ্য দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। এ দলটি তাঁকে ভীষণ বিরক্ত করে। তিনি তাদের জন্য বদ-দু'আ করেন এবং তারা ধ্বংস হয়ে যায়।

প্রিয়তমা স্ত্রী ও সুখ-দুঃখের সাথীর অকাল মৃত্যুতে উসমান (রা) দারুন কষ্ট পান। সর্বোত্তম দম্পতি 'রুকাইয়্যা ও ওসমান তাঁদের দুজনের মধ্যে দারুণ মিল-মুহাব্বত ছিল। জনগণ বলাবলি করতো এবং কথাটি যেন উপমায় পরিণত হয়েছিল যে—

أَحْسَنُ الزَّوْجَيْنِ رَآهُمَا الْإِنْسَانُ رُقَيَّةُ وَزَوْجُهَا عُثْمَانُ .

'মানুষের দেখা দম্পতিদের মধ্যে রুকাইয়া ও তাঁর স্বামী উসমান হলো সর্বোত্তম।

(আল-ইসাবা-৪/৩০৫)

বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায়, রুকাইয়া ছিলেন একজন স্বামী- সোহাগিনী এবং পতি-পরায়ণা স্ত্রী। তাঁদের সাময়িক সময়ের দাম্পত্য জীবনে তারা কখনো বিচ্ছিন্ন হননি। সকল বিপদ-আপদ ও প্রতিকূল অবস্থা তাঁরা একসাথে মুকাবিলা করেছেন। তিনি নিজে যেমন স্বামীর সেবা করে সকল যন্ত্রণা লাঘব করার চেষ্টা করতেন, তেমনি স্বামী উসমানও স্ত্রীর জীবনকে সহজ করার চেষ্টা সব সময় করতেন। একদিন নবী করীম ﷺ উসমান (রা)-এর গৃহে গমন করে দেখেন রুকাইয়া স্বামীর মাথা ধৌত করে দিচ্ছেন। তিনি কন্যাকে বললেন–

يَابُنَيَّةُ اَحْسِنِىْ اِلَى اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ فَاِنَّهُ اَشْبَهُ اَصْحَابِىْ بِىْ خُلُقًا.

'আমার কন্যা! তুমি আবু আবদিল্লাহর (উসমান) সাথে উত্তম আচরণ করবে। কারণ আমার সাহাবীদের মধ্যে স্বভাব-চরিত্রে আমার সাথে তাঁর বেশী মিল'।

(প্রাগুক্ত)

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমি একদিন নবী করীম ﷺ -এর কন্যা ও উসমানের স্ত্রী রুকাইয়ার ঘরে গিয়ে দেখি তাঁর হাতে চিরুনী। তিনি বললেন : নবী করীম ﷺ এ মাত্র আমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তিনি দেখে গেলেন, আমি উসমানের মাথায় চিরুনী করছি।

৯. উম্মু কুলছুম বিন্‌ত নবী করীম ﷺ

পরিচিতি : উম্মু কুলছুম (রা) রাসূলে করীম ﷺ-এর তৃতীয় মেয়ে। তবে এ ব্যাপারে সীরাত বিশেষজ্ঞদের কিছুটা মতপার্থক্য আছে। ইমাম আজ-জাহাবী তাঁকে রাসূলুল্লাহর ﷺ সন্তানদের মধ্যে চতুর্থ বলেছেন। যুবাইর ইবনে বাক্কার বলেছেন, উম্মু কুলছুম ছিলেন রুকাইয়া ও ফাতিমা (রা) থেকে বড়। কিন্তু অধিকাংশ সীরাত লেখক এ মতের বিরোধিতা করেছেন। সঠিক ও বিশ্বাসযোগ্য মত এটাই যে, উম্মু কুলছুম (রা) ছিলেন রুকাইয়্যা (রা)-এর ছোট। তাবারী রাসূলুল্লাহর ﷺ মেয়েদের জন্মের ক্রমধারা উল্লেখ করেছেন এভাবে–

وَوَلَدَتْ زَيْنَبُ وَرُقَيَّةُ وَأُمُّ كُلْثُوْمٍ وَفَاطِمَةُ

'যয়নব, রুকাইয়্যা, উম্মু কুলছুম ও ফাতিমা জন্ম গ্রহণ করেন।

(তারীখ আত-তাবারী (লেইডেন) ৩/১১২৮)

রুকাইয়্যা (রা) ছিলেন উছমান (রা)-এর স্ত্রী। হিজরী ২য় সনে তাঁর ইন্তেকাল হলে রাসূল ﷺ উম্মু কুলছুমকে (রা) উছমানের (রা) সাথে বিয়ে দেন। উম্মু কুলছুম বয়সে রুকাইয়্যার বড় যদি হতেন তাহলে উছমানের (রা) সাথে তাঁরই বিয়ে হতো আগে, রুকাইয়্যার নয়। কারণ, সকল সমাজ ও সভ্যতায় বড় মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থাটা আগেই করা হয়। আর এটাই বুদ্ধি ও প্রকৃতির দাবী।

সীরাত ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলিতে উম্মু কুলছুমের (রা) জন্ম সনের কোন উল্লেখ দেখা যায় না। তবে রাসূলুল্লাহর ﷺ নবুওয়্যাত লাভের ছয় বছর পূর্বে তাঁর জন্ম হয়েছিল বলে ধারণা করা যায়। কারণ, একথা প্রায় সর্বজন স্বীকৃত যে, নবুওয়্যাতের সাত বছর পূর্বে রুকাইয়্যার এবং পাঁচ বছর পূর্বে ফাতিমার (রা) জন্ম হয়। আর একথাও মেনে নেয়া হয়েছে যে, উম্মু কুলছুম (রা) ছিলেন রুকাইয়্যার ছোট এবং ফাতিমার বড়। তাহলে তাঁদের দুজনের মধ্যবর্তী সময়

তাঁর জন্ম সন বলে মেনে নিতেই হবে। আর এ হিসেবেই তিনি নবুওয়্যাতের ছয় বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।

অনেকের মত উম্মু কুলছুম (রা)-এরও শৈশবকাল অজ্ঞতার অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেছে। আরবের সে সময়কালটা এমন ছিল যে, কোন ব্যক্তিরই জীবনকথা পূর্ণভাবে পাওয়া যায় না। এ কারণে তাঁর বিয়ের সময় থেকেই তাঁর জীবন ইতিহাস লেখা হয়েছে।

উম্মু কুলছুমের প্রথম বিয়ে : রাসূলুল্লাহ ﷺ নবুওয়্যাত লাভের পূর্বে আবু লাহাবের পুত্র উতবার সাথে রুকাইয়্যার এবং তার দ্বিতীয় পুত্র উতাইবার সাথে উম্মু কুলছুমের বিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ নবুওয়্যাত লাভের পর যখন আবু লাহাব ও তার স্ত্রীর নিন্দায় সূরা লাহাব নাযিল হয় তখন আবু লাহাব, মতান্তরে আবু লাহাবের স্ত্রী দুই ছেলেকে লক্ষ্য করে বলে, তোমরা যদি তাঁর [মুহাম্মাদ ﷺ] মেয়েকে তালাক দিয়ে বিদায় না কর তাহলে তোমাদের সাথে আমার বসবাস ও উঠাবসা হারাম।

রুকাইয়্যার (রা) জীবনীতে আমরা উল্লেখ করেছি যে, পিতা-মাতার এরূপ কথায় এবং সামাজিক চাপে উতবা তার স্ত্রী রুকাইয়্যাকে তালাক দেয়। তেমনিভাবে উতাইবাও মা-বাবার হুকুম তামিল করতে গিয়ে স্ত্রী উম্মু কুলছুমকে তালাক দেয়। এ হিসেবে উভয়ের তালাকের সময়কাল ও কারণ একই। উভয় বোনের বিয়ে হয়েছিল ঠিকই কিন্তু স্বামীর ঘরে যাবার পূর্বেই এ ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।

উম্মু কুলছুমের দ্বিতীয় বিয়ে : হিজরী দ্বিতীয় সনে রুকাইয়্যা (রা) মৃত্যুবরণ করলে উছমান (রা) স্ত্রীর শোকে বেশ বিষণ্ন ও বিমর্ষ হয়ে পড়েন। তাঁর এ অবস্থা দেখে রাসূল ﷺ একদিন তাঁকে বললেন, উছমান, তোমাকে এমন বিমর্ষ দেখছি, কারণ কি? উছমান (রা) বললেন, আমি এমন বিমর্ষ না হয়ে কেমন করে পারি? আমার ওপর এমন মুসীবত এসেছে যা সম্ভবত: কখনো কারো ওপর আসেনি।

রাসূলুল্লাহর ﷺ কন্যার ইনতিকাল হয়েছে। এতে আমার মাজা ভেঙ্গে গেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল তা ছিন্ন হয়ে গেছে। এখন আমার উপায় কি? তাঁর কথা শেষ না হতেই রাসূল ﷺ বলে উঠলেন, জিবরীল (عليه السلام) আল্লাহর দরবার থেকে আমাকে হুকুম পৌছে দিয়েছেন, আমি যেন

রুকাইয়্যার সমপরিমাণ মোহরের ভিত্তিতে উম্মু কুলছুমকেও তোমার সাথে বিয়ে দেই।

অতঃপর আল্লাহর দরবার থেকে আমাকে হুকুম পৌছে দিয়েছেন, হিজরী ২য় সনের রাবীউল আউয়াল মাসে উছমান (রা)-এর সাথে উম্মু কুলছুমের আক্বদ সম্পন্ন করেন। আক্বদের দুই মাস পরে জমাদিউস ছানী মাসে তিনি স্বামী গৃহে গমন করেন। উম্মু কুলছুম কোন সন্তানের মা হননি।

অপর বর্ণনায় এসেছে, রুকাইয়্যার (রা) ইন্তেকালের পর ওমর ইবন খাত্তাব (রা) তাঁর মেয়ে হাফসাকে (রা) উছমানের (রা) সাথে বিয়ের প্রস্তাব দেন। কিন্তু তিনি কোন উত্তর না দিয়ে চুপ থাকেন। একথা রাসূল ﷺ জানতে পেরে ওমরকে বলেন, আমি হাফসার জন্যে উছমানের চেয়ে ভালো স্বামী এবং উছমানের জন্যে হাফসার চেয়ে ভালো স্ত্রী তালাশ করবো। তারপর তিনি হাফসাকে বিয়ে করেন এবং উম্মু কুলছুমকে উছমানের সাথে বিয়ে দেন।

উম্মু কুলছুমের ইসলাম, বাই'আত গ্রহণ ও হিজরত : উম্মু কুলছুম (রা) তাঁর মা উম্মুল মু'মিনীন খাদীজার (রা) সাথেই ইসলাম গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে অন্য বোনদের সাথে রাসূলুল্লাহর ﷺ হাতে বাই'আত করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় হিজরতের পর তিনি পরিবারে অন্য সদস্যদের সাথে মদীনায় হিজরত করেন।

ওফাত : স্বামী উছমানের (রা) সাথে ছয় বছর কাটানোর পর হিজরী ৯ম সনের শা'বান মাসে উম্মু কুলছুম (রা) ইন্তেকাল করেন। আনসারী মহিলারা তাঁকে গোসল দেন। তাঁদের মধ্যে উম্মু আতিয়্যাও ছিলেন। রাসূল ﷺ জানাযার সালাত পড়ান। আবু তালহা, আলী ইবন আবী তালিব, ফাদল ইবন আব্বাস ও উসামা ইবন যায়েদ (রা) লাশ কবরে নামান।

উম্মু কুলছুম (রা)-এর ইন্তেকালের পর রাসূল ﷺ বলেন, আমার যদি দশটি মেয়ে থাকতো তাহলে একের পর এক তাদের সকলকে উছমানের (রা) সাথে বিয়ে দিতাম। একটি বর্ণনায় দশটি মেয়ের স্থলে একশোটি মেয়ে এসেছে। (তাবাকাত)

রাসূলে করীম ﷺ কন্যা উম্মু কুলছুমের (রা) মৃত্যুতে ভীষণ ব্যথা পান। যখন কবরের কাছে বসেন তখন চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে।

একটি বর্ণনায় এসেছে, আনাস (রা) উম্মু কুলছুম (রা)-কে রেখা অঙ্কিত রেশমের কাজ করা একটি চাদর গায়ে দেওয়া অবস্থায় দেখেছেন।

নরাধম উতায়বা তার জাহান্নামের অগ্নিশিখা পিতা আবু লাহাব এবং কাঠকুড়ানি মা উম্মু জামীল হাম্মালাতাল হাতাব-এর চাপে স্ত্রী উম্মু কুলছুমকে তালাক দানের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এসে চরম অমার্জিত আচরণ করে। সে রাসূলকে ﷺ লক্ষ্য করে বলে : আমি আপনার দ্বীনকে অস্বীকার করি, মতান্তরে আপনার মেয়েকে তালাক দিয়েছি বলে সে গোঁয়ারের মত রাসূলুল্লাহর ﷺ উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাতে রাসূলুল্লাহর ﷺ জামা ছিঁড়ে যায়। এরপর সে শামের দিকে সফরে বেরিয়ে যায়। তার এমন পশুসুলভ আচরণে রাসূল ﷺ ক্ষুব্ধ হয়ে বদ-দু'আ করেন এ বলে : আমি আল্লাহর কাছে কামনা করি, তিনি যেন তাঁর কোন কুকুরকে তার ওপর বিজয়ী করে দেন।'

'উতাইবা কুরাইশদের একটি বাণিজ্য কাফেলার সাথে শামের দিকে বেরিয়ে পড়লো। যখন তারা 'আয-যারকা' নামক স্থানে রাত্রি যাপন করছিল, তখন একটি নেকড়ে তাদের অবস্থান স্থলের পাশে ঘুর ঘুর করতে থাকে। তা দেখে উতাইবার মনে পড়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ বদ-দ'আর কথা। সে তার জীবন নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়ে। সে বলতে থাকে, আমার মা নিপাত যাক, মুহাম্মাদের কথা মত এ নেকড়ে তো আমাকে খেয়ে ফেলবে। যা হোক, কাফেলার লোকেরা তাকে সকলের মাঝখানে ঘুমানোর ব্যবস্থা করে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। নেকড়ে সকলকে ডিঙ্গিয়ে সকলের থেকে উতাইবাকে উঠিয়ে নিয়ে যায় এবং কামড়ে, খামছে ও রক্তাক্ত করে তাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে।

১০. ফাতিমা বিন্‌ত রাসূলিল্লাহ ﷺ

عَنِ الْمِسْوَرِبْنِ مَخْرَمَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَاطِمَةُ بِضْعَةٌ مِنِّىْ فَمَنْ اَغْضَبَهَا اَغْضَبَنِىْ ـ

মিসওয়ার ইবনে মাখরামাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, ফাতিমা আমার অংশ বিশেষ, যে তাকে কষ্ট দিল সে আমাকেই কষ্ট দিল।

(বুখারী : হাদীস নং-৩৭৬৭)

মারইয়াম বিনতে ইমরান, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর স্ত্রী খাদীজা, ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া জান্নাতী রমণীদের সরদার হবে।

عَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَيِّدَاتُ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ بَعْدَ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ فَاطِمَةُ وَخَدِيْجَةُ وَاٰسِيَةُ امْرَاَةُ فِرْعَوْنَ ـ

জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : জান্নাতী রমণীদের সরদার মারইয়াম বিনতে ইমরান এর পরে ফাতেমা, খাদীজা ও ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া।

(তাবরানী : সিলসিলা আহাদিস সহীহা লি আলবানী; হাদীস নং-১৪৩৪))

জন্ম ও বংশ পরিচয় : নবী করীম ﷺ-এর নবুওয়্যাত প্রাপ্তির পাঁচ বছর আগে উম্মুল কুরা তথা মক্কা নগরীতে ফাতিমা (রা) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা দু'জাহানের সর্দার রাসূল ﷺ এবং মাতা গোটা বিশ্বের নারী জাতির নেত্রী, প্রথম মুসলমান উম্মুল মু'মিনীন খাদীজা বিন্‌ত খুওয়াইলিদ (রা)। ফাতিমার যখন জন্ম হয় তখন মক্কার কুরাইশগণ পবিত্র কা'বা ঘরের সংস্কার কাজ চালাচ্ছে। সেটা ছিল মুহাম্মদ ﷺ-এর নবুওয়্যাত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পূর্বের ঘটনা। ফাতিমার জন্মগ্রহণে তাঁর পিতা-মাতা দারুণ খুশী হন।

ফাতিমা ছিলেন কনিষ্ঠা মেয়ে। মা খাদীজা (রা) তাঁর অন্য সন্তানদের জন্য ধাত্রীর ব্যাবস্থা করলেও ফাতিমাকে ধাত্রীর হাতে ছেড়ে দেননি। তিনি তার অতি আদরের ছোট কন্যাকে নিজে দুধ পান করান। এভাবে ফাতিমা (রা) একটি পূতঃপবিত্র ঘরে তাঁর মহান পিতা-মাতার তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হয়ে বেড়ে ওঠেন এবং নবুওয়্যাতের স্বচ্ছ ঝর্ণাধারায় স্নাত হন।

শ্রেষ্ঠত্বের কারণ : ফাতিমা (রা)-এর মহত্ব, মর্যাদা, আভিজাত্য ও শ্রেষ্ঠত্বের যেসব কথা উল্লেখ করা হয় তার কারণ সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১. তাঁর পিতা মানব জাতির আদি পিতা আদম (عليه السلام)-এর শ্রেষ্ঠ সন্তান রাহমাতুল্লিল আলামীন বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

২. তাঁর মা জগতের নারী জাতির নেত্রী, সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী উম্মুল মু'মিনীন খাদীজা বিন্‌ত খুওয়াইলিদ (রা)।

৩. স্বামী ইহকাল ও পরকালের নেতা আমীরুল মু'মিনীন আলী (রা)।

৪. তাঁর দুই পুত্র-আল-হাসান ও আল-হুসাইন (রা) জান্নাতের যুবকদের দুই মহান নেতা এবং নবী করীম ﷺ-এর সুগন্ধি (رَيْحَانَتَانِ)।

৫. তাঁর এক দাদা শহীদদের মহান নেতা হামযা (রা)।

৬. অন্য এক দাদা প্রতিবেশীর মান-মর্যাদার রক্ষক, বিপদ-আপদে মানুষের জন্য নিজের অর্থ-সম্পদ ব্যয়কারী, উলঙ্গ ব্যক্তিকে পোশাক দানকারী, অভুক্ত ও অনাহারে- ক্লিষ্টকে খাবার দানকারী আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা)।

৭. তাঁর এক চাচা মহান শহীদ নেতা ও সেনা নায়ক জা'ফর ইবন আবু তালিব (রা)।

ইসলাম গ্রহণ : নবী করীম ﷺ-এর ওপর ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পর উম্মুল মু'মিনীন খাদীজা (রা) সর্বপ্রথম তাঁর প্রতি ঈমান আনেন এবং তাঁর নবুওয়্যাতকে সত্য বলে গ্রহণ করেন। আর নবী করীম ﷺ-এর প্রতি প্রথম পর্বে যেসব নারী ঈমান গ্রহণ করেন তাঁদের পুরো ভাগে ছিলেন তাঁর পূতঃ পবিত্র কন্যাগণ। তাঁরা হলেন: যায়নাব, রুকাইয়া, উম্মে কুলছুম ও ফাতিমা (রা)। তাঁরা তাঁদের পিতার নবুওয়্যাত ও রিসালাতের প্রতি ঈমান গ্রহণ করেন তাঁদের মহিয়ষী মা খাদীজার (রা)-এর সাথে।

ইবন ইসহাক আয়েশা (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : আল্লাহ যখন তাঁর নবীকে নবুওয়্যাতে ভূষিত করলেন তখন খাদীজা ও তাঁর কন্যারা ইসলাম গ্রহণ করেন। এভাবে নবী করীম ﷺ-এর সন্তানগণ তাঁদের মায়ের

সাথে প্রথম ভাগেই ইসলামের আঙ্গিনায় প্রবেশ করেন এবং তাঁদের পিতার নবুওয়্যাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন। নবুওয়্যাত প্রাপ্তির আগেই তাঁরা উন্নত মানের নৈতিক গুণাবলিতে বিভূষিত হন। ইসলামের পরে তা আরো সুশোভিত ও সুষমামণ্ডিত হয়ে ওঠে।

ইমাম আয-যুরকানী শারহুল মাওয়াহিব' গ্রন্থে ফাতিমা ও তাঁর বোনদের প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণের কথা বলেছেন এভাবে : তাঁর কন্যাদের কথা উল্লেখের দরকার নেই। কারণ, নবুওয়্যাতের পূর্বেই তাঁদের পিতার জীবন ও আচার-আচরণ দৃঢ়ভাবে অনুসরণ ও শক্তভাবে আঁকড়ে ধরার বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অন্য এক জায়গায় আয্-যুরকানী নবী-দুহিতাদের ইসলাম গ্রহণের অগ্রগামিতা প্রসঙ্গে বলেছেন এভাবে : মোটকথা, আগেভাগে তাঁদের ইসলাম গ্রহণের বিষয়ে কোন প্রমাণের দরকার নেই।

সর্বাধিক সত্য, সর্বাধিক অভিজাত পিতৃত্ব এবং সর্বোত্তম ও সর্বাধিক স্নেহময়ী মাতৃত্বের ক্রোড়ে বেড়ে ওঠার কারণে তাঁরা লাভ করেছিলেন তাঁদের পিতার সর্বোত্তম আখলাক তথা নৈতিকতা এবং তাঁদের মাতা থেকে পেয়েছিলেন এমন বুদ্ধিমত্তা যার কোন তুলনা চলেনা পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালের কোন মহিলার সাথে। কাজেই রাসূল পরিবারের তথা তাঁর স্ত্রী-কন্যাদের ইসলাম ছিল স্বচ্ছ-স্বভাবগত ইসলাম। ঈমান ও নবুওয়্যাত দ্বারা যার পুষ্টি সাধিত হয়। মহত্ব, মর্যাদা ও উন্নত নৈতিকতার ওপর যাঁরা বেড়ে ওঠেন।

শৈশব-কৈশোরে পিতার সহযোগিতা : নবী করীম(সা)-এর ওপর ওহী অবতীর্ণ হলো। তিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আদেশ অনুযায়ী মানুষকে ইসলামের দিকে ডাকতে লাগলেন এবং ইসলামের প্রচার-প্রসারে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করলেন। আর এজন্য তিনি যত দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ, অত্যাচার-নির্যাতন, অস্বীকৃতি, মিথ্যা দোষারোপ ও বাড়াবাড়ির মুখোমুখী হলেন, সবকিছুই তিনি উপেক্ষা করতে লাগলেন। এক পর্যায়ে কুরাইশরা নবী করীম(সা)-এর সাথে চরম বাড়াবাড়ি ও শত্রুতা করতে লাগলো। তারা তাঁকে উপহাস করতে লাগলো, তাঁর প্রতি মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলতে শুরু করলো।

ফাতিমা (রা) তখন জীবনের শৈশব অবস্থা অতিক্রম করেছেন। পিতা যে তাঁর জীবনের একটা কঠিন সময় অতিবাহিত করছেন, কন্যা ফাতিমা এত অল্প বয়সেও তা উপলব্ধি করতে পারতেন। অনেক সময় তিনি পিতার সাথে ধারে-কাছে এদিক ওদিক গমন করতেন। একবার দুরাচারী উকবা ইবন আবী

মু'ঈতকে তাঁর পিতার সাথে এমন একটি অশালীন আচরণ করতে দেখেন যা তিনি আজীবন ভুলতে পারেননি। আসলে তার জন্মের কোন ঠিক- ঠিকানা ছিল না। একজন নিকৃষ্ট ধরণের পাপাচারী ও দুর্বৃত্ত হিসেবে সে বড় হয়ে ওঠে। তার জন্মের এ কালিমা ঢাকার জন্য সে সব সময় আগ বাড়িয়ে নানা রকম দুষ্কর্ম করে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের প্রীতিভাজন হওয়ার চেষ্টা করতো।

একবার উকবা মক্কার পাপাচারী পৌত্তলিক কুরাইশদের একটি সমাবেশে বসা ছিল। কিছু সংখ্যক কুরাইশ নেতা বললো : এ যে মুহাম্মদ সিজদায় আছেন। এখানে উপস্থিতদের মধ্যে এমন কে আছে, যে উটের এ পচাগলা নাড়ী-ভুঁড়ি উঠিয়ে নিয়ে তাঁর পিঠে ফেলে আসতে পারে? নরাধম উকবা অতি আগ্রহ সহকারে এ অপকর্মটি করার জন্য রাজী হয়ে বললো : আমি যাচ্ছি। তারপর সে দ্রুত পচা নাড়ী-ভুঁড়ির দিকে চলে গেল এবং সেগুলো উঠিয়ে সিজদারত মুহাম্মাদ ﷺ-এর পিঠের উপর ফেলে দিল। দূর থেকে কুরাইশ নেতারা এ দৃশ্য দেখে অট্ট হাসিতে ফেটে পড়লো। নবী করীম ﷺ সিজদা থেকে উঠলেন না। সাথে সাথে এ সংবাদ বাড়ীতে ফাতিমা (রা)-এর কানে গেল। তিনি ছুটে এলেন, অত্যন্ত দরদের সাথে নিজ হাতে পিতার পিঠ থেকে ময়লা সরিয়ে ফেলেন এবং পানি এনে পিতার শরীরে লাগা ময়লা পরিস্কার করেন। তারপর সে পাপাচারী দলটির দিকে এগিয়ে গিয়ে তাদেরকে অনেক কটু কথা শুনিয়ে দেন।

নবী করীম ﷺ সালাত শেষ করে দু'হাত উঠিয়ে দু'আ করলেন :

اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِشَيْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ، اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِاَبِيْ جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ، اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِعُقْبَةَ بْنِ اَبِىْ مُعِيْطٍ، اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِاُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ-

'হে আল্লাহ! তুমি শায়বা ইবন রাবী'আকে পাকড়াও কর, হে আল্লাহ! তুমি আবূ জাহ্ল ইবন হিশামকে ধর, হে আল্লাহ! তুমি উকবা ইবন আবী মু'ঈতকে সামাল দাও, হে আল্লাহ তুমি উমাইয়া ইবন খালাফের খোজ খবর নাও।'

নবী করীম ﷺ-কে হাত উঠিয়ে এভাবে দু'আ করতে দেখে পাষণ্ডদের হাসি থেমে যায়। তারা ভীত- শঙ্কিত হয়ে পড়ে। আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবীর দু'আ কবুল করেন। উল্লেখিত চার দুর্বৃত্তের সবাই বদরে নিহত হয়। উল্লেখ্য যে, উকবা বদরে মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। নবী করীম ﷺ তাকে হত্যার আদেশ করেন।

তখন সে বলে : মুহাম্মদ! আমার ছোট্ট মেয়েগুলোর জন্য কে থাকবে? বললেন : জাহান্নাম। তারপর সে বলে, আমি কুরাইশ হওয়া সত্ত্বেও আমাকে তুমি হত্যা করবে? বললেন : হ্যাঁ। তারপর তিনি সাহাবীদের দিকে তাকিয়ে বলেন : তোমরা কি জান এ লোকটি আমার সাথে কিরূপ আচরণ করেছিল? একদিন আমি মাকামে ইবরাহীমের পিছনে সিজদারত ছিলাম। এমন সময় সে এসে আমার ঘাড়ের উপর পা উঠিয়ে এতো জোরে চাপ দেয় যে, আমার চোখ দু'টি বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। আরেকবার আমি সিজদায় রত আছি। এমন সময় সে কোথা থেকে বকরীর বর্জ্য এনে আমার মাথায় ঢেলে দেয়। ফাতিমা দৌড়ে এসে তা সরিয়ে আমার মাথা ধৌত করে দেয়। মুসলমানদের হাতে এ পাপিষ্ঠ উকবার জীবনের সমাপ্তি ঘটে।

সেই কিশোর বয়সে ফাতিমা পিতার হাত ধরে একদিন কা'বার আঙ্গিনায় গমন করেন এবং তিনি দেখলেন, পিতা যেই না হাজরে আসওয়াদের নিকটে গেছেন অমনি একদল পৌত্তলিক একযোগে তাঁকে ঘিরে ধরে বলতে লাগলো : আপনি কি সে ব্যক্তি নন যিনি এমন এমন কথা বলে থাকেন? তারপর তারা একটা একটা করে গুণে বলতে থাকে : আমাদের বাপ-দাদাদের গালি দেন, উপাস্যদের দোষের কথা বলেন, বুদ্ধিমানও বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গকে নির্বোধ ও বোকা মনে করেন।

তিনি বলেন : হ্যাঁ, আমিই সে ব্যক্তি।

এর পরের ঘটনা দেখে বালিকা ফাতিমার শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। তিনি ভয়ে কাতর হয়ে পড়েন। দেখেন তাদের একজন তাঁর পিতার দেহের চাদরটি তাঁর গলায় পেঁচিয়ে জোরে টানতে শুরু করেছে। আর আবু বকর (রা) তাদের সামনে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন : তোমরা একটি লোককে শুধু এ জন্য হত্যা করবে যে, তিনি বলেন– আল্লাহ্ আমার রব ও পালনকর্তা?

লোকগুলো আগুন ঝরা দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালো। তাঁর দাড়ি ধরে টানলো, তারপর মাথা ফাটিয়ে রক্ত ঝরিয়ে ছাড়লো।

এভাবে আবু বকর (রা) সেদিন নিজের জীবন বিপন্নকর পাষণ্ডদের হাত থেকে মুহাম্মদ ﷺ-কে ছাড়ালেন। ছাড়া পেয়ে তিনি বাড়ীর পথ ধরলেন। কন্যা ফাতিমা পিতার পিছনে পিছনে চললেন। পথে স্বাধীন ও দাস যাদের সাথে দেখা হলো প্রত্যেকেই নানা রকম অশালীন মন্তব্য ছুড়ে মেরে ভীষণ কষ্ট দিল। নবী

করীম ﷺ সোজা বাড়ীতে চলে গেলেন এবং মারাত্মক ধরনের বিধ্বস্ত অবস্থায় বিছানায় এলিয়ে পড়লেন। বালিকা ফাতিমার চোখের সামনে এ ঘটনা সংঘটিত হলো।

শি'আবে আবী তালিবে ফাতিমা : কুরাইশরা নবী করীম ﷺ-এর উপর নির্যাতন চালানোর নতুন পদ্ধতি বের করলো। এবার তাদের নির্যাতনের হাত বনু হাশিম ও বনু আবদুল মুত্তালিবের প্রতিও সম্প্রসারিত হলো। মক্কার মুশরিকরা তাদেরকে বয়কট করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিল। নবী করীম ﷺ তাদের নিকট নত না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে ক্রয়-বিক্রয়, কথা বলা ও উঠাবসা বন্ধ। একমাত্র আবূ লাহাব ছাড়া বনু হাশিম ও বনু আবদুল মুত্তালিব মক্কার উপকণ্ঠে শি'আবে আবী তালিব'- এ আশ্রয় নেয়। তাদেরকে সেখানে অবরোধ করে রাখা হয়। অবরুদ্ধ জীবন এক সময় ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। "শি'আব'- এর বাইরে থেকেও সে সময় ক্ষুধায় কাতর নারী ও শিশুদের আহাজারি ও কান্নার আওয়াজ শোনা যেত। এ অবরুদ্ধদের মধ্যে ফাতিমা (রা)ও ছিলেন। এ অবরোধ তার স্বাস্থ্যের উপর দারুণ প্রভাব ফেলে। এখানে অনাহারে থেকে যে অপুষ্টির শিকার হন তা আমরণ বহন করে চলেন। এ অবরোধ প্রায় তিন বছর চলে।

অবরুদ্ধ জীবনের দুঃখ-বেদনা না ভুলতেই তিনি আরেকটি বড় ধরনের দুঃখের সম্মুখীন হন। স্নেহময়ী মা খাদীজা (রা) যিনি তাঁদের সকলকে আগলে রেখেছিলেন, যিনি অতি নীরবে পুণ্যময় নবীগৃহের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করে চলছিলেন, তিনি তখন ইন্তেকাল করেন। তিনি আল্লাহর নবী রাসূলে করীম ﷺ-এর যাবতীয় দায়িত্ব যেন কন্যা ফাতিমার ওপর অর্পণ করেন। তিনি অত্যন্ত আত্মপ্রত্যয় ও দৃঢ়তার সাথে পিতার পাশে এসে দাঁড়ান। পিতার আদর ও স্নেহ অধিক মাত্রায় পেতে থাকেন। মদীনায় হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত মক্কায় পিতার দা'ওয়াতি কার্যক্রমের সহযোগী হিসেবে অবদান রাখতে থাকেন। আর এ কারণেই তাঁর ডাক নাম হয়ে যায়– উম্মু আবীহা' (তাঁর পিতার মা)।

হিজরত ও ফাতিমা : নবী করীম ﷺ যে রাতে মদীনায় হিজরত করলেন সে রাতে আলী (রা) যে দুঃসাহসিক ভূমিকা পালন করেন, ফাতিমা (রা) অতি নিকট থেকে তা স্বচক্ষে দর্শন করেন। আলী (রা) নিজের জীবন বাজি রেখে কুরাইশ পাষণ্ডদের ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যে নবী করীম ﷺ-এর বিছানায় শুয়ে থাকেন। সে ভয়াবহ রাতে ফাতিমাও বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন। অত্যন্ত নির্ভীকভাবে কুরাইশদের সব চাপ প্রত্যাখ্যান করেন। তারপর আলী (রা) তিন দিন মক্কায়

থেকে নবী করীম ﷺ-এর নিকট গচ্ছিত অর্থ-সম্পদ মালিকদের নিকট প্রত্যার্পণ করে মদীনায় রওয়ানা হন।

ফাতিমা ও তাঁর বোন উম্মু কুলছুম মক্কায় রয়ে গেলেন। নবী করীম ﷺ মদীনায় একটু স্থির হওয়ার পর পরিবারের লোকদের নেয়ার জন্য একজন সাহাবীকে প্রেরণ করলেন। আর সেটা ছিল নবুওয়্যাতের ১৩ তম বছরের ঘটনা। ফাতিমা (রা)-এর বয়স তখন ১৮ বছর। মদীনায় পৌছে তিনি দেখেন সেখানে মুহাজিররা শান্তি ও নিরাপত্তা খুঁজে পেয়েছেন। বিদেশ-বিভুঁইয়ের একাকীত্বের অনুভূতি তাঁদের মধ্য থেকে লোপ পেয়েছে। নবী করীম ﷺ মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক করে দিয়েছেন। তিনি নিজে আলীকে (রা) দ্বীনি ভাই হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

বিয়ে : হিজরী দ্বিতীয় সনে বদর যুদ্ধের পরে আলী (রা)-এর সাথে ফাতিমা (রা)-এর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ আয়েশা (রা)-কে ঘরে উঠিয়ে নেয়ার চার মাস পরে আলী- ফাতিমার বিয়ে হয় এবং বিয়ের নয় মাস পরে তাঁদের ফুলশয্যা হয়। বিয়ের সময় ফাতিমা (রা)-এর বয়স পনেরো বছর সাড়ে পাঁচ মাস এবং আলী (রা)-এর বয়স একুশ বছর পাঁচ মাস। 'আল-ইসতীআব' গ্রন্থে ইবনু আবদিল বার উল্লেখ করেছেন যে, আলী (রা) ফাতিমা (রা)-কে বিয়ে করেন নবী করীম ﷺ-এর মদীনায় আসার পাঁচ মাস পরে রজব মাসে এবং বদর যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁদের বাসর (ফুলশয্যা) হয়। ফাতিমার বয়স তখন আঠারো বছর। তাবারীর তারিখে বলা হয়েছে, হিজরী দ্বিতীয় সনে হিজরতের বাইশ মাসের মাথায় যিলহাজ্জ মাসে 'আলী ও ফাতিমা (রা)-এর বাসর হয়। বিয়ের সময় আলী (রা) ফাতিমার চেয়ে বয়সে চার বছরের বড় ছিলেন।

আবূ বকর (রা) ও ওমর (রা)-এর মত উচুঁ মর্যাদার অধিকারী সাহাবীগণও ফাতিমা (রা)-কে স্ত্রী হিসেবে পেতে আগ্রহী ছিলেন। তাঁরা নবী করীম ﷺ-এর নিকট প্রস্তাবও দেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে প্রত্যাখ্যান করেন। হাকিমের মুসতাদরিক ও নাসাঈর সুনানে বর্ণিত আছে যে, আবূ বকর ও ওমর (রা) উভয়ে ফাতিমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। নবী করীম ﷺ তাঁদেরকে বলেন : সে এখনো ছোট। একটি বর্ণনায় এসেছে, আবূ বকর প্রস্তাব দিলেন। নবী করীম ﷺ বললেন : আবূ বকর! তাঁর প্রসঙ্গে আল্লাহর সিদ্ধান্তের অপেক্ষা কর। আবূ বকর (রা) একথা ওমর (রা)-কে জানালে জবাবে ওমর (রা) বললেন : তিনি তো আপনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন।

তারপর আবূ বকর (রা) ওমর (রা)-কে বললেন : এবার আপনি নবী করীম ﷺ-এর নিকট ফাতিমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিন। ওমর (রা) প্রস্তাব দিলেন। নবী করীম ﷺ আবু বকরকে যে কথা বলে ফিরিয়ে দেন, ওমরকেও ঠিক একই কথা বলেন। ওমর (রা) আবূ বকরকে সে কথা বললে তিনি মন্তব্য করেন: ওমর, তিনি আপনার প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করেছেন। তারপর ওমর (রা) আলী (রা)-কে বলেন, আপনিই ফাতিমার উপযুক্ত পাত্র। আলী (রা) বলেন, আমার সম্পদের মধ্যে এ একটি মাত্র বর্ম ছাড়া তো আর কিছু নেই। আলী-ফাতিমার বিয়েটি কিভাবে হয়েছিল সে বিষয়ে কতিপয় বর্ণনা পাওয়া যায় সেগুলো প্রায় কাছাকাছি। নিম্নে কতিপয় উপস্থাপন করা হলো।

তাবাকাতে ইবন সা'দ ও উসদুল গাবা গ্রন্থের একটি বর্ণনা মতে আলী (রা) ওমরের কথামত নবী করীম ﷺ-এর নিকট গমন করেন এবং ফাতিমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। নবী করীম ﷺ সাথে সাথে নিজ উদ্যোগে আলী (রা)-এর সাথে ফাতিমাকে বিয়ে দেন। এ সংবাদ ফাতিমার কানে পৌছলে তিনি কাঁদতে শুরু করেন। অতঃপর নবী করীম ﷺ ফাতিমার কাছে গমন করেন এবং তাঁকে লক্ষ্য করে বলেন : ফাতিমা! আমি তোমাকে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী, সর্বাধিক বিচক্ষণ এবং প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিয়েছি। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, আলী (রা) প্রস্তাব দানের পর নবী করীম ﷺ বলেন : ফাতিমা! আলী তোমাকে স্মরণ করে। ফাতিমা কোন জবাব না দিয়ে নীরব থাকেন। অতঃপর নবী করীম ﷺ বিয়ের কাজ সমাধা করেন।

অন্য একটি বর্ণনা আছে : মদীনার আনসারদের কতিপয় মানুষ আলীকে বলেন : আপনার জন্য তো ফাতিমা আছে। একথার পর আলী নবী করীম ﷺ-এর নিকট গমন করেন। নবী করীম ﷺ বলেন: আবূ তালিবের ছেলের কি দরকার? আলী ফাতিমার প্রসঙ্গে কথা বলেন। নবী করীম ﷺ কেবল মুখে উচ্চারণ করলেন : মারহাবান ওয়া আহলান। এর বেশী আর কিছু বললেন না। আলী নবী করীম ﷺ-এর নিকট থেকে উঠে অপেক্ষমান আনসারদের সে দলটির নিকট গেলেন। তারা জিজ্ঞেস করলেন : খবর কী? আলী বললেন– আমি জানিনা।

তিনি আমাকে "মারহাবান ওয়া আহলান" ছাড়া কিছু বলেননি। তারা বললেন : আলী নবী করীম ﷺ-এর পক্ষ থেকে আপনাকে এতটুকু বলাই কি যথেষ্ট নয়? তিনি আপনাকে পরিবারের সদস্য বলে স্বাগতম জানিয়েছেন। ফাতিমার সাথে কিভাবে বিয়ে হয়েছিল সে প্রসঙ্গে আলী (রা)-এর বর্ণনা এ রকম : নবী করীম ﷺ-এর নিকট ফাতিমার বিয়ের প্রস্তাব এলো। তখন আমার এক দাসী

আমাকে বললেন : আপনি কি একথা জানেন যে, নবী করীম ﷺ-এর নিকট ফাতিমার বিয়ের প্রস্তাব এসেছে?

আমি বললাম : না।

সে বললো : হ্যাঁ প্রস্তাব এসেছে। আপনি নবী করীম ﷺ-এর নিকট কেন যাচ্ছেন না? আপনি গেলে নবী করীম ﷺ ফাতিমাকে আপনার সাথেই বিয়ে দিবেন।

বললাম : বিয়ে করার মত আমার কিছু আছে কি?

সে বললো : যদি আপনি নবী করীম ﷺ-এর নিকট গমন করেন তাহলে তিনি অবশ্যই আপনার সাথে তাঁর বিয়ে দিবেন।

আলী (রা) বলেন : আল্লাহর কসম! সে আমাকে এভাবে আশা-ভরসা দিতে থাকে। পরিশেষে আমি একদিন নবী করীম ﷺ-এর কাছে আসলাম। তাঁর সামনে বসার পর আমি যেন বোবা হয়ে গেলাম। তাঁর মহত্ত্ব ও তাঁর মধ্যে বিরাজমান গাম্ভীর্য ও ভীতির ভাবের কারণে আমি কোন আলাপই করতে পারলাম না। এক সময় তিনিই আমাকে প্রশ্ন করলেন। কি জন্য এসেছো? কোন দরকার আছে কি?

আলী (রা) বলেন : আমি নীরব রইলাম। নবী করীম ﷺ বললেন : নিশ্চয়ই ফাতিমার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছো?

আমি বললাম : হ্যাঁ। তিনি বললেন : তোমার নিকট এমন কিছু আছে কি যা দ্বারা তুমি তাকে হালাল করবে? বললাম : আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রাসূল! নেই। তিনি বললেন : যে বর্মটি আমি তোমাকে দিয়েছিলাম তা কি করেছো?

বললাম : সেটা আমার নিকট আছে। আলীর জীবন যে সত্তার হাতে তার কসম, সেটা তো একটি "হুতামী" বর্ম। তার দাম চার দিরহামও হবে না।

নবী করীম ﷺ বললেন : আমি তারই বিনিময়ে ফাতিমাকে তোমার সাথে বিয়ে দিলাম। সেটা তার নিকট পাঠিয়ে দাও এবং তা দ্বারাই তাকে হালাল করে নাও।

আলী (রা) বলেন : এ ছিল ফাতিমা বিন্‌ত নবী করীম ﷺ-এর মোহর।

আলী (রা) খুব তাড়াতাড়ি বাড়ী গিয়ে বর্মটি নিয়ে আসেন। মেয়ের সাজগোজের জিনিসপত্র ক্রয় করার জন্য নবী করীম ﷺ সেটি বিক্রি করতে বলেন। বর্মটি উসমান ইবন আফ্‌ফান (রা) চার শো সত্তর (৪৭০) দিরহামে ক্রয় করেন। এ অর্থ নবী করীম ﷺ-এর হাতে দেয়া হয়। তিনি তা বিলালের (রা) হাতে দিয়ে

কিছু আতর-সুগন্ধি ক্রয় করতে বলেন, আর অবশিষ্ট যা থাকে উম্মু সালামার (রা) হাতে দিতে বলেন। যাতে তিনি তা দিয়ে মেয়ের সাজগোজের জিনিস ক্রয় করতে পারেন।

সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে গেল নবী করীম ﷺ সাহাবীদের আহ্বান করেন। তাঁরা হাযির হলে তিনি ঘোষণা দেন যে, তিনি তাঁর কন্যা ফাতিমাকে চারশো মিছকাল রূপার বিনিময়ে আলী (রা)-এর সাথে বিয়ে দিয়েছেন। তারপর আরবের প্রথা অনুযায়ী মেয়ের পক্ষ থেকে নবী করীম ﷺ ও বর আলী (রা) নিজে সংক্ষিপ্ত খুতবা দান করেন। তারপর উপস্থিত অতিথি সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে খোরমা ভর্তি একটা পাত্র পেশ করা হয়।

ফাতিমা (রা)-এর বিয়ের খুতবা : ফাতিমা ও আলী (রা)-এর বিয়েতে প্রদত্ত নবী করীম ﷺ-এর খুতবা।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْمَحْمُوْدِ بِنِعْمَتِهٖ، اَلْمَعْبُوْدُ بِقُدْرَتِهٖ، اَلْمَرْهُوْبُ مِنْ عَذَابِهٖ، اَلْمَرْغُوْبُ فِيْمَا عِنْدَهٗ، اَلنَّافِذُ اَمْرُهٗ فِىْ سَمَائِهٖ وَاَرْضِهٖ اَلَّذِىْ خَلَقَ الْخَلْقَ بِقُدْرَتِهٖ، وَمَيَّزَهُمْ بِاَحْكَامِهٖ، وَاَعَزَّهُمْ بِدِيْنِهٖ، وَاَكْرَمَهُمْ بِنَبِيِّهٖ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى جَعَلَ الْمُصَاهِرَةَ لاَحِقًا، وَاَمِرًا مُفْتَرِضًا، وَوَشَّجَ رَبُّهُ الْاَرْحَامَ، وَاَلْزَمَهُ الْاِنَامَ، قَالَ تَبَارَكَ اِسْمُهٗ، وَتَعَالٰى ذِكْرُهٗ : وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ من الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا فَاَمْرُ اللّٰهِ يَجْرِىْ اِلٰى قَضَائِهٖ وَلِكُلِّ قَضَاءٍ قَدْرٌ، وَلِكُلِّ قَدْرٍ اَجَلٌ يَمْحُو اللّٰهُ مَايَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهٗ اُمُّ الْكِتَابِ۔ ثُمَّ اِنَّ رَبِّىْ اَمَرَنِىْ اَنْ اُزَوِّجَ فَاطِمَةَ مِنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ، وَقَدْ زَوَّجْتُهَا اِيَّاهُ عَلٰى اَرْبَعَمِائَةِ مِثْقَالِ فِضَّةٍ، اِنْ رَضِىَ بِذٰلِكَ عَلِىٌّ۔

'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর যিনি তাঁর দান ও অনুগ্রহের কারণে প্রশংসিত, শক্তি ও ক্ষমতার জোরে উপাস্য, শাস্তির কারণে ভীতিপ্রদ এবং তাঁর নিকট যা কিছু রয়েছে তার জন্য প্রত্যাশিত। আসমান ও যমীনে তিনি স্বীয় বিধান বাস্তবায়নকারী। তিনি তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা দ্বারা এ সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করেছেন, তারপর বিধি নিষেধ দ্বারা তাদেরকে পার্থক্য করেছেন, দ্বীনের মাধ্যমে তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন এবং তাঁর নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর দ্বারা তাদেরকে সম্মানিত করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বিবাহ ব্যবস্থাকে পরবর্তী বংশ রক্ষার পন্থা এবং একটি অবশ্যকরণীয় কাজ করে দিয়েছেন। এর দ্বারা রক্ত সম্পর্ককে একটির সাথে আরেকটি সংযুক্ত করে দিয়েছেন। এ ব্যবস্থা সৃষ্টি জগতের জন্য বাধ্যতামূলক করেছেন।

(জামহারাতু খুতাব আল-'আরাব-৩/৩৪৪)

যাঁর নাম অতি বরকতময় এবং যাঁর স্মরণ সুমহান, তিনি বলেছেন : তিনিই পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন মানুষকে, অতঃপর তাকে রক্তগত বংশ ও বৈবাহিক সম্পর্কশীল করেছেন। তোমার প্রতিপালক সবকিছু করতে সক্ষম। অতএব আল্লাহর নির্দেশ চূড়ান্ত পরিণতির দিকে ধাবিত হয়। প্রত্যেকটি চূড়ান্ত পরিণতির একটি নির্ধারিত সময় আছে। আর প্রত্যেকটি নির্ধারিত সময়ের একটি শেষ আছে। আল্লাহ যা ইচ্ছা বিলীন করেন এবং স্থির রাখেন। আর মূল গ্রন্থ তাঁর নিকটই রয়েছে।'

অতঃপর, আমার প্রতিপালক আমাকে আদেশ করেছেন, আমি যেন আলীর সাথে ফাতিমার বিয়ে দিই। আর আমি তাঁকে চার শত মিছকাল' রূপার বিনিময়ে তার সাথে বিয়ে দিয়েছি- যদি এতে আলী সন্তুষ্ট থাকে।'

নবী করীম ﷺ-এর খুতবার পর তৎকালীন আরবের প্রথানুযায়ী বর আলী (রা) ছোট্ট একটি খুতবা দেন। প্রথমে আল্লাহর হামদ ও ছানা এবং রাসূলের প্রতি দুরূদ ও সালাম পেশ করেন। তারপর বলেন–

فَإِنَّ اجْتِمَاعَنَا مِمَّا قَدَّرَهُ قَدَّرَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى أَوْرَضِيَهُ، وَالنِّكَاحُ مَاأَمَرَهُ اللّٰهُ بِهِ وَأَذِنَ فِيْهِ، وَهٰذَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ زَوَّجَنِيْ فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ عَلٰى صَدَاقِ أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَثَمَانِيْنَ دِرْهَمًا، وَرَضِيْتُ بِهِ فَاسْئَلُوْهُ، وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا.

"আমাদের এ মজলিশ, আল্লাহ্ যা নির্ধারণ করেছেন এবং তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর বিয়ে হলো, আল্লাহ্ যা আদেশ করেছেন এবং যে বিষয়ে অনুমতি দান করেছেন। এ যে মুহাম্মদﷺতাঁর মেয়ে ফাতিমার সাথে আমাকে চার শত আশি দিরহাম মোহ্রের বিনিময়ে বিয়ে দিয়েছেন। আমি তাতে সন্তুষ্ট হয়েছি। অতএব আপনারা তাঁকে জিজ্ঞেস করুন। সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।"

(প্রাগুক্ত-৩/৩৪৫)

এভাবে অতি সাধারণ ও সাধারণভাবে আলীর সাথে রাসূলের কন্যা ফাতিমাতুয যাহ্রার বিয়ে সম্পন্ন হয়। অন্য কথায় ইসলামের দীর্ঘ ইতিহাসের সবচেয়ে মহান ও গৌরবময় বৈবাহিক সম্পর্কটি স্থাপিত হয়।

বাসর ও ওলীমা অনুষ্ঠান : আসমা' বিনত উমাইস (রা) যিনি আলী-ফাতিমা (রা)-এর বিয়ে ও তাঁদের বাসর ঘরের সাজ-সজ্জা দেখেছিলেন, তিনি : বলেছেন, খেজুর গাছের ছাল ভর্তি বালিশ– বিছানা ব্যতীত তাদের আর কিছু ছিল না। আর বলা হয়ে থাকে আলী (রা)-এর ওলীমার চেয়ে উত্তম কোন ওলীমা সে সময় আর হয়নি। সে ওলীমা কেমন হতে পারে তা অনুমান করা যায় এ বর্ণনার মাধ্যমে : আলী (রা) তাঁর একটি বর্ম এক ইহুদীর নিকট বন্ধক রেখে কিছু যব আনেন। তাঁদের বাসর রাতের খাবার কেমন ছিল তা এ বর্ণনা দ্বারা সহজেই অনুমান করা যায়।

তবে এ বিয়ে উপলক্ষে বনূ আবদুল মুত্তালিব জাঁকজমকপূর্ণ এমন একটা ভোজ অনুষ্ঠান করেছিল যে, তেমন অনুষ্ঠান নাকি ইতিপূর্বে তারা আর করেনি। সহীহাইন ও আল-ইসাবার বর্ণনা মতে তাহলো, হামযা (রা) যিনি মুহাম্মাদﷺ ও আলী উভয়ের চাচা, দুটো বুড়ো উট যবেহ করে আত্মীয়-স্বজনদের খাইয়েছিলেন।

বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলে আগত আত্মীয়-মেহমানগণ নব দম্পতির শুভ ও কল্যাণ কামনা করে একে একে বিদায় নিল। নবী করীমﷺ উম্মু সালামা (রা)-কে আহ্বান করেন এবং তাঁকে মেয়ের সাথে আলীর বাড়ীতে যাওয়ার জন্য বললেন। তাঁদেরকে এ কথাও বলে দিলেন, তাঁরা যেন সেখানে নবী করীমﷺ যাওয়ার অপেক্ষা করেন।

বিলাল (রা) এশার সালাতের আযান দিলেন। নবী করীমﷺমসজিদে এশার জামা'আতের ইমামতি করলেন। তারপর আলী (রা)-এর বাড়ী গমন করলেন। একটু পানি আনতে বললেন। পানি আনা হলে মহাগ্রন্থ আল কুরআনের কিছু

Contents

আয়াত তিলাওয়াত করে তাতে ফুঁক দিলেন। সে পানির কিছু বর-কনেকে পান করাতে বললেন। বাকী পানি দিয়ে নবী করীম ﷺ নীচে ধরে রাখা একটি পাত্রের মধ্যে ওযূ করলেন। সে পানি তাঁদের দু'জনের মাথায় ছিটিয়ে দিলেন। তারপর এ দু'আ পাঠ করতে করতে যাওয়ার জন্য উঠলেন।

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهِمَا، وَبَارِكْ عَلَيْهِمَا، وَبَارِكْ لَهُمَا فِيْ نَسْلِهِمَا.

"হে আল্লাহ! তুমি তাদের দু'জনের মধ্যে বরকত দান কর। হে আল্লাহ! তুমি তাদের দু'জনকে কল্যাণ দান কর। হে আল্লাহ! তাদের বংশধারায় সমৃদ্ধি দান কর।" (আ'লাম আন-নিসা-৪/১০৯)

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, যাবার সময় তিনি কন্যাকে লক্ষ্য করে বলেন : "ফাতিমা! আমার পরিবারের সর্বোত্তম সদস্যের সাথে তোমার বিয়ে দেয়ার বিষয় কোন ত্রুটি করিনি।"

ফাতিমা চোখের পানি সংবরণ করতে পারেননি। পিতা কিছু সময় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর পরিবেশকে হালকা করার জন্য অত্যন্ত আবেগের সাথে মেয়েকে বলেন : "আমি তোমাকে সবচেয়ে শক্ত ঈমানের অধিকারী, সবচেয়ে বড় জ্ঞানী, সবচেয়ে উত্তম নৈতিকতা ও উন্নত মন-মানসের অধিকারী ব্যক্তির নিকট গচ্ছিত রেখে যাচ্ছি।"

সংসার জীবন : মদীনায় আগমনের পর রজব মাসে এ বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। আর হিজরী দ্বিতীয় সনে বদর যুদ্ধের পর আলী (রা) তাঁর স্ত্রীকে উঠিয়ে নেয়ার জন্য একটি ঘর ভাড়া করতে সক্ষম হন। সে ঘরে বিত্ত-বৈভবের কোন স্পর্শ ছিল না। সে ঘর ছিল অতি সাধারণ মানের। সেখানে কোনো দামী আসবাবপত্র, খাট-পালঙ্ক, জাজিম, গদি কোন কিছুই ছিল না। আলীর ছিল কেবল একটি ভেড়ার চামড়া, যা বিছিয়ে তিনি রাতে নিদ্রা যেতেন এবং দিনে সেটি মশকের কাজে ব্যবহার হতো। কোন চাকর-বাকর ছিল না।

দারিদ্র্যের কঠোর বাস্তবতার সম্মুখীন : বাবার ঘর থেকে ফাতিমা যে স্বামীর ঘরে গমন করেন সেখানে কোন প্রাচুর্য ছিল না। বরং সেখানে যা ছিল তাকে দারিদ্র্যের বাস্তবতাই বলা সঙ্গত। সে ক্ষেত্রে তাঁর অন্য বোনদের স্বামীদের আর্থিক অবস্থা তুলনামূলক অনেক ভালো ছিল। যায়নাবের বিয়ে হয় আবুল 'আসের (রা) সাথে। তিনি মক্কার অন্যতম ধনী ব্যক্তি ছিলেন। রুকাইয়া ও উম্মু কুলছুমের (রা) বিয়ে হয় মক্কার বড় ধনী ব্যক্তি আবদুল উয্যা ইবন আবদুল মুত্তালিবের দুই

ছেলের সাথে। ইসলামের কারণে তাঁদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ার পর একের পর একজন করে তাঁদের দু'জনেরই বিয়ে হয় উসমান ইবন আফ্ফানের (রা) সাথে। আর উসমান (রা) ছিলেন একজন সম্পদশালী ব্যক্তি।

তাঁদের তুলনায় আলী (রা) ছিলেন একজন নিতান্ত দরিদ্র মানুষ। তাঁর নিজের অর্জিত সম্পদ বলে যেমন কিছু ছিল না, তেমনি উত্তরাধিকার সূত্রেও কিছু পাননি। তাঁর পিতা মক্কার সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তবে তেমন অর্থ-বিত্তের মালিক ছিলেন না। আর সন্তান ছিল অনেক। তাই বোঝা লাঘবের জন্য মুহাম্মদ ও তাঁর চাচা আব্বাস তাঁর দু ছেলের লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এভাবে মুহাম্মাদের পরিবারের সাথে আলী (রা) যুক্ত হন।

এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, আলী (রা)-এর মত মক্কার সম্ভ্রান্ত বংশীয় বুদ্ধিমান যুবক এত সীমাহীন দারিদ্র্যের মধ্যে থাকলেন কেন? এর জবাব আলী (রা)-এর জীবনের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায়। মুহাম্মাদ নবী হলেন। আলী (রা) কিশোরদের মধ্যে সর্বপ্রথম তাঁর প্রতি ঈমান আনলেন। ইবন ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী তখন তাঁর বয়স দশ বছর। আর তখন থেকে তিনি রাসূল-এর জীবনের সাথে জড়িয়ে পড়েন। নবী যত কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন হয়েছেন, আলীকেও তার মুখোমুখী হতে হয়েছে।

মক্কার অভিজাত ব্যক্তিবর্গের পেশা ছিল ব্যবসা। এখানে আলী (রা)-এর জীবন যেভাবে আরম্ভ হয় তাতে এ পেশার সাথে জড়ানোর সুযোগ ছিল কোথায়? মক্কার কুরাইশদের সাথে ঠেলা-ধাক্কা করতেই তো অনেক বছর কেটে যায়। মদীনায় গেলেন একেবারে খালি হাতে। সেখানে নতুন স্থানে নতুনভাবে দা'ওয়াতী কাজে জড়িয়ে পড়লেন। এর মধ্যে বদর যুদ্ধ এসে গেল। তিনি যুদ্ধে গেলেন। যুদ্ধের পর গণীমতের অংশ হিসেবে নবী করীম তাকে একটি বর্ম দিলেন। এ প্রথম তিনি একটি সম্পদের মালিক হলেন।

আলী (রা) যে একজন নিতান্ত দরিদ্র মানুষ ছিলেন তা ফাতিমার জানা ছিল। তাই, বালাযুরীর বর্ণনা যদি সত্য হয়-নবী করীম ফাতেমাকে যখন আলীর প্রস্তাবের কথা বলেন তখন ফাতিমা আলীর দারিদ্র্যের কথা উল্লেখ করেন। তার জবাবে নবী করীম বলেন :

"সে ইহকালে একজন নেতা এবং পরকালেও সে সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিদের একজন হবে। সাহাবীদের মধ্যে তার জ্ঞান বেশী। সে একজন বিচক্ষণও। তাছাড়া সর্বপ্রথম সে ইসলাম গ্রহণ করেছে।"

এ বর্ণনাটি সত্য হতেও পারে। কারণ, বিয়ে–শাদীর এ রকম পর্যায়ে অভাব-দারিদ্র্য বিবেচনায় আসা বিচিত্র কিছু নয়।

ফাতিমা (রা) আঠারো বছর বয়সে স্বামী গৃহে যান। সেখানে যে বিত্ত-বৈভবের কিছু মাত্র চিহ্ন ছিল না, সে কথা সব ঐতিহাসিকই বলেছেন। সে ঘরে গিয়ে পেলেন খেজুর গাছের ছাল ভর্তি চামড়ার বালিশ, বিছানা, এক জোড়া যাতা, দু'টো মশক, দু'টো পানির ঘাড়া, আর আতর-সুগন্ধি। স্বামী দারিদ্র্যের কারণে ঘর– গৃহস্থালীর কাজ-কর্মে তাঁকে সহায়তা করার জন্য অপেক্ষাকৃত কঠিন কাজগুলো করার জন্য কোন চাকর-চাকরাণী দিতে পারেননি। ফাতিমা (রা) একাই সব রকমের কাজ সম্পাদন করতেন। যাতা ঘুরাতে এবং ঘর-বাড়ী ঝাড় দিতে দিতে পরিহিত পোশাক ময়লা হয়ে যেত। তাঁর এভাবে কাজ করা আলী (রা) মেনে নিতে পারতেন না।

কিন্তু তাঁর করারও কিছু ছিল না। যতটুকু পারতেন নিজে তাঁর কাজে সাহায্য করতেন। তিনি সর্বদা ফাতিমার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সতর্ক থাকতেন। কারণ, মক্কী জীবনে নানারকম প্রতিকূল অবস্থায় তিনি যে অপুষ্টির শিকার হন তাতে বেশ ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে পড়েন। ঘরে-বাইরে এভাবে দু'জনে কাজ করতে করতে তাঁরা বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েন।

একদিন আলী (রা) তাঁর মা ফাতিমা বিন্‌ত আসাদ ইবনে হাশিমকে বলেন : তুমি পানি আনা ও বাইরের অন্যান্য কাজে নবী করীম ﷺ-এর কন্যাকে সাহায্য কর, আর ফাতিমা তোমাকে বাড়ীতে গম পেষা ও রুটি বানাতে সাহায্য করবে। এ সময় ফাতিমার পিতা নবী করীম ﷺ অঢেল যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও যুদ্ধবন্দীসহ বিজয়ীর বেশে একটি যুদ্ধ থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

একদা আলী (রা) বললেন : ফাতিমা! তোমার এমন কষ্ট দেখে আমার বড় দুঃখ হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বেশ কিছু যুদ্ধ বন্দী দিয়েছেন তুমি যদি তোমার বাবার নিকট গমন করে তোমার সেবার জন্য যুদ্ধ বন্দী একটি দাসের জন্য আবেদন জানাতে! ফাতিমা ক্লান্ত-শ্রান্ত অবস্থায় হাতের যাতা পাশে রাখতে রাখতে বলেন : আমি যাব ইনশাআল্লাহ। তারপর বাড়ীর আঙ্গিনায় একটু বিশ্রাম নিয়ে চাদর দিয়ে গা-মাথা ঢেকে আস্তে আস্তে পিতৃগৃহের দিকে অগ্রসর হলেন।

পিতা তাঁকে দেখে নরম স্বরে জিজ্ঞেস করলেন : মা! কেন এসেছো? ফাতিমা বললেন : আপনাকে সালাম জানাতে এসেছি। তিনি লজ্জায় পিতাকে মনের কথাটি প্রকাশ করতে পারলেন না। বাড়ী ফিরে এলেন এবং স্বামীকে সে কথা

বললেন। আলী (রা) এবার ফাতিমাকে সাথে নিয়ে নবী করীম ﷺ-এর নিকট গেলেন। ফাতিমা পিতার সামনে লজ্জায় মুখ নীচু করে নিজের প্রয়োজনের কথাটি এবার বলে ফেললেন। পিতা তাঁকে বললেন : মহান আল্লাহ্‌র কসম! তোমাদেরকে আমি একটি দাসও দিব না। আহ্‌লুস সুফ্‌ফার মানুষেরা না খেয়ে নিদারুণ কষ্টে আছে। তাদের জন্য আমি কিছুই করতে পারছিনে। এগুলো বিক্রি করে সে অর্থ আমি তাদের জন্য ব্যয় করবো।

একথা শ্রবণ করার পর তাঁরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে পিতাকে ধন্যবাদ দিয়ে ঘরে ফিরে আসেন। তাঁদেরকে এভাবে খালি হাতে ফেরত দিয়ে স্নেহশীল পিতা যে পরম শান্তিতে দিনাতিপাত করতে পেরেছিলেন তা কিন্তু নয়। সারাটি দিন কর্মক্লান্ত আদরের মেয়েটির চেহারা তাঁর মনের আয়নায় ভাসতে থাকে।

সন্ধ্যা হলো। ঠাণ্ডাও ছিল প্রচণ্ড। আলী-ফাতিমা শক্ত বিছানায় নিদ্রা যাওয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু এত ঠাণ্ডায় কি ঘুম আসে? এমন সময় দরজায় করাঘাতের শব্দ। দরজা খুলতেই তাঁরা দেখতে পান পিতা মুহাম্মাদ ﷺ দাঁড়িয়ে। তিনি দেখতে পান, এ প্রবল শীতে মেয়ে-জামাই যে কম্বলটি গায়ে দিয়ে নিদ্রা যাওয়ার চেষ্টা করছে তা এত ছোট যে দু'জন কোন রকম গুটিশুটি মেরে থাকা যায়।

মাথার দিকে টানলে পায়ের দিকে বেরিয়ে যায়। আবার পায়ের দিকে সরিয়ে দিলে মাথার দিক খোলা হয়ে যায়। তাঁরা এ মহান অতিথিকে স্বাগতম জানানোর জন্য পেরেশান হয়ে পড়েন। তিনি তাঁদেরকে পেরেশান না হয়ে যে অবস্থায় আছে সেভাবে থাকতে বলেন। তিনি তাঁদের অবস্থা অন্তর দিয়ে গভীরভাবে উপলব্ধি করেন, তারপর ভদ্রভাবে বলেন : তোমরা আমার নিকট যা চেয়েছিলে তার চেয়ে উত্তম কিছু কি আমি তোমাদেরকে বলে দিব?

তাঁরা দু'জনই এক সাথে বলে উঠলেন : বলুন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল!

তিনি বললেন : জিবরাঈল আমাকে এ শব্দ বা বাক্যগুলো শিখিয়েছেন : প্রত্যেক সালাতের পরে তোমরা দু'জন দশবার سُبْحَانَ اللّٰهِ, দশবার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ও দশবার اَللّٰهُ اَكْبَرُ পাঠ করবে। আর রাতে যখন নিদ্রা যাওয়ার উদ্দেশ্যে বিছানায় যাবে তখন سُبْحَانَ اللّٰهِ তেত্রিশবার, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ তেত্রিশবার, اَللّٰهُ اَكْبَرُ চৌত্রিশবার পাঠ করবে। একথা বলে তিনি কন্যা-জামাইকে রেখে দ্রুত চলে যান।

এ ঘটনার প্রায় ৩৫ বছর পরেও আলী (রা)-কে নবী করীম ﷺ-এর শিখানো এ কথাগুলো আলোচনা করতে শোনা গেছে। তিনি বলতেন: নবী করীম ﷺ আমাদেরকে এ কথাগুলো শিক্ষা দেওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত আমি একদিনও তা বাদ দেইনি। একবার একজন ইরাকী প্রশ্ন করেন : সিফ্‌ফীন যুদ্ধের সে ভয়াবহ রাতেও না? তিনি খুব জোর দিয়ে বলেন : সিফ্‌ফীনের সে রাতেও না।

এ বিষয়ে আরেকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। আলী (রা) একবার দারুণ অভাব– অনটনে পড়লেন। একদিন স্ত্রী ফাতিমা (রা)-কে বললেন, যদি তুমি নবী ﷺ এর নিকট গমন করে কিছু চেয়ে আনতে তাহলে ভালো হতো। ফাতিমা (রা) গেলেন। তখন রাসূল ﷺ-এর নিকট উম্মু আইমান (রা) বসা ছিলেন। ফাতিমা দরজায় খটখট আওয়াজ করলেন। রাসূল ﷺ উম্মু আইমানকে বললেন : নিশ্চয়ই এটা ফাতিমার হাতের টোকা। এমন সময় সে আমাদের নিকট আসল যখন সে সাধারণত আসতে অভ্যস্ত নয়।

ফাতিমা (রা) প্রবেশ করে বললেন হে আল্লাহর রাসূল! এ ফেরেশতাদের খাবার হলো তাসবীহ্- তাহ্‌লীল ও তাহ্‌মীদ। কিন্তু আমাদের খাবার কি? বললেন : সে সত্তার কসম যিনি আমাকে সত্যসহকারে প্রেরণ করেছেন, মুহাম্মাদের পরিবারের রান্না ঘরে তিরিশ দিন যাবত আগুন জ্বলে না। আমার নিকট কিছু ছাগল এসেছে, তুমি চাইলে পাঁচটি ছাগল তোমাকে দিতে পারি। আর তুমি যদি চাও এর বদলে আমি তোমাকে পাঁচটি কথা শিখিয়ে দিতে পারি যা জিবরাঈল আমাকে শিখিয়েছেন।

ফাতিমা (রা) বললেন : আপনি বরং আমাকে সে পাঁচটি কথা শিখিয়ে দিন যা জিবরাঈল আপনাকে শিখিয়েছেন। রাসূল ﷺ বললেন, বল–

يَآاَوَّلَ الْاَوَّلِيْنَ، يَآاٰخِرَ الْاٰخِرِيْنَ، وَيَاذَا الْقُوَّةِ الْمَتِيْنِ، وَيَارَاحِمَ الْمَسَاكِيْنِ، يَآاَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔

ফাতিমা (রা) এ পাঁচটি কথা শিখে আলী (রা)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করলেন। ফাতিমাকে দেখে আলী (রা) প্রশ্ন করলেন : খবর কি? ফাতিমা বললেন: আমি দুনিয়া পাওয়ার প্রত্যাশা নিয়ে তোমার নিকট থেকে গমন করেছিলাম, কিন্তু ফিরে এসেছি পরকাল নিয়ে। আলী (রা) বললেন : আজকের দিনটি তোমার জীবনের সর্বোত্তম দিন। (কান্‌য আল-উম্মাল-১/৩০২; হায়াত আস-সাহাবা-১/৪৩)

ছোটখাট দাম্পত্য কলহ : সে কৈশোরে একটু বুদ্ধি-জ্ঞান হওয়ার পর থেকে ফাতিমা যে অবস্থায় যৌবনের এ পর্যায়ে পৌছেছেন তাতে আনন্দ-ফূর্তি যে কি জিনিস তাতো তিনি অবগত নন। পিতা তাঁর নিকট থেকে নিকটে বা দূরে যেখানেই থাকেন না কেন সবসময় তাঁর জন্য উদ্বেগ উৎকণ্ঠার কোন সীমা থাকেনা। তিনি যখন যুদ্ধে গমন করেন তখন তা আরো শত গুণ বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া ছোটবেলা থেকেই পিতাকে আগলে রাখতে রাখতে তাঁর নিজের মধ্যেও একটা সংগ্রামী চেতনা গড়ে উঠেছে। তাই সুযোগ পেলে তিনি রণাঙ্গনে ছুটে যান।

উহুদ যুদ্ধে তাই তাঁকে আহত যোদ্ধাদেরকে পট্টি বাঁধতে, তাদের ক্ষতে ঔষধ লাগাতে এবং মৃত্যুপথযাত্রী শহীদদেরকে পানি পান করাতে দেখা যায়। যখন গৃহে অবস্থান করতেন তখন চাইতেন স্বামীর সোহাগভরা কোমল আচরণ। কিন্তু আলী (রা)-এর জীবনের যে ইতিহাস তাতে তাঁর মধ্যে এ কোমলতার সুযোগ কোথায়? তাঁর জীবনের সম্পূর্ণটাই তো হলো কঠোর সংগ্রাম, তাই তাঁর মধ্যে কিছুটা রূঢ়তা থাকা বিচিত্র কিছু নয়। ফলে তাঁদের উভয়ের সম্পর্ক মাঝে মধ্যে উত্তপ্ত হয়ে উঠতো। পিতার কানেও সে কথা পৌছে যেত। তিনি ছুটে যেতেন এবং ধৈর্যের সাথে দু'জনের মধ্যে আপোষ মীমাংসা করে দিতেন।

বর্ণিত আছে যে, একদিন নবী করীম ﷺ-কে সন্ধ্যার সময় একটু ব্যস্ততার সাথে মেয়ের বাড়ীর দিকে গমন করতে দেখা গেল, চোখে-মুখে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার ভাব। কিছুক্ষণ পর যখন সেখান থেকে বের হলেন তখন তাঁকে বেশ আনন্দিত দেখা গেল। সাহাবায়ে কিরাম বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে এক অবস্থায় প্রবেশ করতে দেখলাম, আর এখন বের হচ্ছেন হাসি-খুশী অবস্থায়!

তিনি জবাব দিলেন : আমার সবচেয়ে বেশী প্রিয় দু'জনের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করে দিলাম তাতে আমি খুশী হবো না।

আরেকবার ফাতিমা (রা) আলী (রা)-এর রূঢ়তায় কষ্ট পান। তিনি বলেন : আমি নবী করীম ﷺ-এর নিকট নালিশ জানাবো– একথা বলে ঘর থেকে বের হন। আলীও (রা) তাঁর পেছনে ছুটলেন। ফাতিমা তাঁর স্বামীর প্রতি যে কারণে ক্ষুব্ধ ছিলেন তা পিতাকে অবহিত করলেন, মহান পিতা বেশ কোমল ভাষায় বুঝিয়ে তাঁকে খুশী করেন। আলী (রা) স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ী ফেরার রাস্তায় বলেন: আল্লাহর কসম! তুমি অখুশী হও এমন কিছুই আমি আর কখনো করবো না।

ফাতিমার বর্তমানে আলী (রা)-এর দ্বিতীয় বিয়ের আকাংক্ষা : ফাতিমা (রা) না চাইলেও এমন কতিপয় বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটতো যা তাঁকে ভীষণ বিচলিত করে তুলতো। তাঁর স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করে ঘরে সতীন এনে উঠাবে ফাতিমা তা মোটেই মেনে নিতে পারেন না। আলী (রা) দ্বিতীয় বিয়ের ইচ্ছা করলেন। তিনি সহজভাবে হিসাব কষলেন, শরী'আতের বিধান মতে দ্বিতীয় বিয়ে করা তো জায়েয। অন্য মুসলিম নারীদের ক্ষেত্রে যেমন এক সাথে চারজনকে রাখা জায়েয তেমনিভাবে রাসূলﷺ-এর মেয়ের সাথেও অন্য আরেকজন স্ত্রীকে ঘরে আনাতে কোন দোষ নেই।

তিনি ধারণা করলেন, এতে ফাতিমা তাঁর প্রতি তেমন রাগ করবেন না। কারণ, তাঁর পিতৃগৃহেই তো এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। আয়েশা, হাফসা ও উম্মু সালামা (রা) তো এক সাথেই আছেন। তাছাড়া একবার বনূ মাখযূমের এক নারী চুরি করলে তার শাস্তি মওকুফের জন্য মহিলার আত্মীয়রা উসামা ইবন যায়েদের মাধ্যমে নবী করীমﷺ-এর নিকট আবেদন করে।

তখন নবী করীমﷺ বলেছিলেন : তুমি আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি রহিত করার জন্য সুপারিশ করছো? তারপর তিনি উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দেন। তাতে বলেন : তোমাদের পূর্ববর্তী বহু জাতি ধ্বংস হয়েছে এ জন্য যে, তাদের কোন গণ্যমান্য ব্যক্তি চুরি করলে তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর দুর্বল কেউ চুরি করলে তার ওপর "হদ" বা নির্ধারিত শাস্তি হাত কেটে দিত। এ বক্তব্যের মাধ্যমে আলী এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ফাতিমাও তো অন্য আর দশজন মুসলিম রমণীর মত।

এমন একটি সরল মনে আলী (রা) আরেকটি বিয়ের চিন্তা করেছিলেন, কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া যে এত ভয়াবহ আকার ধারণ করবে আলী (রা)-এর কল্পনায়ও তা আসেনি। আমর ইবন হিশাম ইবন আল-মুগীরা আল-মাখযূমীর কন্যাকে বিয়ের প্রস্তাব প্রেরণ করবেন, একথা প্রকাশ করতেই ফাতিমা ক্ষোভে-উত্তেজনায় ফেটে পড়লেন। নবী করীমﷺও রাগান্বিত হলেন।

আমর ইবন হিশাম তথা আবূ জাহেলের কন্যার সাথে আলীর বিয়ের প্রস্তাবের কথা ফাতিমার কানে যেতেই তিনি পিতার নিকট ছুটে গিয়ে অনুযোগের সুরে বলেন : আপনার সম্প্রদায়ের জনগণ ধারণা করে, আপনার কন্যার স্বার্থ ক্ষুণ্ন হলেও আপনি রাগ করেন না। এ আলী তো এখন আবূ জাহেলের কন্যাকে বিয়ে করছে।

আসলে কথাটি শ্রবণ করে নবী করীম ﷺ দারুণ ক্ষুব্ধ হন। কিন্তু বিষয়টি ছিল বেশ কঠিন। কারণ, এখানে আলী (রা)-এর অধিকারের প্রশ্নও জড়িত ছিল। ফাতিমাকে রেখেও আলী আরো একাধিক বিয়ে করতে পারেন। সে অধিকার আল্লাহ তাঁকে দিয়েছেন। এ অধিকারে নবী করীম ﷺ কিভাবে বাধা দিবেন? অন্যদিকে কলিজার টুকরো কন্যাকে সতীনের ঘর করতে হবে এটাও বড় দুঃখের বিষয়।

তাই বলে আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা কি তিনি হারাম করতে পারেন? না, তা পারেন না। তবে এখানে সমস্যাটির আরেকটি দিক আছে। তা হলো আলীর প্রস্তাবিত কনে আবূ জাহেল আমর ইবন হিশামের কন্যা। আলীর গৃহে তাঁর স্ত্রী হিসেবে আল্লাহর রাসূলের কন্যা এবং আল্লাহর শত্রুর কন্যা এক সাথে অবস্থান করতে পারে?

এ সেই আবূ জাহেল, ইসলামের প্রতি যার নিকৃষ্ট শত্রুতা এবং রাসূল ﷺ ও মুসলমানদের উপর নির্দয় যুলুম-নির্যাতনের কথা রাসূল ﷺ ও মুসলমানদের স্মৃতি থেকে এখনো মুছে যায়নি। আল্লাহর এ শত্রু একদিন কুরাইশদেরকে বলেছিল: ওহে কুরাইশ গোত্রের জনগণ! তোমরা এ মুহাম্মদকে আমাদের উপাস্যদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করে বেড়াতে, আমাদের পূর্বপুরুষকে গালিগালাজ করতে এবং আমাদের বুদ্ধিমান ব্যক্তিবর্গকে বোকা ও নির্বোধ বলে বেড়াতে দেখছো, তা থেকে সে বিরত হবে না।

আমি আল্লাহর নামে কসম করে বলছি, আগামীকাল আমি এমন একটি বড় পাথর নিয়ে বসে থাকবো। যখনই সে সিজদায় যাবে অমনি সে পাথরটি দিয়ে আমি তার মাথাটি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলবো। তখন তোমরা আমাকে বনু আবদে মান্নাফের হাতে সোপর্দ অথবা তাদের হাত থেকে রক্ষা, যা খুশী তাই করবে।

সে কুরাইশদের সমাবেশ রাসূল ﷺ-কে বিদ্রূপ করে বলে বেড়াতো : "ওহে কুরাইশ সম্প্রদায়! মুহাম্মদ ধারণা করে জাহান্নামে আল্লাহর যে সৈনিকরা তোমাদেরকে শাস্তি দিবে এবং বন্দী করে রাখবে তাদের সংখ্যা মাত্র উনিশজন। তোমরা তো তাদের চেয়ে সংখ্যায় অধিক। তোমাদের প্রতি এক শো' জনে কি তাদের একজনকে রুখে দিতে পারবে না? তখন নাযিল হয় কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত–

وَمَا جَعَلْنَا اَصْحَابَ النَّارِ اِلاَّ مَلاَئِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلاَّ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ـ

"আমি ফেরেশতাগণকে করেছি জাহান্নামের প্রহরী ; কাফিরদের পরীক্ষাস্বরূপই আমি তাদের এ সংখ্যা উল্লেখ করেছি।" (সূরা–৭৪ মুদ্দাচ্ছির : আয়াত-৩১)

এ সেই আবূ জাহেল যে আখনাস ইবন শুরাইককে যখন সে তার নিকট তার শ্রবণকৃত কুরআন প্রসঙ্গে জানতে চেয়েছিল, বলেছিল : তুমি কী শুনেছো? আমরা ও বনূ আবদে মান্নাফ মর্যাদা নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ করলাম। তারা মানুষকে আহার করালো, আমরাও করালাম। তারা মানুষের দায়িত্ব কাঁধে নিল আমরাও নিলাম। তারা মানুষকে দান করলো; আমরাও করলাম। এভাবে আমরা যখন বাজির দুই ঘোড়ার মত বরাবর হয়ে গেলাম তখন তারা বললো : আমাদের মধ্যে নবী আছে, আকাশ থেকে তাঁর নিকট ওহী আসে। এখন এ নবী আমরা কিভাবে পাব? আল্লাহর কসম! আমি কখনো তার প্রতি ঈমানও আনবো না, তাকে বিশ্বাসও করবো না।

এ সেই আবূ জাহেল যে কোন মর্যাদাবান ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে শ্রবণ করলে তাকে ভয়-ভীতি দেখাতো, হেয় ও অপমান করতো। বলতো : তুমি তোমার পিতাকে, যে তোমার চেয়ে উত্তম ছিল, ত্যাগ করেছো? তোমার বুদ্ধিমত্তাকে আমরা নির্বুদ্ধিতা বলে প্রচার করবো, তোমার অভিমত ও সিদ্ধান্তকে আমরা ভুল-ভ্রান্তিতে পূর্ণ বলে প্রতিষ্ঠা করবো এবং তোমার মান-মর্যাদা ধুলোয় মিশিয়ে দিব।'

আর কোন ব্যবসায়ী যদি ইসলাম গ্রহণ করতো, তাকে বলতো: আল্লাহর শপথ! আমরা তোমার ব্যবসায় লাটে উঠাবো, তোমার অর্থ-সম্পদের বারোটা বাজিয়ে ছাড়বো। আর ইসলাম গ্রহণকারী দুর্বল হলে শারীরিক শাস্তি দিয়ে তাকে ইসলাম ত্যাগের জন্য চাপ দিত। এ সেই আবূ জাহেল যে মক্কার শি'আবে আবী তালিবের অবরোধকালে হাকীম ইবন হিযাম ইবন খুওয়াইলিদকে তাঁর ফুফু খাদীজার (রা) জন্য সামান্য কিছু খাবার নিয়ে গমন করতে বাধা দিয়েছিল। এ অভিশপ্ত ব্যক্তি তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে বলেছিল : তুমি বনূ হাশিমের জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছো? আল্লাহর কসম! এ খাবার নিয়ে তুমি যেতে পারবে না। মক্কায় চলো, তোমাকে আমি অপমান করবো। সে পথ ছাড়তে অস্বীকার করলো। সেদিন দু'জনের মধ্যে তুমুল লড়াই হয়। এরই প্রেক্ষিতে নাযিল হয়–

إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ ـ طَعَامُ الْأَثِيْمِ ـ كَالْمُهْلِ يَغْلِىْ فِى الْبُطُوْنِ
كَغَلْىِ الْحَمِيْمِ ـ

"নিশ্চয়ই যাক্কুম বৃক্ষ পাপীর খাবার। গলিত তামার মত তাদের পেটে ফুটতে থাকবে। ফুটন্ত পানির মত।" (সূরা-৪৪ আদ-দুখান : আয়াত-৪৩)

এ আবূ জাহেল মক্কায় আগত নাজরানের একটি খ্রীষ্টান প্রতিনিধি দলের মুখোমুখী হয়। তারা এসেছিল মক্কায় মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুওয়্যাত লাভের সংবাদ পেয়ে তাঁর প্রসঙ্গে আরো তথ্য হাসিলের উদ্দেশ্যে। তারা নবী করীম ﷺ-এর সাথে সাক্ষাতের পর তাঁর কথা শ্রবণ করে ঈমান আনে। তারা নবী করীম ﷺ-এর মজলিস থেকে বেরিয়ে আসার পরই আবূ জাহেল তাদের সামনে এসে দাঁড়ায় এবং তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলে–

'আল্লাহ তোমাদের কাফেলাটিকে ব্যর্থ করুন। পিছনে রেখে আসা তোমাদের স্বধর্মাবলম্বীরা তোমাদেরকে প্রেরণ করেছে এ লোকটি প্রসঙ্গে তথ্য নিয়ে যাবার জন্য। তার নিকট তোমরা একটু স্থির হয়ে বসতে না বসতেই তোমাদের ধর্ম ত্যাগ করে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে বসলে? তোমাদের চেয়ে বেশী নির্বোধ কোন কাফেলার কথা আমার জানা নেই।'

এ আবূ জাহেল নবী করীম ﷺ-এর মদীনায় হিজরতের অব্যবহিত পূর্বে কুরাইশদেরকে বলেছিল, কুরাইশ গোত্রের প্রতিটি শাখা থেকে একজন করে সাহসী ও চালাক-চতুর যুবক নির্বাচন করে তার হাতে একটি করে তীক্ষ্ণ তরবারি তুলে দেবে। তারপর একযোগে মুহাম্মাদের উপর হামলা চালিয়ে এক ব্যক্তির মত এক আঘাতে তাকে হত্যা করবে। তাতে তার রক্তের দায়-দায়িত্ব কুরাইশ গোত্রের সকল শাখার ওপর সমানভাবে বর্তাবে।

নবী করীম ﷺ রাতে মদীনায় হিজরত করলেন। পরের দিন সকালে কুরাইশরা তাঁর খোঁজে বেরিয়ে পড়লো। তাদের মধ্যে আবূ জাহেলও ছিল। তারা আবূ বকরের (রা) ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁকডাক দিতে শুরু করলো– আবূ বকর (রা)-এর কন্যা আসমা (রা) বের হয়ে আসলেন। তারা প্রশ্ন করলো : তোমার বাবা কোথায়? তিনি বললেন : আল্লাহর শপথ! আমার বাবা কোথায় তা আমার জানা নেই। তখন যাবতীয় অশ্লীল ও দুষ্কর্মের হোতা আবূ জাহেল তার হাতটি উঠিয়ে সজোরে আসমা'র গালে এক থাপ্পড় বসিয়ে দেয়। আসমা'র কানের দুলটি ছিটকে পড়ে গেল।

বদরে যখন দু'পক্ষ যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ার তোড়-জোড় করছে তখন কুরাইশ বাহিনী এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করলে শত্রু বাহিনীর সংখ্যা ও শক্তি প্রসঙ্গে তথ্য নিয়ে আসার জন্য। সে ফিরে এসে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়ে সতর্ক করে দিল। হাকীম ইবন হিযাম ইবন খুওয়াইলিদ গেলেন উতবা ইবন রাবী'আর নিকট এবং তাকে লোক-লস্করসহ প্রত্যাবর্তন করার অনুরোধ জানালেন। উতবা নিমরাজি ভাব প্রকাশ করে সে হাকীমকে আবূ জাহেলের নিকট প্রেরণ করলো। কিন্তু আবূ জাহেল যুদ্ধ ব্যতীত হাকীমের কথা কানেই তুললো না।

এ সেই আবূ জাহেল, বদরের দিন নবী করীম ﷺ যে সাতজন কট্টর কাফিরের প্রতি বদ-দু'আ করেন, সে তাদের অন্যতম। এ যুদ্ধে সে অভিশপ্ত কাফির হিসেবে মৃত্যুবরণ করে। তার মাথাটি কেটে নবী করীম ﷺ-এর সামনে আনয়ন করলে তিনি আল্লাহর প্রশংসা করেন। নবী করীম ﷺ আবূ জাহেলের উটটি নিজের কাছে রেখে দেন। এর চার বছর পর উমরার উদ্দেশ্যে যখন মক্কার দিকে যাত্রা করেন তখন উটটি কুরবানীর পশু হিসেবে সংগে নিয়ে চলেন। পথে হুদায়বিয়াতে কুরাইশদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সেখানেই উটটি কুরবানী করেন।

ইসলামের এ জাতীয় শত্রুর কন্যা কি নবী করীম ﷺ-এর কন্যা ফাতিমা (রা)-এর সতীন হতে পারে? তাই আল্লাহ ও তাঁর নবী করীম ﷺ তা প্রত্যাখ্যান করেন। নবী করীম ﷺ রাগান্বিত অবস্থায় ঘর থেকে বেরিয়ে মসজিদের দিকে গমন করেন এবং সোজা মিম্বরে গিয়ে ওঠেন। তারপর উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশ্যে নিম্নের ভাষণটি দেন–

"বনু হিশাম ইবন আল-মুগীরা আলীর সাথে তাদের কন্যা দেয়ার বিষয়ে আমার অনুমতি চায়। আমি তাদেরকে সে অনুমতি দিব না। আমি তাদেরকে সে অনুমতি দিব না। আমি তাদেরকে সে অনুমতি দিব না। তবে আলী ইচ্ছা করলে আমার কন্যাকে তালাক দিয়ে তাদের কন্যাকে বিয়ে করতে পারে। কারণ, আমার কন্যা আমার শরীরের একটি অংশের মত। তাকে যা কিছু অস্থির করে তা আমাকেও অস্থির করে, আর যা তাকে কষ্ট দেয় তা আমাকেও কষ্ট দেয়। আমি তার দ্বীনের বিষয়ে সঙ্কটে পড়ার ভয় করছি।"

তারপর তিনি তাঁর জামাই আবুল 'আসের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। তার সাথে বৈবাহিক আত্মীয়তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন–

সে আমাকে কথা দিয়েছে এবং সে কথা সত্য প্রমাণিত করেছে। সে আমার সাথে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং তা পূরণ করেছে। আমি হালালকে হারাম করতে পারবো না। অনুরূপভাবে হারামকেও হালাল করতে পারবো না। তবে আল্লাহর রাসূলের কন্যা ও আল্লাহর শত্রুর কন্যার কখনো সহ অবস্থান হতে পারে না।

আলী (রা) মসজিদে ছিলেন। চুপচাপ বসে শ্বশুরের বক্তব্য শ্রবণ করলেন। তারপর মসজিদ থেকে বের হয়ে ধীরে ধীরে বাড়ীর পথ ধরলেন। এক সময় বাড়ীতে পৌছলেন, সেখানে দুঃখ ও বেদনায় ভারাক্রান্ত ফাতিমা বসা আছেন। আলী (রা) ধীরে ধীরে তাঁর পাশে গিয়ে বসলেন। কিছু সময় চুপ করে বসে থাকলেন। কি বলবেন তা যেন স্থির করতে পারছেন না। যখন দেখলেন ফাতিমা কান্নাকাটি করছেন, তখন ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে আস্তে করে বললেন–

ফাতিমা! তোমার অধিকার প্রসঙ্গে আমার ভুল হয়েছে। তোমার মত ব্যক্তিরা ক্ষমা করতে পারে। কিছু সময় কেটে গেল, ফাতিমা কোন জবাব দিলেন না। তারপর এক সময় বললেন : আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন। এবার আলী (রা) একটু সহজ হলেন। তারপর মসজিদের সব ঘটনা তাঁকে বর্ণনা করেন। তাঁকে একথাও বলেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আল্লাহর রাসূলের কন্যা ও আল্লাহর শত্রুর কন্যার সহঅবস্থান কখনো সম্ভব নয়। ফাতিমার দু'চোখ পানিতে ভরে গেল। তারপর তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন।

আবূ জাহলের সে কন্যার নাম নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মতে জুওয়াইরিয়া। তাছাড়া আল-'আওরা, আল-হানকা' জাহ্দাম ও জামীলাও বলা হয়েছে। ইসলাম গ্রহণ করে তিনি নবী করীম ﷺ-এর নিকট বাই'আত হন এবং নবী করীম ﷺ-এর কতিপয় হাদীসও স্মৃতিতে সংরক্ষণ করেন।

'আলী (রা) তাঁর প্রস্তাব তুলে নেন এবং আবূ জাহেলের কন্যাকে উতাব ইবন উসাইদ বিয়ে করেন।

এ ঘটনার পর ফাতিমা (রা) জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আলী (রা)-এর একক স্ত্রী হিসেবে অতিবাহিত করেন। ফাতিমা (রা)-এর ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করেননি। ফাতিমা হাসান, হুসাইন, উম্মু কুলছুম ও যয়নব-এ চার সন্তানের মা হন।

দ্বিতীয় বিয়ের ইচ্ছার এ ঘটনাটি ঘটেছিল যখন : এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায়, তা হলো– আলী (রা) কখন এ দ্বিতীয় বিয়ের ইচ্ছা করেছিলেন? ইতিহাস

ও সীরাতের গ্রন্থাবলিতে নবী করীম ﷺ-এর উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ ভাষণটি বর্ণিত হলেও কেউ তার সময়কাল সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করেননি। অথচ এটা রাসূল ﷺ-এর জীবন ও তাঁর পরিবারের জন্য ছিল একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

তাই কোন কোন বিশেষজ্ঞ নানাভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে এ সিদ্ধান্তে পৌছেছেন যে, এটা ছিল আলী-ফাতিমা (রা)-এর বিবাহিত জীবনের প্রথম দিকের ঘটনা। আর সুনির্দিষ্টভাবে তা হয়তো হবে হিজরী দ্বিতীয় সন, তৃতীয় সনে তাঁদের প্রথম সন্তান হাসান জন্মগ্রহণের পূর্বে। অবশ্য এটা সম্পূর্ণ অনুমান ভিত্তিক অভিমত; এর সপক্ষে কোন বিস্তারিত দলিল-প্রমাণ নেই।

হাসান- হুসাইনের জন্ম : আলী-ফাতিমা (রা)-এর জীবনে যে মেঘ দেখা দিয়েছিল তা কেটে গেল, জীবনের এক কঠিন পরীক্ষায় তারা সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হলেন। অভাব ও টানাটানির সংসারটি আবার প্রেম-প্রীতি ও সহমর্মিতায় পরিপূর্ণ হল। এরই মধ্যে হিজরী তৃতীয় সনে তাঁদের প্রথম সন্তান হাসানের জন্ম হলো। ফাতিমার পিতা রাসূল ﷺ-কে সুসংবাদ দেয়া হলো।

তিনি দ্রুত ছুটে গেলেন এবং আদরের কন্যা ফাতিমার সদ্যপ্রসূত সন্তানকে দু'হাতে নিয়ে তার কানে আযান দেন এবং গভীরভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকেন। গোটা মদীনা যেনো আনন্দ-উৎসবে মেতে ওঠে। নবী করীম ﷺ-এর নাতি হাসানের মাথা মুড়িয়ে তার চুলের সমপরিমাণ ওজনের রূপা-গরীব-মিসকীনদের মধ্যে দান করে দেন। শিশু হাসানের বয়স এক বছরের কিছু বেশী হতে না হতেই চতুর্থ হিজরীর শা'বান মাসে ফাতিমা (রা) দ্বিতীয় সন্তান উপহার দেন। আর এ শিশু হলেন হুসাইন।

তিনি শিশু হাসানকে দু'হাতের উপর রেখে দোলাতে দোলাতে নিম্নের বাক্যটি আবৃত্তি করতেন–

إِنَّ بَنِيَّ شَبَهُ النَّبِيِّ لَيْسَ شَبِيْهًا بِعَلِيٍّ -

'আমার সন্তান নবীর মত দেখতে, আলীর মত নয়।'

হাসান-হুসাইনের প্রতি নবী করীম ﷺ-এর আদর ও স্নেহ : নবী করীম ﷺ-এর অতি আদরের এ দুই নাতি যেমন তাঁর অন্তরে প্রশান্তি বয়ে আনে তেমনি তাঁদের মা ফাতিমার দু'কোল ভরে দেয়। খাদীজার (রা) মৃত্যুর পর নবী করীম ﷺ বেশ কয়েকজন রমণীকে স্ত্রীর মর্যাদা দান করেন, কিন্তু তাঁদের কেউই তাঁকে সন্তান উপহার দিতে পারেননি। পুত্র সন্তানের যে অভাববোধ তাঁর মধ্যে ছিল তা এ দুই নাতিকে পেয়ে দূর হয়ে যায়। এ দুনিয়ায় তাঁদের মাধ্যমে

নিজের বংশধারা বিদ্যমান থাকার সম্ভাবনায় নিশ্চিন্ত হন। এ কারণে তাঁর পিতৃস্নেহও তাঁদের ওপর বর্তায়। আর তাই এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, তিনি তাঁদের দু'জনকে নিজের ছেলে হিসেবে অভিহিত করেছেন।

আনাস ইবন মালিক থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম ﷺ ফাতিমা (রা)-কে বলতেন, আমার ছেলে দুটোকে ডাক। তাঁরা নিকটে এলে তিনি তাঁদের শরীরের গন্ধ শুঁকতেন এবং জড়িয়ে ধরতেন। উসমান ইবন যায়েদ (রা) বলেছেন, আমি একদিন কোন একটি প্রয়োজনে নবী করীম ﷺ-এর ঘরের দরজায় খটখট আওয়াজ দিলাম। তিনি দেহের চাদরে কিছু জড়িয়ে বেরিয়ে এলেন। আমি বুঝতে পারলাম না চাদরে ঢেকে রেখেছেন কি জিনিস?

তিনি চাদরটি সরালে দেখলাম, হাসান ও হুসাইন। তারপর তিনি বললেন : এরা দু'জন হলো আমার ছেলে এবং আমার কন্যার ছেলে। হে আল্লাহ! আমি এদের দু'জনকে ভালোবাসি, আপনিও তাদেরকে ভালোবাসুন। আর তাদেরকে যারা ভালোবাসে তাদেরকেও ভালোবাসুন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ফাতিমা আয-যাহ্‌রা'র প্রতি বড় দয়া ও অনুগ্রহ করেছেন। তিনি তাঁর মাধ্যমে রাসূল ﷺ-এর বংশধারা সংরক্ষণ করেছেন। তেমনিভাবে আলী (রা)-এর ঔরসে সর্বশেষ নবীর বংশধারা দান করে আল্লাহ তাঁকেও এক চিরকালীন সম্মান ও মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। রক্ত সম্পর্কের দিক দিয়ে আলী (রা) নবী করীম ﷺ-এর নিকটতম জামাই। তাঁর দেহে পরিচ্ছন্ন হাশেমী রক্ত বহমান ছিল। নবী করীম ﷺ ও আলী (রা)-এর বংশধারা আবদুল মুত্তালিবে গিয়ে মিলিত হয়েছে। উভয়ে ছিলেন তাঁর নাতি। আলী (রা)-এর পিতা আবূ তালিব নবী করীম ﷺ-কে পুত্রস্নেহে লালন পালন করেন।

পরবর্তীতে নবী করীম ﷺ সে পিতৃতুল্য চাচার ছেলে 'আলীকে পিতৃস্নেহে পালন করে নিজের কলিজার টুকরা মেয়েকে তাঁর নিকট সোপর্দ করেন। কাজেই নবী করীম ﷺ-এর নিকট আলী (রা)-এর স্থান ও মর্যাদা ছিল অত্যুচ্চ। আলী (রা) বলেন, একদিন আমি নবী করীম ﷺ-কে প্রশ্ন করলাম : আমি ও ফাতিমা - এ দু'জনের মধ্যে কে আপনার নিকট অধিক প্রিয়? বললেন : ফাতিমা তোমার চেয়ে আমার নিকট অধিক প্রিয়। আর তুমি আমার নিকট তার চেয়ে অধিক সম্মানের পাত্র।

এ জবাবের মধ্যে নবী করীম ﷺ-এর নিকট ফাতিমা ও আলী (রা)-এর স্থান ও মর্যাদা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ কারণে শত ব্যস্ততার মাঝে সুযোগ পেলেই তিনি

ছুটে যেতেন তাঁর সবচেয়ে প্রিয় এ দম্পতির ঘরে এবং অতি আদরের নাতিদ্বয়কে কোলে তুলে নিয়ে স্নেহের পরশ বুলাতেন। একদিন তাঁদের ঘরে গমন করে দেখেন, আলী-ফাতিমা ঘুমিয়ে আছেন, আর শিশু হাসান খাবারের জন্য কান্না জুড়ে দিয়েছে। তিনি তাঁদের দু'জনের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটালেন না। হাসানকে কোলে নিয়ে বাড়ীর আঙ্গিনায় বাধা একটি ছাগীর কাছে চলে যান এবং নিজ হাতে ছাগীর দুধ দোহন করে হাসানকে পান করিয়ে তাকে শান্ত করেন।

আর একদিনের ঘটনা। নবী করীম ﷺ ফাতিমা- আলী (রা)-এর বাড়ীর পাশ দিয়ে ব্যস্ততার সাথে কোথাও গমন করছেন। এমন সময় হুসাইনের কান্নার আওয়াজ তাঁর কানে ভেসে আসল। তিনি বাড়ীতে প্রবেশ করে কন্যাকে তিরস্কারের সুরে বললেন : তুমি কি জান না, তার কান্না আমাকে কষ্ট দেয়।

কন্যা যয়নব ও উম্মু কুলছুমের জন্ম : এরপর এ দম্পতির সন্তান সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। হিজরী ৫ম সনে ফাতিমা (রা) প্রথম কন্যার মা হন। নানা নবী করীম ﷺ তার নাম রাখেন "যয়নব"। উল্লেখ্য যে, ফাতিমার এক সহোদরার নাম ছিল "যয়নব" মদীনায় হিজরতের পর ইনতিকাল করেন। সেই যয়নবের স্মৃতি তাঁর পিতা ও বোনের অন্তরে বিদ্যমান ছিল। সেই খালার নামে ফাতিমার এ কন্যার নাম রাখা হয়। এর দু'বছর পর ফাতিমা (রা) দ্বিতীয় কন্যার মা হন। তারও নাম রাখেন নানা নবী করীম ﷺ নিজের অপর মৃত কন্যা উম্মু কুলছুমের নামে। এভাবে ফাতিমা (রা) তাঁর কন্যার মাধ্যমে নিজের মৃত দু'বোনের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখেন। ফাতিমা (রা)-এর এ চার সন্তানকে জীবিত রেখেই নবী করীম ﷺ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সান্নিধ্যে চলে যান।

ফাতিমা (রা)-এর সব সন্তানই ছিল নবী করীম ﷺ-এর কলিজার টুকরা বিশেষত: হাসান ও হুসাইনের মধ্যে তিনি যেন নিজের পরলোকগত পুত্র সন্তানদেরকে খুঁজে পান। তাই তাদের প্রতি ছিল বিশেষ মুহাব্বত (ভালবাসা)। একদিন তিনি তাদের একজনকে কাঁধে করে মদীনার বাজারে ঘুরছেন। সালাতের সময় হলে তিনি মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং তাকে খুব আদরের সাথে এক পাশে বসিয়ে সালাতের ইমাম হিসেবে দাঁড়িয়ে গেলেন।

কিন্তু এত দীর্ঘ সময় সিজদায় কাটালেন যে পিছনের মুক্তাদিরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। সালাত শেষে কেউ একজন জিজ্ঞেস করলো : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এত দীর্ঘ সিজদা করেছেন যে, আমরা ধারণা করেছিলাম কিছু একটা ঘটেছে অথবা ওহী নাযিল হয়েছে। জবাবে তিনি বললেন : না, তেমন কিছু

ঘটেনি। আসল ঘটনা হলো, আমার ছেলে (নাতি) আমার পিঠে বসেছিল। আমি চেয়েছি তার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। তাই তাড়াতাড়ি করিনি।

একদিন নবী করীম ﷺ মিম্বরের উপর বসে ভাষণ দিচ্ছেন। এমন সময় দেখলেন হাসান ও হুসাইন দুই ভাই লাল জামা পরিধান করে উঠা-পড়া অবস্থায় হেঁটে আসছে। তিনি ভাষণ বন্ধ করে মিম্বর থেকে নেমে গিয়ে তাদের দু'জনকে উঠিয়ে সামনে এনে বসান। তারপর তিনি উপস্থিত শ্রোতাকে উদ্দেশ্য করে বলেন : আল্লাহ্ সত্যই বলেছেন–

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ.

'তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পরীক্ষা বিশেষ।'

(সূরা–৬৪ তাগাবুন : আয়াত-১৫)

আমি দেখলাম, এ শিশু দু'টি হাঁটছে আর পড়ছে। এ দৃশ্য দেখে সহ্য করতে না পেরে কথা বন্ধ করে তাদেরকে উঠিয়ে এনেছি।

আরেকদিন তো দেখা গেল, শিশু হুসাইনের দু'কাঁধের উপর নবী করীম ﷺ-এর হাত। আর তার দু'পা নবী করীম ﷺ-এর দু'পায়ের উপর। তিনি তাকে শক্ত করে ধরে বললেন, উপরে বেয়ে ওঠো। হুসাইন উপরের দিকে উঠতে উঠতে এক সময় নানার বুকে পা রাখলো। এবার তিনি হুসাইনকে বললেন : মুখ খোল। সে হা করলো। তিনি তার মুখে চুমু দিয়ে বললেন, "হে আল্লাহ্! আমি তাকে ভালোবাসি এবং সেও আমাকে ভালোবাসে। তাকে যারা ভালোবাসে আপনি তাদের ভালোবাসুন।

একদিন নবী করীম ﷺ কিছু সংখ্যক সাহাবীকে সঙ্গে করে কোথাও দাওয়াত খেতে যাচ্ছেন। রাস্তায় হুসাইনকে তার সমবয়সী শিশুদের সাথে খেলতে দেখলেন। নবী করীম ﷺ দু'হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে এগিয়ে গেলেন। সে নানার হাতে ধরা না দেয়ার জন্য একবার এদিক, একবার ওদিক ছুটাছুটি করতে থাকে। নবী করীম ﷺ হাসতে হাসতে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ান। এক সময় তাকে ধরে নিজের একটি হাতের উপর বসান এবং অন্য হাতটি তার চিবুকের নীচে রেখে তাকে চুমু দেন। তারপর বলেন : হুসাইন আমার অংশ এবং আমি হুসাইনের অংশ।

ফাতিমার বাড়ীর দরজায় আবূ সুফিয়ান : সময় অতিবাহিত হতে লাগল। ইসলামের আলোতে গোটা আরবের অন্ধকার বিদূরিত হতে চললো। এক সময়

নবী করীম ﷺ মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। মদীনায় ব্যাপক সাড়া পড়ে গেল। এ অভিযানে নারী-পুরুষ সকলেই অংশ নিবে। মক্কায় এ সংবাদ সময় মত পৌছে গেল। পৌত্তলিক কুরাইশদের হৃদকম্পন শুরু হলো। তারা ভাবলো এবার আর রক্ষা নেই। অনেক কিছু চিন্তা-ভাবনার পর তারা মদীনাবাসীদেরকে তাদের সিদ্ধান্ত থেকে বিরত রাখার জন্য আবূ সুফিয়ান ইবন হারবকে মদীনায় প্রেরণ করলো। কারণ, ইতোমধ্যে তাঁর কন্যা উম্মু হাবীবা রামলা (রা) ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং নবী করীম ﷺ তাঁকে স্ত্রীর মর্যাদা দান করেছেন। অতএব তাঁকে দিয়েই এ কাজ সম্ভব হবে।

আলী ও ফাতিমা অভিযানে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলেন। রওয়ানা দেয়ার পূর্বে একদিন রাতে তাঁরা সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন। নানা স্মৃতি তাঁদের মানসপটে ভেসে উঠছে। মাঝে মাঝে তাঁরা স্মৃতিচারণও করছেন। আট বছর পূর্বে যে মক্কা তাঁরা পিছনে রেখে চলে এসেছিলেন তা কি তেমনই আছে? তাঁদের স্মৃতিতে তখন ভেসে উঠছে মা খাদীজা (রা), পিতা আবূ তালিবের ছবি। এমনই এক ভাব-বিহ্বল অবস্থার মধ্যে যখন তাঁরা তখন হঠাৎ দরজায় খটখট আওয়াজ হলো। এত রাতে আগন্তুক কে তা দেখার জন্য আলী (রা) দরজার দিকে অগ্রসর হলেন। ফাতিমাও সে দিকে তাকিয়ে থাকলেন। দরজা খুলতেই তাঁরা দেখতে পেলেন আবূ সুফিয়ান ইবন হারব দণ্ডায়মান। এ সেই আবূ সুফিয়ান, যিনি মক্কার পৌত্তলিক বাহিনীর পতাকাবাহী এবং উহুদের শহীদ হামযা (রা)-এর বুক ফেঁড়ে কলিজা বের করে চিবিয়ে ছিল যে হিন্দ, তার স্বামী।

আবূ সুফিয়ান বলতে লাগলেন, কিভাবে মদীনায় আগমন করেছেন এবং কেন এসেছেন, সে কথা। বললেন : মক্কাবাসীরা মুহাম্মাদের ﷺ আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য,. তাঁর সাথে একটা সমঝোতায় পৌছানোর উদ্দেশ্যে তাঁকে প্রেরণ করেছে। তিনি নিজের পরিচয় গোপন করে মদীনায় প্রবেশ করেছেন এবং সরাসরি নিজের কন্যা উম্মুল মু'মিনীন উম্মু হাবীবা রামলা (র)-এর ঘরে হাযির হয়েছেন। সেখানে নবী করীম ﷺ-এর বিছানায় বসার জন্য উদ্যত হতেই নিজ কন্যার নিকট বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন। কারণ, তিনি একজন মুশরিক, অপবিত্র।

আল্লাহর নবী করীম ﷺ-এর পবিত্র বিছানায় বসার যোগ্যতা তাঁর নেই। কন্যা বিছানাটি গুটিয়ে নেন। মনে বড় ব্যথা নিয়ে তিনি রাসূল ﷺ-এর নিকট গমন করেন এবং তাঁর সাথে অভিযানের নিকট থেকেও একই আচরণ লাভ করেন। তারপর যান ওমরের (রা) নিকট। তিনি তাঁর বক্তব্য শ্রবণ করে বলেন : আমি যাব তোমার জন্য সুপারিশ করতে নবী করীম ﷺ-এর নিকট? আল্লাহর কসম!

ভূমিতে উদগত সামান্য উদ্ভিদ ব্যতীত আর কিছুই যদি না পাই, তা দিয়েই তোমাদের সাথে লড়বো।

এ পর্যন্ত বলার পর আবূ সুফিয়ান একটু নীরব হলেন, তারপর একটা ঢোক গিলে আলী (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন : ওহে আলী! তুমি আমার সম্প্রদায়ের প্রতি সবচেয়ে বেশী সদয়। আমি একটা প্রয়োজনে তোমার নিকট এসেছি। অন্যদের নিকট থেকে যেমন নিরাশ হয়ে ফিরেছি, তোমার নিকট থেকে সেভাবে ফিরতে চাই না। তুমি আমার জন্য একটু নবী করীম ﷺ-এর নিকট একটু সুপারিশ কর।

আলী (রা) বললেন : আবূ সুফিয়ান! তোমার অনিষ্ট হোক। আল্লাহর কসম! নবী করীম ﷺ একটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলছেন। সে বিষয়ে আমরা কোন কথা বলতে পারি না।

এবার আবূ সুফিয়ান পাশে নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ফাতিমার দিকে তাকালেন এবং পাশের বিছানায় সদ্য ঘুম থেকে জাগা ও মায়ের দিকে এগিয়ে আসা হাসানের দিকে ইঙ্গিত করে ফাতিমাকে বললেন: ওহে মুহাম্মাদের কন্যা! তুমি কি তোমার এ ছেলেকে বলবে, সে যেন মানুষের মাঝে দাঁড়িয়ে তার গোত্রের লোকদের নিরাপত্তার ঘোষণা দিক এবং চিরকালের জন্য গোটা আরবের নেতা হয়ে থাক?

ফাতিমা জবাব দিলেন : আমার এ এতটুকু ছেলে মানুষের সামনে দণ্ডায়মান হয়ে কাউকে নিরাপত্তা দেওয়ার ঘোষণা দেয়ার বয়স হয়নি। আর নবী করীম ﷺ-কে ডিঙ্গিয়ে কেউ কাউকে নিরাপত্তা দিতে পারে না।

হতাশ অবস্থায় আবূ সুফিয়ান যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। দরজা পর্যন্ত গমন করে একটু থামলেন। তারপর কোমল কণ্ঠে বললেন : আবু হাসান (আলী)! মনে হচ্ছে বিষয়টি আমার জন্য অত্যন্ত জটিল হয়ে গেছে। তুমি আমাকে একটু পরামর্শ দাও।

আলী (রা) বললেন : আপনার প্রয়োজন হবে এমন কোন পরামর্শ আমার জানা নেই। তবে আপনি হলেন কিনান (কুরাইশ গোত্রের একটি শাখা) গোত্রের নেতা। আপনি নিজেই জনমণ্ডলীর সামনে দণ্ডায়মান হয়ে নিরাপত্তার আবেদন করুন। তারপর নিজের জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করুন।

আবূ সুফিয়ান বললেন : এটা কি আমার কোন কাজে আসবে? আলী (রা) কিছু সময় নীরব থেকে বললেন : আল্লাহর কসম! আমি তা মনে করি না। কিন্তু আমি তো আপনার জন্য এছাড়া আর কোন রাস্তা দেখছিনা।

আবূ সুফিয়ান আলী (রা)-এর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে চলে গেলেন। আর এ দম্পতি ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অসীম ক্ষমতার কথা চিন্তা করতে লাগলেন। তাঁরা ভাবতে লাগলেন উম্মুল কুরা মক্কা, কা'বা কুরাইশদের বাড়ীঘর ইত্যাদির কথা।

মক্কা বিজয় অভিযানে ফাতিমা (রা) : দশ হাজার মুসলমান সঙ্গীসহ নবী করীম ﷺ মদীনা থেকে মক্কার দিকে রওয়ানা করলেন। আট বছর পূর্বে কেবল আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে রাতের অন্ধকারে মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় চলে আসেন। নবী পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে ফাতিমাও এ মহা বিজয় ও গৌরবজনক ফিরে আসা প্রত্যক্ষ করার জন্য এ কাফেলায় শরীক হলেন। আট বছর পূর্বে তিনি একদিন বড় বোন উম্মু কুলছুমের সাথে মক্কা ছেড়ে মদীনায় চলে এসেছিলেন। তাঁর অন্য দুই বোন রুকাইয়া ও যয়নাবও হিজরত করেছিলেন। কিন্তু আজ এ বিজয়ী কাফেলায় তাঁরা নেই। তাঁরা মদীনার মাটিতে ইন্তেকাল করেছেন।

আর কোনদিন মক্কায় ফিরে আসবেন না। অতীত স্মৃতি স্মরণ করতে করতে ফাতিমা কাফেলার সাথে চলছেন। এক সময় কাফেলা "মাররুজ জাহ্রান" এসে পৌছলো এবং শিবির স্থাপন করলো। দিন শেষ হতেই রাতের প্রথম ভাগে মক্কার পৌত্তলিক বাহিনীর নেতা আবূ সুফিয়ান ইবন হারব এসে হাযির হলেন। মক্কাবাসীদের প্রসঙ্গে নবী করীম ﷺ-এর সিদ্ধান্ত জানার জন্য সারা রাত তিনি তাঁর দরজায় অপেক্ষা করলেন। ভোর হতেই তিনি নবী করীম ﷺ-এর সামনে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন।

তারপর সেখান থেকে বের হয়ে সোজা মক্কার পথ ধরেন। মক্কায় পৌছে একটা উঁচু টিলার উপর দণ্ডায়মান হয়ে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা দেন: ওহে কুরাইশ বংশের জনগণ! মুহাম্মাদ এমন এক বিশাল বাহিনী নিয়ে আসছেন যার সাথে তোমরা কখনো পরিচিত নও। যে ব্যক্তি আবূ সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ, যে নিজ ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকবে সে নিরাপদ, আর যে মসজিদে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ।'

ঘোষণা শ্রবণ করে মক্কার অধিবাসীরা নিজ নিজ ঘরে এবং মসজিদুল হারামে প্রবেশ করল। নবী করীম ﷺ যী তুওয়া"-তে বাহনের পিঠে অবস্থান করে সেনাবাহিনীকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেক ভাগের জন্য একজন করে নেতা নিয়োগ করেন এবং কে কোন রাস্তায় মক্কায় প্রবেশ করবে তা নির্ধারণ করেন। একটি ভাগের নেতা ও পতাকাবাহী হন সা'দ ইবন উবাদা আল-আনসারী (রা)।

তিনি আবার আলী (রা)-কে বলেন: পতাকাটি আপনিই নিন। এটি হাতে করে আপনি মক্কায় প্রবেশ করবেন। এর পূর্বে আলী (রা) খায়বারে, বানী কুরায়জার যুদ্ধে নবী করীম ﷺ-এর এবং উহুদ যুদ্ধে মুহাজিরদের পতাকাবাহী ছিলেন।

মক্কা বিজয়ের দিন নবী করীম ﷺ আযাখির' -এর পথে মক্কায় প্রবেশ করে মক্কার উঁচু ভূমিতে নামলেন। উম্মুল মু'মিনীন খাদীজার (রা) কবরের অনতিদূরে তাঁর জন্য তাঁবু টানানো হয়। সঙ্গে কন্যা ফাতিমা আয-যাহ্‌রাও ছিলেন। মক্কা থেকে যেদিন ফাতিমা (রা) মদীনায় গমন করছিলেন সেদিন আল-হুওয়াইরিছ ইবন মুনকিয তাঁকে তাঁর বাহনের পিঠ থেকে ফেলে দিয়ে জীবন বিপন্ন করে ফেলেছিল। সে স্মৃতি তাঁর দীর্ঘদিন পর জন্মভূমিতে ফিরে আসার আনন্দকে ম্লান করে দিচ্ছিল। নবী করীম ﷺ ও সে কথা ভুলেননি।

তিনি বাহিনীকে বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত করে একজন পরিচালক নির্ধারণ করে দেন। কারা কোন রাস্তায় মক্কায় প্রবেশ করবে তাও বলে দেন। তাদেরকে নির্দেশ দেন তারা যেন অহেতুক কোন যুদ্ধে লিপ্ত না হয়। তবে কিছু মানুষ যাদের নাম উচ্চারণ করে বলেন, এরা যদি কা'বার গিলাফের নীচেও আশ্রয় নেয় তাহলেও তাদের হত্যা করবে তাদের মধ্যে আল-হুয়াইরিছ ইবন মুনকিযও ছিল। তাকে হত্যার দায়িত্ব অর্পিত হয় ফাতিমা (রা)-এর স্বামী আলী (রা)-এর ওপর।

নবী করীম ﷺ-এর চাচাতো বোন উম্মু হানী বিনৃত আবী তালিব, মক্কার হুরায়রা ইবন আবী ওয়াহাবের স্ত্রী। তিনি বলেছেন, নবী নবী করীম ﷺ মক্কার উঁচু ভূমিতে আসার পর বনূ মাখযুমের দুই ব্যক্তি আল-হারিছ ইবন হিশাম ও যুহাইর ইবন আবী উমাইয়া ইবন আল-মুগীরা পালিয়ে আমার ঘরে আশ্রয় নেয়। আমার ভাই আলী ইবন আবী তালিব (রা) আমার সাথে দেখা করতে এসে তাদেরকে দেখে ভীষণ রেগে যান। আল্লাহর নামে কসম করে তিনি বলেন : আমি অবশ্যই তাদেরকে হত্যা করবো।

অবস্থা বেগতিক দেখে আমি তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে নবী করীম ﷺ-এর নিকট ছুটে গেলাম। সেখানে পৌঁছে দেখি, তিনি একটি বড় পাত্রে পানি নিয়ে গোসল করছেন এবং ফাতিমা তাঁকে কাপড় দিয়ে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছেন। নবী করীম ﷺ গোসল সেরে আট রাক'আত চাশ্‌তের সালাত আদায় করলেন, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন : উম্মু হানী, কি জন্য এসেছো? আমি তাঁকে আমার বাড়ীর ঘটনাটি বললাম। তিনি বললেন : তুমি যাদেরকে আশ্রয়

দিয়েছো আমিও তাদের আশ্রয় দিলাম। যাদের তুমি নিরাপত্তার ওয়াদা করেছ আমিও তাদের নিরাপত্তা দান করলাম। আলী তাদের হত্যা করবে না।

মক্কা নগরীতে ফাতিমা (রা)-এর প্রথম রাতটি কেমন কেটেছিল সে কথাও জানা যায়। তিনি অত্যন্ত আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন। প্রিয়তমা সম্মানিতা মায়ের কথা, দুই সহোদরা যয়নব ও রুকাইয়ার স্মৃতি তাঁর মানসপটে ভেসে উঠছিল। মক্কার অধিবাসীরা তাঁর পিতার সাথে যে নির্মম আচরণ করেছিল সে কথা, মক্কায় নিজের শৈশব-কৈশোরের বিভিন্ন কথা তাঁর স্মৃতিতে ভেসে উঠছিল।

সারা রাত তিনি দু'চোখের পাতা একসাথে করতে পারেননি। ভোরবেলা মসজিদুল হারাম থেকে বিলালের কণ্ঠে ফজরের আযান ধ্বনিতে হলো। আলী (রা) বিছানা ছেড়ে সালাতে গমনের প্রস্তুতির মধ্যে একবার প্রশ্ন করলেন, ফাতিমা তুমি কি ঘুমাওনি? তিনি একটা গভীর আবেগ মিশ্রিত কণ্ঠে জবাব দিলেন : আমি সম্পূর্ণ জাগ্রত থেকে বিজয়ীবেশে এ ফিরে আসাকে উপভোগ করতে চাই। ঘুমিয়ে পড়লে গোটা বিষয়টিই না জানি স্বপ্ন বলে ভ্রম হয়।

এরপর তিনি সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে যান। সালাত আদায় শেষে একটু ঘুমিয়ে নেন।

ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে সে বাড়ীটিতে যাওয়ার ইচ্ছা করেন যেখানে তাঁর জন্ম হয়েছিল। যে বাড়ীটি ছিল তাঁর নিজের ও স্বামী আলীর শৈশব-কৈশোরের চারণভূমি। কিন্তু সে বাড়ীটি তাঁদের হিজরতের পর আকীল ইবন আবী তালিবের অধিকারে চলে যায়। মক্কা বিজয়ের সময়কালে একদিন উসামা ইবন যায়েদ (রা) নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন: মক্কায় আপনারা কোন বাড়ীতে উঠবেন? জবাবে তিনি বলেন: আকীল কি আমাদের জন্য কোন বাসস্থান বা ঘর বাকী রেখেছে?

এ সফরে তাঁর দু'মাসের অধিক মক্কায় অবস্থান করা হয়নি। অষ্টম হিজরীর রমজান মাসে মক্কায় আসেন এবং একই বছর যুল কা'দা মাসের শেষ দিকে উমরা আদায়ের পর পিতার সাথে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। এ সময়ে তিনি জান্নাতবাসিনী মা খাদীজা (রা)-এর কবরও যিয়ারত করেন।

নবম হিজরীতে সনে নবী করীম ﷺ-এর তৃতীয় কন্যা, উসমানের (রা) স্ত্রী উম্মু কুলছুম (রা) ইন্তেকাল করেন। দশম হিজরীতে নবী করীম ﷺ-এর স্ত্রী মারিয়া আল-কিবতিয়্যার গর্ভজাত সন্তান ইবরাহীমও ইন্তেকাল করেন। এখন নবী করীম

ﷺ-এর সন্তানদের মধ্যে একমাত্র ফাতিমা আয-যাহ্রা ব্যতীত আর কেউ জীবিত থাকলেন না।

পিতা অন্তিম রোগশয্যায় : এর পরে আসল সে মহা মুসীবতের সময়টি। হিজরী ১১ সনের সফর মাসে ফাতিমা (রা)-এর মহান পিতা রোগাক্রান্ত হলেন। নবী পরিবারের এবং অন্য মুসলমানরা ধারণা করলেন যে, এ হয়তো সামান্য রোগ, অচিরেই সেরে উঠবেন। কেউ ধারণা করলেন না যে, এ তাঁর অন্তিম রোগ। পিতা কন্যাকে আহ্বান করলেন। সঙ্গে সঙ্গে পিতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর ঘরের দিকে বেরিয়ে পড়লেন। নবী করীম ﷺ-এর শয্যাপাশে তখন আয়েশা (রা) সহ অন্য স্ত্রীগণও বসা। এ সময় ধীর স্থির ও গম্ভীরভাবে কন্যা ফাতিমাকে অগ্রসর হতে দেখে পিতা তাঁকে স্বাগতম জানালেন এভাবে−

مَرْحَبًا يَا بِنْتِيْ হে আমার মেয়ে! স্বাগতম। তারপর তাঁকে চুমু দিয়ে ডান পাশে বসান এবং কানে কানে বলেন, তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। ফাতিমা কেঁদে ফেলেন। তাঁর সে কান্না থেমে যায় যখন পিতা তাঁর কানে কানে আবার বলেন−

اِنَّكَ اَوَّلُ اَهْلِ بَيْتِيْ لُحُوْقَابِيْ يَافَاطِمَةُ اَلاَتَرْضَيْنَ اَنْ تَكُوْنِيْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هٰذِهِ الْاُمَّةِ ؟

"আমার পরিবারবর্গের মধ্যে তুমি সর্বপ্রথম আমার সাথে মিলিত হবে। ফাতিমা! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, ঈমানদার নারীদের নেত্রী হও? অথবা নবী করীম ﷺ একথা বলেন, তুমি এ উম্মাতের নারীদের নেত্রী হও তাতে কি সন্তুষ্ট নও?"

এ কথা শ্রবণের সাথে সাথে ফাতিমার চেহারায় আনন্দের আভা ফুটে উঠলো। তিনি কান্না থামিয়ে হেসে দিলেন। তাঁর এমন আচরণ দেখে পাশেই বসা আয়েশা (রা) অবাক হলেন। তিনি মন্তব্য করেন−

مَارَاَيْتُ كَالْيَوْمِ فَرْحًا اَقْرَبَ اِلَى حَزْنٍ ـ

"দুঃখের অধিক নিকটবর্তী আনন্দের এমন দৃশ্য আজকের মত আর কখনো দেখিনি।"

পরে এক সুযোগে তিনি ফাতেমাকে জিজ্ঞেস করেন : তোমার পিতা কানে কানে তোমাকে কি বলেছেন? জবাবে তিনি বললেন : আমি নবী করীম ﷺ-এর গোপন কথা প্রকাশ করতে অক্ষম।

مَاذَا عَلٰى مَنْ شَمَّ تُرْبَةَ اَحْمَدَ   اَلَايَشُمَّ مُدَى الزَّمَانِ غَوَالِيَا

صُبَّتْ عَلَىَّ مَصَائِبُ لَوْ اَنَّهَا   صُبَّتْ عَلَى الْاَيَّامِ عُدْنَ لَيَالِيًا ۔

১. 'যে ব্যক্তি আহমাদের কবরের মাটির ঘ্রাণ নেয় গোটা জীবন সে যেন আর কোন সুগন্ধির ঘ্রাণ না নেয়।

২. আমার ওপর যে সকল বিপদ আপতিত হয়েছে যদি তা হতো দিনের ওপর তাহলে তা রাতে পরিণত হতো।'

সাহাবায়ে কিরাম (রা) নবী করীম ﷺ-এর দাফন-কাফন শেষ করে তাকে সান্ত্বনা দানের উদ্দেশ্যে ফাতিমা (রা)-এর নিকট আসেন। তিনি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করে বসেন : আপনারা কি নবী করীমকে দাফন করে এসেছেন? তিনি জবাব দিলেন : হ্যাঁ। তিনি বললেন : নবী করীম ﷺ-কে মাটিতে ঢেকে দিতে আপনাদের অন্তর সায় দিল কেমন করে? তারপর তিনি নবী করীম ﷺ-এর স্মরণে নিম্নের চরণগুলো আবৃত্তি করেন–

اَغْبَرَ اٰفَاقُ السَّمَاءِ وَكُوِّرَتْ   شَمْسُ النَّهَارِ وَاَظْلَمَ الْعَصْرَانُ

فَالْاَرْضُ مِنْ بَعْدِ النَّبِيِّ كَئِيْبَةٌ   اَشْفَارِ عَلَيْهِ كَثِيْرَةَ الرَّجْفَانِ

فَلْيَبْكِهٖ شَرْقُ الْبِلَادِ وَغَرْبُهَا   وَلْتَبْكِهٖ مُضَرٌ وَكُلُّ يَمَانِ ۔

وَلْيَبْكِهٖ الطَّوْدُ الْعَظِيْمُ جُوْدُهٗ   وَالْبَيْتُ ذُو الْاَسْتَارِ وَالْاَرْكَانِ

يَا خَاتَمَ الرُّسُلِ الْمُبَارِكِ ضَوْءُهٗ   صَلّٰى عَلَيْكَ مُنَزِّلُ الْقُرْاٰنِ ۔

১. আকাশের দিগন্ত ধুলিমলিন হয়ে গেছে, মধ্যাহ্ন-সূর্য ঢাকা পড়ে গেছে এবং যুগ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

২. নবী ﷺ-এর পরে ভূমি কেবল বিষণ্ন হয়নি, বরং দুঃখের তীব্রতায় বিদীর্ণ হয়েছে।

৩. তার জন্য কাঁদছে পূর্ব-পশ্চিম, মাতম করছে সমগ্র মুদার ও ইয়ামান গোত্র।

৪. তাঁর জন্য কাঁদছে বড় বড় পাহাড়-পর্বত ও বিশালকায় দালানসমূহ।

৫. হে খাতামুন নাবিয়্যীন, আল্লাহর জ্যোতি আপনার প্রতি বর্ষিত হোক। আল-কুরআনের নাযিলকারী আপনার প্রতি করুণা বর্ষণ করুন।'

অনেকে উপরিউক্ত চরণগুলো ফাতিমা (রা), আর পূর্বোক্ত চরণগুলো আলীর রচিত বলে উল্লেখ করেছেন।

ফাতিমা (রা) পিতার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে এ চরণ দু'টি আবৃত্তি করেন :

إِنَّا فَقَدْنَاكَ فَقْدَ الْأَرْضِ وَابِلَهَا وَغَابَ مُذْغِبْتَ عَنَّا الْوَحْيُ وَالْكِتٰبُ

فَلَيْتَ قَبْلَكَ كَانَ الْمَوْتُ صَادِفَنَا لَمَّا نَعِيْتَ وَحَالَتْ دُوْنَكَ الْكُتُبُ ـ

১. ভূমি ও উট হারানোর মত আমরা হারিয়েছি আপনাকে। আপনার অদৃশ্য হওয়ার পর ওহী ও কিতাব আমাদের থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

২. হায়! আপনার আগে যদি আমাদের মৃত্যু হতো! আপনার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করতে হতো না এবং মাটির ঢিবিও আপনার মাঝে অন্তরায় হতো না।

বিয়ের পরেও ফাতিমা (রা) পিতার সংসারের সকল বিষয়ের খোঁজ-খবর রাখতেন। অধিকাংশ সময় তাঁর সৎ মা'দের ছোটখাট রাগ-বিরাগ ও মান-অভিমানের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতেন। যেমন নবী করীম ﷺ উম্মুল মু'মিনীন আয়েশাকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। একথা সকল সাহাবী সমাজের জানা ছিল। এ কারণে নবী করীম ﷺ যেদিন আয়েশা (রা)-এর ঘরে কাটাতেন সেদিন তারা অধিক পরিমাণে হাদিয়া-তোহফা পাঠাতেন। এতে অন্য স্ত্রীগণ ক্ষুব্ধ হতেন। তাঁরা চাইতেন নবী করীম ﷺ যেন লোকদের নির্দেশ দেন, তিনি যেদিন যেখানে থাকেন মানুষ যেন সেখানেই যা কিছু পাঠাবার, পাঠায়।

কিন্তু সে কথা নবী করীম ﷺ-কে বলার সাহস কারো হতো না। এ জন্য তাঁরা সবাই মিলে তাঁদের মনের কথা নবী করীম ﷺ-এর নিকট পৌঁছে দেওয়ার জন্য নবী করীম ﷺ-এর কলিজার টুকরা ফাতিমা (রা)-কে বেছে নেন। নবী করীম ﷺ ফাতিমা (রা)-এর বক্তব্য শ্রবণ করে বললেন, "মা, আমি যা চাই, তুমি কি তা চাও না? ফাতিমা (রা) পিতার ইচ্ছা বুঝতে পারলেন এবং ফিরে এলেন। তাঁর সৎ মায়েরা আবার তাঁকে পাঠাতে চাইলেন : কিন্তু তিনি রাজি হলেন না।

রণাঙ্গনে : রণাঙ্গনে ফাতিমা (রা)-এর রয়েছে এক উজ্জ্বল ভূমিকা। উহুদ যুদ্ধে নবী করীম ﷺ শরীরে ও মুখে আঘাত পেয়ে আহত হলেন। পবিত্র দেহ থেকে

ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো। কোন কিছুতে যখন রক্ত বন্ধ করা যাচ্ছিল না তখন ফাতিমা (রা) খেজুরের চাটাই আগুনে পুড়িয়ে তার ছাই ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দেন।

এ বিষয়ে ইমাম আল-বায়হাকী বলেন : মুহাজির ও আনসার নারীগণ উহুদের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হলেন। তাঁরা তাঁদের পিঠে করে পানি ও খাবার বহন করে নিয়ে গেলেন। তাঁদের সাথে ফাতিমা বিন্‌ত নবী করীম ﷺ ও বের হন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে তিনি যখন পিতাকে রক্তরঞ্জিত অবস্থায় দেখলেন, তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর চেহারা থেকে রক্ত মুছতে লাগলেন। আর নবী করীম ﷺ-এর মুখ থেকে তখন উচ্চারিত হচ্ছিল :

اِشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰى قَوْمٍ دَمُّوْا وَجْهَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

'আল্লাহর শক্ত ক্রোধ পতিত হয়েছে সে জাতির ওপর যারা আল্লাহর নবী করীম ﷺ-এর চেহারাকে রক্তরঞ্জিত করেছে।'

(আল-বায়হাকী : দালায়িল আন-নুবুওয়াহ্‌-৩/২৮৩)

উহুদে ফাতিমা (রা)-এর ভূমিকার বর্ণনা প্রসঙ্গে মহান সাহাবী সাহ্‌ল ইবন সা'দ বলেছেন : নবী করীম ﷺ আহত হলেন, সামনের দাঁত ভেঙ্গে গেল, মাথায় তরবারি ভাঙ্গা হলো, ফাতিমা বিন্‌ত নবী করীম ﷺ রক্ত পরিষ্কার করতে লাগলেন, আর আলী (রা) ঢালে করে পানি ঢালতে লাগলেন। ফাতিমা (রা) যখন দেখলেন, যতই পানি ঢালা হচ্ছে ততই রক্ত বেশী বের হচ্ছে তখন তিনি একটি চাটাই উঠিয়ে আগুনে পুড়িয়ে ছাই করলেন এবং সে ক্ষতস্থানে লাগালেন। আর তখন রক্তপড়া বন্ধ হয়।

উহুদ যুদ্ধে নবী করীম ﷺ-এর চাচা ও ফাতিমা (রা)-এর দাদা হামজা (রা) শহীদ হন। তিনিই ফাতিমা (রা)-এর বিয়ের সময় ওলীমা অনুষ্ঠান করে মানুষকে আহার করান। ফাতিমা (রা) তাঁর প্রতি দারুণ মুগ্ধ ছিলেন। তিনি আজীবন হামজা (রা)-এর কবর যিয়ারত করতেন এবং তাঁর জন্য কেঁদে কেঁদে আল্লাহর দরবারে দু'আ করতেন।

অন্যান্য যুদ্ধেও ফাতিমা (রা)-এর যোগদানের কথা জানা যায়। যেমন খন্দক ও খায়বার অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। এ খায়বার বিজয়ের পর তথাকার উৎপাদিত গম থেকে তাঁর জন্য নবী করীম ﷺ ৮৫ ওয়াসক নির্ধারণ করে দেন। মক্কা

বিজয়েও তিনি নবী করীম ﷺ-এর সফরসঙ্গী হন। মূতা অভিযানে নবী করীম ﷺ তিন সেনাপতি-যায়িদ ইবন আল-হারিছা, জা'ফর ইবন আবী তালিব ও আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহাকে (রা) প্রেরণ করেন। একের পর এক তাঁরা তিনজনই শহীদ হলেন। এ সংবাদ মদীনায় পৌছলে ফাতিমা (রা) তাঁর প্রিয় চাচা জা'ফরের (রা) শোকে 'ওয়া' আম্মাহ্" বলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। এ সময় নবী করীম ﷺ সেখানে উপস্থিত হন এবং মন্তব্য করেন 'যে কাঁদতে চায় তার জা'ফরের মত মানুষের জন্য কাঁদা উচিত।

ফাতিমা (রা)-এর মর্যাদা : তাঁর মহত্ত্ব, মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য অনেক। রাসূলের পরিবারের মধ্যে আরো অনেক মর্যাদাবান ব্যক্তি আছেন। কিন্তু তাঁদের মাঝে ফাতিমা (রা)-এর অবস্থান এক বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ আসনে। সূরা আল-আহযাবের আয়াতে তাতহীর (পবিত্রকরণের আয়াত) এর নুযূল ফাতিমা (রা)-এর বিশেষ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করে।

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا -

'হে নবী-পরিবার! আল্লাহ্ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদের সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।' (সূরা-৩৩ আহ্যাব : আয়াত-৩৩)

উম্মুল মু'মিনীন 'আয়েশা (রা) বলেন-

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَعَا عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَأَلْقَى عَلَيْهِمْ ثَوْبًا فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ هٰؤُلَاءِ أَهْلَ بَيْتِي فَاذْهَبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا -

আমি নবী করীম ﷺ-কে দেখলাম, তিনি আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইন (রা)-কে আহ্বান করলেন এবং তাদের মাথার উপর একখানা বস্ত্র ফেলে দিলেন। তারপর বললেন : হে আল্লাহ! এরা আমার পরিবারের সদস্য। তাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করে দিন এবং তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করুন!

(মুখতাসার তাফসীর ইবনে কাছীর-৩/৯৪)

আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ আলোচ্য আয়াত নাযিলের পর ছয় মাস পর্যন্ত ফজরের সালাতে যাওয়ার সময় ফাতিমা (রা)-এর ঘরের দরজা অতিক্রম করাকালে বলতেন :

اَلصَّلاَةُ يَااَهْلَ الْبَيْتِ، اَلصَّلاَةُ ـ

সালাত, ওহে নবী-পরিবার! সালাত।'

তারপর তিনি পাঠ করতেন–

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ـ

ইমাম আহমাদ (র) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ আলী ফাতিমা, হাসান ও হুসাইনের (রা) দিকে তাকালেন তারপর বললেন :

(সূরা–৩৩ আহযাব : আয়াত-৩৩)

اَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ، سَلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ ـ

তোমাদের সঙ্গে যে লড়াই করে আমি তাদের জন্য লড়াই, তোমাদের সাথে যে শান্তিও সন্ধি স্থাপন করে আমি তাদের জন্য শান্তি'

(সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-২/১২৩)

এ নবী পরিবার প্রসঙ্গে নবী করীম ﷺ-এর অন্য একটি বাণীতে এসেছে–

لاَيُبْغِضُنَا اَهْلَ الْبَيْتِ اَحَدٌ اِلاَّ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ النَّارَ ـ

'যে কেউ 'আহলে বায়ত' বা নবী-পরিবারের সাথে শত্রুতা করবে আল্লাহ্ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।' (প্রাগুক্ত)

নবম হিজরীতে নাজরানের একটি খ্রীষ্টান প্রতিনিধি দল নবী করীম ﷺ-এর নিকট আসে এবং ঈসা (আ) প্রসঙ্গে তারা অহেতুক বিতর্কে লিপ্ত হয়। তখন আয়াতে 'মুবাহালা' অবতীর্ণ হয়। মুবাহালার অর্থ হলো, যদি সত্য ও মিথ্যার ব্যাপারে দুই পক্ষের মধ্যে বাদানুবাদ হয় এবং যুক্তিতর্কে মীমাংসা না হয়, তাহলে তারা সকলে মিলে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবে, যে পক্ষ এ বিষয়ে মিথ্যাবাদী, সে যেন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এভাবে প্রার্থনা করাকে "মুবাহালা' বলা হয়। এ মুবাহালা

বিতর্ককারীরা একত্রিত হয়ে করতে পারে এবং গুরুত্ব বৃদ্ধি করার জন্য পরিবার-পরিজনকেও একত্রিত করতে পারে। মুবাহালার আয়াতটি হলো–

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ.

'তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর যে কেউ এ প্রসঙ্গে তোমার সাথে তর্ক করে তাকে বল এসো, আমরা ডাকি আমাদের পুত্রগণকে, তোমাদের পুত্রগণকে, আমাদের নারীগণকে, তোমাদের নারীগণকে, আমাদের নিজদেরকে ও তোমাদের নিজেদেরকে, অতঃপর আমরা বিনীত আবেদন করি এবং মিথ্যাবাদীদের ওপর দেই আল্লাহর অভিশাপ।' (সূরা–৩ আলে ইমরান : আয়াত-৬১)

আলোচ্য আয়াত নাযিলের পর নবী করীম ﷺ প্রতিনিধি দলকে মুবাহালার আহ্বান জানান এবং তিনি নিজেও ফাতিমা, আলী, হাসান ও হুসাইনকে (রা) সাথে নিয়ে মুবাহালার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসেন এবং বলেন : اَللّٰهُمَّ هٰؤُلَاءِ أَهْلِيْ. হে আল্লাহ! এ আমার পরিবার- পরিজন। আপনি তাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করে তাদেরকে সম্পূর্নরূপে পবিত্র করুন। এ বাক্যগুলো তিনবার বলার পর উচ্চারণ করেন।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلٰوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

'হে আল্লাহ্ আপনি আপনার দয়া ও অনুগ্রহ মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজনকে দান করুন।' (সহীহ্ মুসলিম : ফাদায়িল আস-সাহাবা; মুসনাদ-৪/১০৭; মুখতাসার তাফসীর ইবনে কাছীর-১/২৮৭-২৮৯)

যেমন আপনি করেছেন ইবরাহীমের পরিবার- পরিজনকে। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত।'

নবী করীম ﷺ একদিন ফাতিমা (রা)-কে বলেন–

إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَرْضٰى لِرِضَاكِ وَيَغْضَبُ لِغَضَبِكِ.

মহান 'আল্লাহ তোমার খুশীতে খুশী হন এবং তোমার অসন্তুষ্টিতে অসন্তুষ্ট হন।'
(তাহযীব আত-তাহযীব-১২/৪৪২; আল-ইসাবা-৪/৩৬৬)

নবী করীম ﷺ যখন কোন যুদ্ধ বা সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন তখন প্রথমে মসজিদে গিয়ে দুই রাক'আত সালাত আদায় করতেন। তারপর ফাতিমার ঘরে প্রবেশ করে তাঁর সাথে সাক্ষাত করে স্ত্রীদের নিকট যেতেন।

একবার ফাতিমা (রা) রোগাক্রান্ত হলে নবী করীম ﷺ দেখতে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন মেয়ে! কেমন আছ?

ফাতিমা বললেন: আমার কষ্ট আছে। সেটা আরো বৃদ্ধি পায় এজন্য যে, আমার খাবার কোন কিছু নেই।

নবী করীম ﷺ বললেন : মেয়ে! তুমি বিশ্বের সকল মহিলার নেত্রী হও এতে কি সন্তুষ্ট নও? ফাতিমা বললেন : বাবা! তাহলে মারইয়াম বিন্ত ইমরানের অবস্থান কোথায়?

জবাবে নবী করীম ﷺ বললেন : তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের মহিলাদের নেত্রী, আর তুমি হবে তোমার সময়ের মহিলাদের নেত্রী।

মহান আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে ইহকাল ও পরকালের একজন নেতার সাথে বিয়ে দিয়েছি।

নবী করীম ﷺ তাকে - سَيِّدَةُ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ

জান্নাতের অধিবাসী মহিলাদের নেত্রী' বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাসে (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন,

سَيِّدَةُ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ مَرْيَمُ ثُمَّ فَاطِمَةُ بِنْتِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ خَدِيْجَةُ ثُمَّ اٰسِيَةُ اِمْرَاَةُ فِرْعَوْنَ ـ

জান্নাতের অধিবাসী মহিলাদের নেত্রী হলেন ধারাবাহিকভাবে মারইয়াম, ফাতিমা বিন্ত মুহাম্মাদ ﷺ খাদীজা ও ফির'আউনের স্ত্রী আছিয়া।' (সাহাবিয়াত-১৪০)

একদা নবী করীম ﷺ মাটিতে চারটি রেখা টানলেন, তারপর মানুষদেরকে বললেন, তোমরা কি জান এটা কি? সকলে বললো : আল্লাহ ও তাঁর নবী ﷺ-ই ভালো জানেন। তিনি বললেন : ফাতিমা বিন্ত মুহাম্মদ, খাদীজা বিনত

খুওয়াইলিদ, মারয়াম বিনত ইমরান ও আছিয়া বিন্ত মুযাহিম (ফির'আউনের স্ত্রী)। জান্নাতের মহিলাদের ওপর তাদের রয়েছে এক বিশেষ মর্যাদা।

ফাতিমা (রা)-এর ব্যক্তিত্বের প্রতি যে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য আরোপ করা হয়েছে তা নবী করীম ﷺ-এর আলোচ্য হাদীছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে–

كَفَاكَ مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ وَخَدِيْجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ وَفَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ وَاٰسِيَةَ امْرَاَةِ فِرْعَوْنَ -

দুনিয়ার মহিলাদের মধ্যে তোমার অনুসরণের জন্য মারইয়াম, খাদীজা, ফাতিমা ও ফির'আউনের স্ত্রী আছিয়া যথেষ্ট। (তিরমিযী; আল-মানাকিব)

নবী করীম ﷺ-এর সবচেয়ে বেশী স্নেহের ও প্রিয় পাত্রী ছিলেন ফাতিমা (রা)। একবার নবী করীমকে ﷺ জিজ্ঞেস করা হলো : হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সবচেয়ে বেশী প্রিয় ব্যক্তিটি কে? বললেন : ফাতিমা। ইমাম আজ-জাহাবী বলেন :

كَانَ اَحَبُّ النِّسَاءِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاطِمَةُ وَمِنَ الرِّجَالِ عَلِىٌّ -

মহিলাদের মধ্যে নবী করীম ﷺ-এর সবচেয়ে বেশী প্রিয় ছিলেন ফাতিমা (রা) এবং পুরুষদের মধ্যে আলী (রা)।

একদা আলী (রা) নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন : ফাতিমা ও আমি এ দুজনের মধ্যে কে আপনার সর্বাধিক প্রিয়। তিনি বললেন : তোমার চেয়ে ফাতিমা আমার নিকট অধিক প্রিয়।

আল্লাহর প্রিয় পাত্রী : ফাতিমা (রা) যে আল্লাহরও প্রিয় পাত্রী ছিলেন কোন কোন অলৌকিক ঘটনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে একবার সামান্য খাবারে আল্লাহ যে বরকত ও সমৃদ্ধি দান করেছিলেন তা উল্লেখ করা যায়। বিভিন্ন বর্ণনায় ঘটনাটি যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তার সারাংশ হলো, একদিন তাঁর একটি প্রতিবেশিনী তাঁকে দুটি রুটি ও এক টুকরা গোশত উপহার হিসেবে প্রেরণ করলো। তিনি সেগুলো একটি বাসনে ঢেলে ঢেকে দিলেন। তারপর নবী করীম ﷺ-কে আহ্বান জন্য ছেলেকে পাঠালেন। নবী করীম ﷺ আসলেন এবং ফাতিমা (রা) তাঁর সামনে থালাটি পেশ করলেন। এরপরের ঘটনা ফাতিমা (রা) বর্ণনা করেছেন এভাবে–

আমি থালাটির ঢাকনা খুলে দেখি সেটি রুটি ও গোশতে ভরপুর। আমি দেখে তো বিস্ময়ে হতবাক! বুঝলাম, এ বরকত আল্লাহর পক্ষ থেকে। আমি আল্লাহর প্রশংসা করলাম এবং তাঁর নবীর ওপর দরূদ পাঠ করলাম। তারপর খাবার ভর্তি বাসনটি নবী করীম ﷺ-এর সামনে পেশ করলাম। তিনি সেটি দেখে আল্লাহর প্রশংসা করে প্রশ্ন করলেন : মেয়ে! এ খাবার কোথা থেকে এসেছে?

বললাম : বাবা! মহান আল্লাহর নিকট থেকে এসেছে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন।

নবী করীম ﷺ বললেন : আমার প্রিয় মেয়ে! সে আল্লাহর প্রশংসা যিনি তোমাকে বনী ইসরাঈলের মহিলাদের নেত্রীর মত করেছেন। আল্লাহ যখন তাঁকে কোন খাদ্য দান করতেন এবং সে প্রসঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হতো, তখন তিনি বলতেন : এ আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বে হিসাব রিযিক দান করেন।

সে খাবার নবী করীম ﷺ আলী ফাতিমা, হাসান, হুসাইন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সকল স্ত্রী ভক্ষণ করেন। তাঁরা সবাই পেট ভরে খান। তারপরও থালার খাবার একই রকম থেকে যায়। ফাতিমা সে খাবার প্রতিবেশীদের মধ্যে বিলিয়ে দেন। আল্লাহ সে খাবারে অনেক বরকত ও কল্যাণ দান করেন।

নবী করীম ﷺ একবার দু'আ করেন, আল্লাহ যেন ফাতিমাকে ক্ষুধার্ত না রাখেন। ফাতিমা বলেন, তারপর থেকে আমি আর কখনো ক্ষুধার্ত হইনি। ঘটনাটি এরকম–

একদিন নবী করীম ﷺ ফাতিমা (র)-এর ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন তিনি যাতায় গম পিষছিলেন। দেহে জড়ানো ছিল উটের পশমের তৈরী পোশাক। মেয়ের এ অবস্থা দেখে পিতা কেঁদে দেন এবং বলেন : ফাতিমা! পরকালের সুখ-সম্ভোগের জন্য দুনিয়ার এ তিক্ততা গিলে ফেল। ফাতিমা উঠে পিতার সামনে এসে দণ্ডায়মান হলেন। পিতা কন্যার দিকে তাকিয়ে দেখলেন, প্রচণ্ড ক্ষুধায় তার চেহারা রক্তশূন্য হয়ে পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গেছে। তিনি বললেন : ফাতিমা! কাছে এসো। ফাতিমা পিতার সামনে এসে দাঁড়ালেন। পিতা একটি হাত মেয়ের কাঁধে রেখে এ দু'আ উচ্চারণ করেন–

اَللّٰهُمَّ مُشْبِعُ الْجَاعَةِ وَرَافِعُ الضَّيْقِ اِرْفَعْ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ ـ

ক্ষুধার্তকে আহার দানকারী ও সংকীর্ণতাকে দূরীভূতকারী হে আল্লাহ! তুমি ফাতিমা বিনত মুহাম্মাদের সংকীর্ণতাকে দূর করে দাও।'

(আ'লাম আন-নিসা'-৪/১২৫)

কথাবার্তা, চালচলন, উঠাবসা প্রতিটি ক্ষেত্রে ফাতিমা (রা) ছিলেন নবী করীম ﷺ-এর প্রতিচ্ছবি। আয়েশা (রা) বলেন–

فَاطِمَةُ تَمْشِىْ مَاتَخَطِّىْ مَشْيَتَهَا مَشْيَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

ফাতিমা (রা) হাঁটতেন। তাঁর হাঁটা নবী করীম ﷺ-এর হাঁটা থেকে একটুও এদিক ওদিক হতো না। সততা ও সত্যবাদিতায় তাঁর কোন জুড়ি ছিল না। আয়েশা (রা) বলতেন–

مَارَاَيْتُ اَحَدًا كَانَ اَصْدَقَ لَهْجَةً مِّنْ فَاطِمَةَ اِلاَّ اَنْ يَّكُوْنَ الَّذِىْ وَلَدَهَا ـ

আমি ফাতিমা (রা)-এর চেয়ে অধিক সত্যভাষী আর কাউকে দেখিনি। তবে তিনি যাঁর কন্যা (নবী ﷺ) তাঁর কথা অবশ্য স্বতন্ত্র।'

(মুসাফাহাহ ও মুয়ানাকা অধ্যায় : মিশকাত)

'আয়েশা (রা) আরো বলেন–

مَارَاَيْتُ اَحَدًا كَانَ اَشْبَهُ كَلاَمًا وَحَدِيْثًا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ فَاطِمَةَ، وَكَانَتْ اِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ اِلَيْهَا، فَقَبَّلَهَا وَرَحَّبَ بِهَا، وَكَذٰلِكَ كَانَتْ هِىَ تَصْنَعُ بِهٖ ـ

'আমি কথাবার্তা ও আলোচনায় নবী করীম ﷺ-এর সাথে ফাতিমা (রা)-এর চেয়ে অধিক মিল আছে এমন কাউকে দেখিনি। ফাতিমা (রা) যখন নবী করীম ﷺ-এর নিকট আসতেন, তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে নিকটে টেনে নিয়ে চুমু দিতেন, স্বাগত জানাতেন। ফাতিমাও পিতার সাথে একই আচরণ করতেন।'

নবী করীম ﷺ যে পরিমাণ ফাতিমা (রা)-কে ভালোবাসতেন, সে পরিমাণ অন্য কোন সন্তানকে ভালোবাসতেন না। তিনি বলেছেন–

فَاطِمَةُ بِضْعَةٌ مِّنِّىْ فَمَنْ اَغْضَبَهَا اَغْضَبَنِىْ -

'ফাতিমা আমার শরীরের একটি অংশ। কেউ তাকে অসন্তুষ্ট করলে আমাকেই অসন্তুষ্ট করবে।'

ইমাম আস-সুহাইলী আলোচ্য হাদীসের ভিত্তিতে বলেছেন, কেউ ফাতিমা (রা)-কে মন্দ কথা বললে কাফির হয়ে যাবে। তিনি তাঁর অসন্তুষ্টি ও নবী করীম ﷺ-এর অসন্তুষ্টি এক করে দেখেছেন। আর কেউ নবী করীম ﷺ-কে ক্রোধান্বিত করলে কাফির হয়ে যাবে।

ইবনুল জাওযী বলেছেন, নবী করীম ﷺ-এর অন্য সকল কন্যাকে ফাতিমা (রা) এবং অন্য সকল স্ত্রীকে আয়েশা (রা)-এর সম্মান ও মর্যাদায় অতিক্রম করে গেছেন।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম ﷺ বলেছেন : একজন ফেরেশতাকে আল্লাহ আমার সাক্ষাতের অনুমতি দেন। তিনি আমাকে এ সুসংবাদ দেন যে, ফাতিমা হবে আমার উম্মাতের সকল মহিলার নেত্রী এবং হাসান ও হুসাইন হবে জান্নাতের অধিবাসীদের নেতা। এ বিষয়ে তিনি আলী (রা)-কে বলেন : ফাতিমা আমার শরীরের একটি অংশ। অতএব তার অসন্তুষ্টি হয় এমন কিছু করবে না।'

পিতার প্রতি ফাতিমা (রা)-এর ভালোবাসা : নবী করীম ﷺ যেমন কন্যা ফাতিমা (রা)-কে গভীরভাবে ভালোবাসতেন তেমনি ফাতিমাও পিতাকে প্রবলভাবে ভালোবাসতেন। পিতা কোন সফর থেকে যখন প্রত্যাবর্তন করতেন তখন সর্বপ্রথম মসজিদে প্রবেশ করে সালাত আদায় করতেন। তারপর কন্য ফাতিমার ঘরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে নিজের ঘরে যেতেন। এটা তাঁর নিয়ম ছিল। একদা নবী করীম ﷺ এক সফর থেকে ফাতিমার ঘরে যান। ফাতিমা (রা) পিতাকে জড়িয়ে ধরে চোখে-মুখে চুমু দেন। তারপর পিতার চেহারার দিকে তাকিয়ে কাঁদতে শুরু করেন।

নবী করীম ﷺ বলেন : কাঁদছো কেন মা? ফাতিমা (রা) বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আপনার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গেছে এবং আপনার পরিধেয় পোশাকও ময়লা, নোংরা হয়েছে। এ দেখেই আমার কান্না পাচ্ছে। নবী করীম ﷺ বললেন : ফাতিমা, কেঁদো না। আল্লাহ তোমার পিতাকে একটি বিষয়ের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন। ইহজগতের শহর ও গ্রামের প্রতিটি ঘরে তিনি তা পৌছে দেবেন। সম্মানের সঙ্গে হোক বা অপমানের সঙ্গে।

নবী করীম ﷺ-এর তিরস্কার ও সতর্ককরণ : নবী করীম ﷺ-এর এক প্রিয়পাত্রী হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়ার সুখ-ঐশ্বর্যের প্রতি সামান্য আগ্রহ দেখলেও নবী করীম ﷺ তাঁকে তিরস্কার করতে কুণ্ঠিত হতেন না। নবী করীম ﷺ পার্থিব ঠাঁটবাট ও চাকচিক্য অপছন্দ করতেন। তিনি নিজে যা পছন্দ করতেন না তা অন্য কারো জন্য পছন্দ করতেন না। একবার স্বামী আলী (রা) একটি সোনার হার ফাতিমা (রা)-কে উপহার দেন। তিনি হারটি গলায় পরে আছেন। এমন সময় নবী করীম ﷺ আসেন এবং হারটি তাঁর চোখে পড়ে। তিনি বলেন, ফাতিমা! তুমি কি চাও যে, লোকেরা বলুক আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কন্যা আগুনের হার গলায় পরে আছে? ফাতিমা পিতার অসন্তুষ্টি বুঝতে পেরে হারটি বিক্রি করে দেন এবং সে অর্থ দিয়ে একটি দাস খরিদ করে মুক্ত করে দেন। একথা নবী করীম ﷺ জানার পর বলেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ نَجّٰى فَاطِمَةَ مِنَ النَّارِ ـ

'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর যিনি ফাতিমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করছে।' (আত-তারগীব ওয়াত তারহীব-১/৫৫৭; মুসনাদ-৫/২৭৮, ২৭৯; নিসা; হাওলার রাসূল-১৪৯)

আরেকটি ঘটনা। নবী করীম ﷺ কোন এক যুদ্ধ থেকে ফিরলেন। অভ্যাস অনুযায়ী তিনি ফাতিমা (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করবেন। ফাতিমা (রা) পিতাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য ঘরের দরজায় পর্দা ঝুলালেন, দুই ছেলে হাসান ও হুসাইন (রা)-এর হাতে একটি করে রূপার চুড়ি পরালেন। ভাবলেন, এতে তাঁদের নানা নবী করীম ﷺ খুশী হবেন। কিন্তু ফল বিপরীত হলো। নবী করীম ﷺ ঘরে প্রবেশ না করে ফিরে গেলেন। বুদ্ধিমতি কন্যা ফাতিমা (রা) বুঝে গেলেন, পিতা কেন ঘরে প্রবেশ না করে ফিরে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পর্দা নামিয়ে ছিঁড়ে ফেলেন এবং দুই ছেলের হাত থেকে চুড়ি খুলে ফেলেন। তাঁরা কাঁদতে কাঁদতে তাঁদের নানার নিকট চলে যায়। তখন নবী করীম ﷺ-এর মুখ থেকে উচ্চারিত হয়, এরা আমার পরিবারের সদস্য। আমি চাইনা পার্থিব সাজ-শোভায় তারা শোভিত হোক।

একবার নবী করীম ﷺ ফাতিমা, 'আলী, হাসান ও হুসাইনকে (রা) বললেন, যাদের সঙ্গে তোমাদের লড়াই, তাদের সাথে আমারও লড়াই, যাদের সঙ্গে তোমাদের শান্তি ও সন্ধি তাদের সঙ্গে আমারও শান্তি ও সন্ধি। অর্থাৎ যাদের

প্রতি তোমরা অখুশী তাদের প্রতি আমিও অখুশী, আর যাদের প্রতি খুশী, তাদের প্রতি আমিও খুশী।

নবী ﷺ অতি আদরের মেয়ে ফাতিমা (রা)-কে সব সময় স্পষ্ট করে বলে দিতেন যে, নবীর ﷺ কন্যা হওয়ার কারণে আখিরাতে নাজাত পাওয়া যাবে না। সেখানে মুক্তির একমাত্র উপায় হবে আমল ও তাকওয়া। একবার তিনি ভাষণে বলেন–

يَامَعْشَرَ قُرَيْشٍ اِشْتَرُوْا اَنْفُسَكُمْ لاَاُغْنِىْ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا، ... يَافَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ سَلِيْنِىْ شِئْتَ مَا مَالِىْ، لاَ اُغْنِىْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا .

হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের নিজ নিজ সত্তাকে খরিদ করে নাও। আল্লাহর নিকট আমি তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারবো না। হে ফাতিমা বিন্‌ত মুহাম্মদ! তুমি আমার সম্পদ থেকে যা ইচ্ছা আমার নিকট চেয়ে নাও। তবে আল্লাহর নিকট তোমার জন্য কিছুই করতে পারবো না। (বুখারী-৬/১৬ (তাফসীর সূরা আশ্ শু'আরা); নিসা' হাওলার রাসূল-১৪৯)

তিনি একথাও বলেন–

يَافَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ اِنْقِذِىْ نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ، فَاِنِّىْ لاَاَمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ ضَرًّا وَّلاَنَفْعًا .

'হে মুহাম্মদ ﷺ-এর কন্যা ফাতিমা তুমি নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। আমি আল্লাহর নিকট তোমার উপকার ও অপকার কিছুই করতে সক্ষম হবো না।'

এক মাখযুমী নারী চুরি করলে তার গোত্রের জনগণ নবী করীম ﷺ-এর প্রীতিভাজন উসামা ইবন যায়েদ (রা)-এর মাধ্যমে সুপারিশ করে শাস্তি মওকুফের চেষ্টা করে। তখন নবী করীম ﷺ বলেন–

وَاَيْمُ اللّٰهِ لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ اِبْنَةَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا .

আল্লাহ তা'আলার কসম! ফাতিমা বিন্‌ত মুহাম্মাদও যদি চুরি করে তাহলে আমি তার হাত কেটে দেব। (বুখারী : আল-হুদূদ; মুসলিম : বাবু কিত'উস সারিক (১৬৮৮)

পিতার উত্তরাধিকার দাবী : নবী করীম ﷺ ইন্তেকাল করলেন। তাঁর উত্তরাধিকারের প্রশ্ন দেখা দিল। ফাতিমা (রা) সোজা খলীফা আবু বকর (রা)-এর নিকট গেলেন এবং তাঁর পিতার উত্তরাধিকার বন্টনের আবেদন জানালেন। আবূ বকর (রা) তাঁকে নবী করীম ﷺ-এর নিম্নোক্ত হাদীসটি শোনান–

لَانُوَرِّثُ مَاتَرَكْنَا صَدَقَةٌ ـ

আমরা যা কিছু রেখে যাই সবই সাদকা হয়।

তার কোন উত্তরাধিকার হয় না। তারপর তিনি বলেন, এরপর আমি তা কিভাবে বন্টন করতে পারি? এ জবাবে ফাতিমা (রা) একটু রুষ্ট হলেন। ফাতিমা (রা) ঘরে ফিরে এসে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। এ রকমও বর্ণিত হয়েছে যে, আবু বকর (রা)-এর জবাবে ফাতিমা (রা) কষ্ট পান এবং আবূ বকর (রা)-এর প্রতি এত অসন্তুষ্ট হন যে, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁর সাথে কোন কথা বলেননি।

কিন্তু ইমাম আশ-শা'বীর (র) একটি বর্ণনায় জানা যায়, ফাতিমা (রা) যখন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন তখন আলী (রা) তার নিকট গিয়ে বলেন, আবূ বকর (রা) তোমার সাথে দেখা করতে চাচ্ছেন। ফাতিমা (রা) আলী (রা)-কে প্রশ্ন করলেন : আমি তাঁকে দেখা করার অনুমতি দেই তাতে কি তোমার সম্মতি আছে? আলী (রা) বললেন : হ্যাঁ। ফাতিমা (রা) অনুমতি দিলেন। আবূ বকর (রা) ঘরে প্রবেশ করে কুশল বিনিময়ের পর বললেন আল্লাহর কসম! আমি আমার অর্থ-বিত্ত, পরিবার-পরিজন গোত্র সবকিছু পরিত্যাগ করতে পারি আল্লাহ, আল্লাহর নবী করীম ﷺ এবং আপনারা আহ্‌লি বাইত তথা নবী পরিবারের সদস্যদের সন্তুষ্টির বিনিময়ে। আবূ বকর (রা)-এর এমন কথায় ফাতিমা (রা)-এর মনের সব কষ্ট দূর হয়ে যায়। তিনি খুশী হয়ে যান।

ইমাম আজ-জাহাবী (র) এ তথ্য উল্লেখ করার পর মন্তব্য করেছেন, স্বামীর ঘরে অন্য পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হলে স্বামীর অনুমতি নিতে হয়- এ সুন্নাত প্রসঙ্গে ফাতিমা (রা) জানতেন। এ ঘটনা দ্বারা সে কথা জানা যায়। এখানে উল্লেখিত এ বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় ফাতিমা (রা)-এর অন্তরে পূর্বে কিছু অসন্তুষ্টি থাকলেও পরে তা দূর হয়ে যায়। তাছাড়া একটি বর্ণনায় একথাও জানা যায় যে, ফাতিমা (রা) মৃত্যুর আগে আবূ বকর (রা)-এর স্ত্রীকে অসীয়াত করে যান, মৃত্যুর পরে তিনি যেন তাঁকে গোসল দেন।

মৃত্যু : ফাতিমা (রা)-এর অপর তিন বোন যেমন তাঁদের যৌবনে ইন্তেকাল করেন তেমনি তিনিও নবী করীমﷺ-এর ইন্তিকালের আট মাস, মতান্তরে সত্তর দিন পর দুনিয়া ত্যাগ করেন। অনেকে নবী করীমﷺ-এর ইন্তেকালের দুই অথবা চার মাস অথবা আট মাস পরে তাঁর ইন্তেকালের কথাও বলেছেন। তবে এটাই সঠিক যে, নবী করীমﷺ-এর ইন্তেকালের ছয় মাস পরে হিজরী ১১ সনের ৩ রমাদান মঙ্গলবার রাতে ২৯ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। নবী করীমﷺ-এর ভবিষ্যদ্বাণী– আমার পরিবারের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম আমার সঙ্গে মিলিত হবে'- সত্যে পরিণত হয়।

নবী করীমﷺ-এর নবুওয়্যাত লাভের পাঁচ বছর পূর্বে যদি ফাতিমা (রা)-এর জন্ম ধরা হয় তাহলে মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ২৯ বছর হয়। আর কেউ কেউ বলেছেন যে, নবুওয়্যাত লাভের এক বছর পর ফাতিমা (রা)-এর জন্ম হয়, এ হিসেবে তাঁর বয়স ২৯ বছর হবে না। যেহেতু অধিকাংশ সীরাত বিশেষজ্ঞ মনে করেন, মৃত্যুকালে ফাতিমা (রা)-এর বয়স হয়েছিল ২৯ বছর, তাই তাঁর জন্মও হবে নবুওয়্যাতের পাঁচ বছর আগে।

আল-ওয়াকিদী বলেছেন, হিজরী ১১ সনের ৩ রমজান ফাতিমা (রা)-এর ইনতিকাল হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) জানাযার সালাত পড়ান। আলী ফাদল ও আব্বাস (রা) কবরে নেমে দাফন কাজ সম্পন্ন করেন। তাঁর অসীয়াত মত রাতের বেলা তাঁর দাফন করা হয়। এ কথাও বর্ণিত হয়েছে যে, 'আলী, মতান্তরে আবূ বকর (রা) জানাযার সালাত পড়ান। স্বামী আলী (রা) ও আসমা' বিন্‌ত উমাইস (রা) তাঁকে গোসল দেন।

ফাতিমা (রা)-এর শেষ রোগ প্রসঙ্গে ইতিহাসে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। মারাত্মক কোন রোগে আক্রান্ত হয়ে কিছুদিন শয্যাশায়ী ছিলেন, এমন কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। উম্মু সালমা (রা) বলেন, ফাতিমা (রা)-এর ইন্তেকালের সময় আলী (রা) পাশে ছিলেন না। তিনি আমাকে ডেকে পাঠান এবং বলেন, আমার গোসলের জন্য পানির ব্যবস্থা করুন। নতুন পরিচ্ছন্ন বস্ত্র বের করুন, পরবো। আমি পানির ব্যবস্থা করে নতুন কাপড় বের করে দিলাম। তিনি ভালভাবে গোসল করে নতুন পোশাক পরেন। তারপর বলেন, আমার বিছানা করে দিন, বিশ্রাম করবো। আমি বিছানা করে দিলাম। তিনি কিবলামুখী হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। তারপর আমাকে বলেন, আমার বিদায়ের সময় অতি নিকটে। আমি গোসল করেছি। দ্বিতীয়বার গোসল দেওয়ার দরকার নেই। আমার পরিধেয় পোশাকও খোলার দরকার নেই। এরপর তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

আলী (রা) ঘরে প্রবেশের পর আমি তাঁকে এসব ঘটনা বললাম। তিনি ফাতিমা (রা)-এর সে গোসলকেই যথেষ্ট মনে করলেন এবং তাঁকে সে অবস্থায় দাফন করেন। এ রকম বর্ণনা উম্মু রাফি থেকেও পাওয়া যায়। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, আলী (রা) মতান্তরে আবূ বকর (রা)-এর স্ত্রী তাঁকে গোসল দেন।

জানাযায় খুব কম মানুষ অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। তার কারণ, রাতে তাঁর ইন্তেকাল হয় এবং আলী (রা) ফাতিমার অসীয়াত অনুযায়ী রাতেই তাঁকে দাফন করেন। তাবাকাতের বিভিন্ন স্থানে এ রকম বর্ণনা এসেছে। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলে করীম ﷺ-এর পরে ফাতিমা (রা) ছয় মাস জীবিত ছিলেন এবং রাতের বেলা তাঁকে দাফন করা হয়।

লজ্জা-শরম ছিল ফাতিমা (রা)-এর স্বভাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হলে তিনি আসমা বিন্‌ত উমাইস (রা)-কে বলেন, মহিলাদের লাশ উন্মুক্ত অবস্থায় যে গোরস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়, এ আমার পছন্দ নয়। এতে বেপর্দা হয়। নারী- পুরুষের লাশের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য করা হয় না। পুরুষরা যে মহিলাদের লাশ খোলা অবস্থায় বহন করেন, এ তাদের একটা মন্দ কাজ। আসমা বিন্‌ত উমাইস (রা) বললেন, আল্লাহর রাসূলের মেয়ে! আমি হাবশায় একটি ভালো পদ্ধতি দেখেছি। আপনি অনুমতি দিলে দেখাতে পারি। একথা বলে তিনি খেজুরের কিছু ডাল আনলেন এবং তার উপর একটি কাপড় টানিয়ে পর্দার মত করলেন। এ পদ্ধতি ফাতিমা (রা)-এর বেশ পছন্দ হলো এবং তিনি বেশ আনন্দিত হলেন।

পর্দার মধ্য দিয়ে ফাতিমা (রা)-এর লাশ কবর পর্যন্ত নেওয়া হয়। ইসলামের সর্বপ্রথম এভাবে তাঁর লাশটিই নেওয়া হয়। তাঁর পরে উম্মু মু'মিনীন যয়নব বিন্‌ত জাহাশের লাশটিও এভাবে কবর পর্যন্ত বহন করা হয়।

আলী (রা) স্ত্রী ফাতিমা (রা)-এর দাফন-কাফনের কাজ সমাধা করে যখন ঘরে ফিরলেন তখন তাঁকে বেশ বিষণ্ন ও বেদনাকাতর দেখাচ্ছিল। শোকাতুর অবস্থায় বার বার নীচের চরণগুলো আবৃত্তি করছিলেন–

أَرَى عِلَلَ الدُّنْيَا عَلَى كَثِيْرَةٍ وَصَاحِبُهَا حَتَّى الْمَمَاتِ عَلِيْلٌ

لِكُلِّ اِجْتِمَاعٍ مِنْ خَلِيْلَيْنِ فِرْقَةٌ وَكُلُّ الَّذِيْ دُوْنَ الْفِرَاقِ قَلِيْلٌ

وَاِنَّ افْتِقَادِيْ فَاطِمَةَ بَعْدَ اَحْمَدَ دَلِيْلٌ عَلَى اَنْ لاَيَدُوْمَ خَلِيْلٌ ـ

১. আমি দেখতে পাচ্ছি আমার মধ্যে ইহলৌকিক রোগ-ব্যাধি প্রচুর পরিমাণে বাসা বেঁধেছে। আর একজন দুনিয়াবাসী মৃত্যু পর্যন্ত রোগগ্রস্তই থাকে।

২. ভালোবাসার মানুষের প্রতিটি মিলনের পরে বিচ্ছেদ আছে। বিচ্ছেদ ব্যতীত মিলনের যে সময়টুকু তা অতি সামান্যই।

৩. আহমদ ﷺ-এর পরে ফাতিমা (রা)-এর বিচ্ছেদ একথাই প্রমাণ করে যে, কোন বন্ধুই চিরকাল অবস্থান করে না। (আ'লাম আন-নিসা'-৪/১৩১)

আলী (রা) প্রতিদিন ফাতিমা (রা)-এর কবরে গমন করতেন, স্মৃতিচারণ করে কাঁদতেন এবং নিম্নের এ চরণ দু'টি আবৃত্তি করতেন–

مَالِىْ مَرَرْتُ عَلَى الْقُبُوْرِ مُسَلِّمًا   قَبْرَ الْحَبِيْبِ فَلَمْ يَرُدَّ جَوَالِىْ

يَاقَبْرَ مَالَكَ لَاتُجِيْبُ مُنَادِيًا   اَمْلَكَ بَعْدِىْ خَلَّةَ الْاَحْبَابِ .

১. "আমার একি দশা হয়েছে যে, আমি কবরের উপর সালাম করার জন্য আগমন করি; কিন্তু প্রিয়ার কবর আমার প্রশ্নের কোন জবাব দেয় না।"

২. "হে কবর! তোমার কী হয়েছে যে, তোমার আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দাও না? তুমি কি তোমার প্রিয়জনের ভালোবাসায় বিরক্ত হয়ে উঠেছো?"

দাফনের স্থান : আল-ওয়াকিদী বলেন, আমি আবদুর রহমান ইবন আবিল মাওলাকে বললাম, অধিকাংশ মানুষ ধারণা করে থাকে ফাতিমা (রা)-এর কবর বাকী' গোরস্থানে। আপনি কী মনে করেন? তিনি জবাব দিলেন : বাকী'তে তাঁকে দাফন করা হয়নি। তাঁকে আকীলের বাড়ীর এক কোনে দাফন করা হয়েছে। তাঁর কবর ও রাস্তার মধ্যে পার্থক্য ছিল প্রায় সাত হাত।

হাদীস বর্ণনা : ফাতিমা (রা) নবী করীম ﷺ-এর আঠারোটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে একটি হাদীস মুত্তাফাকুন আলাইহি অর্থাৎ আয়েশা (রা)-এর সনদে বুখারী ও মুসলিম সংকলন করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ, ইবন মাজাহ্ ও তিরমিযী তাঁদের নিজ নিজ সংকলনে ফাতিমা (রা)-এর বর্ণিত হাদীছ সংকলন করেছেন। আর ফাতিমা (রা) থেকে যাঁরা হাদীস বর্ণনা করেছেন তারা হলেন : তাঁর কলিজার টুকরা দুই ছেলে–হাসান, হুসাইন, স্বামী আলী ইবন আবী তালিব,উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা, সালমা উম্মু রাফি' আনাস ইবন মালিক, উম্মু সালামা, ফাতিমা বিন্‌ত আল-হুসাইন (রা) ও আরো অনেকে। ইবনুল জাওযী বলেন, একমাত্র ফাতিমা (রা) ব্যতীত নবী করীম ﷺ-এর অন্য কোনো কন্যা নবী করীম ﷺ-এর কোন হাদীস বর্ণনা করেছেন বলে আমরা জানি না।

১১. সুমাইয়া (রা)

صَبْرًا اٰلَ يَاسِرٍ اِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةَ .

হে ইয়াসিরের পরিবারবর্গ ধৈর্যধারণ কর। তোমাদের জন্য জান্নাত নির্ধারিত রয়েছে।

ইসলামের প্রথম শহীদ সুমাইয়া (রা) একজন মহিলা সাহাবী। তাঁর বংশ পরিচয় তেমন একটা পাওয়া যায় না। ইবনে সা'দ তাঁর পিতার নাম 'খুব্বাত' বলেছেন, (তাবাকাত-৮/২৬৮) কিন্তু বালাজুরী বলেছেন, 'খায়্যাত'। (আনসাবুল আশরাফ-১/১৫৭) প্রখ্যাত শহীদ সাহাবী আম্মার ইবন ইয়াসির (রা)-এর মা এবং মক্কার আবু হুজাইফা ইবন আল-মুগীরা আল-মাখযুমীর দাসী ছিলেন সুমাইয়া (রা)। (তাবাকাত-৮/২৬৮)

আল-ওয়াকিদীসহ একদল বংশবিদ্যা বিশারদ বলেছেন, আম্মার (রা)-এর পিতা ইয়াসির বনু মাখযুমের আযাদকৃত দাস। ইয়াসির তাঁর দু'ভাই-আল হারিছ ও মালিককে সংগে নিয়ে তাঁদের নিখোঁজ চতুর্থ ভাইয়ের সন্ধানে মক্কায় আসেন। আল-হারিছ ও মালিক স্বদেশ ইয়ামনে ফিরে গেলেন, কিন্তু ইয়াসির মক্কায় থেকে যান। মক্কার রীতি অনুযায়ী তিনি আবু হুজাইফা ইবন আল-মুগীরা আল-মাখযুমীর সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে থাকেন।

আবু হুজাইফা তাঁর দাসী সুমাইয়া (রা)-কে ইয়াসিরের সাথে বিয়ে দেন এবং তাঁদের ছেলে আম্মারের জন্ম হয়। আবু হুজাইফা আম্মারকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে নিজের সাথে রেখে দেন। যতদিন আবু হুজাইফা জীবিত ছিলেন আম্মার তাঁর সাথেই ছিলেন। (সীরাত ইবন হিশাম-১/২৬১; টীকা-৪; আনসাবুল আশরাফ-১/১৫৭) উল্লেখ্য যে, এই আবু হুজাইফা ছিলেন নরাধম আবু জাহলের চাচা। (আল-আ'লাম-৩/১৪০)

সুমাইয়া (রা) যখন বার্ধক্যে দুর্বল হয়ে পড়েছেন তখন মক্কায় ইসলামী দাওয়াতের সূচনা হয়। তিনি প্রথম ভাগেই স্বামী ইয়াসির ও ছেলে আম্মারসহ

গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেন। কিছুদিন পর প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন। মক্কায় তাঁদের এমন কোন আত্মীয়-বন্ধু ছিল না যারা তাঁদেরকে কুরাইশদের নিষ্ঠুরতার হাত থেকে বাঁচাতে পারতো। আর তাই তারা তাঁদের উপর মাত্রা ছাড়া নির্যাতন চালাতে কোন রকম ত্রুটি করেনি।

ইমাম আহমাদ ও ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন : সর্বপ্রথম যাঁরা ইসলামের ঘোষণা দান করেন, তাঁরা সাত জন। রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবু বকর, আম্মার, আম্মারের মা সুমাইয়া, সুহাইব বিলাল ও আল-মিকদাদ (রা)। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর চাচার দ্বারা এবং আবু বকরকে তাঁর গোত্রের দ্বারা নিরাপত্তা বিধান করেন। আর অন্যদেরকে পৌত্তলিকরা লোহার বর্ম পরিয়ে প্রচণ্ড রোদে দাঁড় করিয়ে রাখতো। (আল-বিদায়-৩/২৮; কানয আল উম্মাল-৭/১৪; আল-ইসাবা-৪/৩৩৫; হায়াতুস সাহাবা-১/১২৮৮)

জাবির (রা) বলেন, একদিন মুশরিকরা যখন আম্মার ও তাঁর পরিবারবর্গকে শাস্তি দিচ্ছিল তখন সেই পথ দিয়ে রাসূল্লাহ ﷺ কোথাও যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁদের অবস্থা দেখে বলেন;

হে ইয়াসিরের পরিবার-পরিজন! তোমাদের জন্য সুসংবাদ। তোমাদের জন্য রয়েছে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি। (হায়াতুস সাহাবা-১/২৯১)

ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনায় একথাও এসেছে যে, সুমাইয়া (রা)-কে আবু জাহল বল্লম মেরে হত্যা করে। অত্যাচার, উৎপীড়নে ইয়াসিরের মৃত্যু হয় এবং আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াসিরকে তীরবিদ্ধ করা হয়, তাতেই তিনি মারা যান।

উছমান (রা) বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে 'আল-বাতহা' উপত্যকায় হাঁটছিলাম। তখন দেখতে পেলাম, আম্মার ও তাঁর পিতা-মাতার উপর উত্তপ্ত রোদে নির্যাতন চালানো হচ্ছে। আম্মারের পিতা রাসূল ﷺ কে দেখে বলে ওঠেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! কালচক্র এ রকম? রাসূল ﷺ বললেন, হে ইয়াসিরের পরিবার-পরিজন! ধৈর্য ধর। হে আল্লাহ! ইয়াসিরের পরিবারবর্গকে ক্ষমা করুন। (তাবাকাত-৩/১৭৭; কানয আল-উম্মাল-৭/৭২)

সারাদিন এভাবে শাস্তি ভোগ করার পর সন্ধ্যায় তাঁরা মুক্তি পেতেন। শাস্তি ভোগ করে সুমাইয়া প্রতিদিনের মত একদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরলেন। পাষণ্ড আবু জাহল তাঁকে অশালীন ভাষায় গালি দিতে থাকে। এক পর্যায়ে তার পশুত্বের মাত্রা সীমা

ছাড়িয়ে যায়। সে সুমাইয়া (রা)-এর দিকে বর্শা ছুড়ে মারে এবং সেটি তাঁর যৌনাঙ্গে গিয়ে বিদ্ধ হয় এবং তাতেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন। (তাবাকাত-৮/২৬৫; আল-বিদায়া-৩/৫৯; সিফাতুস সাফওয়া-২/৩২) ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন।

মায়ের এমন অসহায় অবস্থায় মৃত্যুবরণ ছেলে আম্মারের দুঃখের অন্ত ছিল না। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! এখন তো জুলুম-অত্যাচারের মাত্রা ছাড়া রূপ নিয়েছে। রাসূল ﷺ তাকে ধৈর্য ধরার উপদেশ দিলেন। তারপর বললেন: ' হে আল্লাহ, তুমি ইয়াসিরের পরিবারের কাউকে জাহান্নামের আগুনের শাস্তি দিওনা। (সীরাত ইবন হিশাম-১/৩১৯; টীকা-৫)

সুমাইয়া (রা) শাহাদাতের ঘটনাটি হিজরতের পূর্বের। এ কারণে তিনি হলেন ইসলামের প্রথম শহীদ। মুজাহিদ (রহ) বলেন : ইসলামের প্রথম শহীদ হলেন আম্মারের মা সুমাইয়া।

(তাবাকাত-৮/২৬৫; আল-বিদায়া-৩/৫৯; সিফাতুস সাফওয়া-২/৩২)

বদর যুদ্ধে নরাধম আবু জাহল নিহত হলে রাসূল ﷺ আম্মারকে বললেন : আল্লাহ তোমাদের মায়ের ঘাতককে হত্যা করেছেন। (আল-ইসাবা-৪/৩৩৫) সুমাইয়া (রা)-এর শাহাদাতের ঘটনাটি ঘটে ৬১৫ খ্রীস্টাব্দে।

(আল-আ'লাম-৩/১৪০)

১২. উম্মুল মু'মিনীন সাওদা বিনতে যাম'আ (রা)

রাসূল ﷺ-এর পবিত্র স্ত্রীগণ হলেন মু'মিনদের জন্য মাতৃতুল্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন–

اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗٓ اُمَّهَاتُهُمْ ـ

নবী মু'মিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ আর তার স্ত্রীগণ তাদের মাতা (সূরা–৩৩ আহযাব : আয়াত-৬)

তাই মু'মিনদের মাতা ও রাসূল ﷺ-এর পবিত্র স্ত্রীগণ জান্নাতে যাবে এটাই স্বাভাবিক। যাদের সাথে রাসূল ﷺ-এর দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত হয়েছে তারা জাহান্নামে যাবে আর রাসূল ﷺ জান্নাতে থাকবেন এটা অসম্ভব কথাও বটে। তাই রাসূল ﷺ-এর সাথে তাদের সম্পর্কের কারণেই তারা জান্নাতে যাবেন, এটাই দলিল তাদের জান্নাতে যাওয়ার।

সাওদা (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দ্বিতীয় স্ত্রী, উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের নেতৃস্থানীয়া। খাদীজার ইন্তেকালের পর তিনিই সর্বপ্রথম রাসূল ﷺ-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং সংসারের হাল ধরেন। রাসুল ﷺ-এর দু:খময় জীবনকে সুখময় করে তোলেন।

নাম ও বংশ পরিচয় : তাঁর নাম সাওদা। পিতার নাম যাম'আ। তাঁর বংশ তালিকা এরূপ– সাওদা বিনতে যাম'আ বিন কায়েস বিন আবদে শামস বিন আবদ বিন নাসর বিন মালেক বিন হাসল বিন আমের ইবনে লুয়াই। তাঁর মাতার নাম ছিল শামুস বিনতে কায়েস বিন যায়েদ বিন আমর বিন লবিদ বিন আমের বিন গণম বিন আদী বিন আন নাজ্জার। মাতা শামুস ছিলেন মদীনার নাজ্জার বংশের মেয়ে।

জন্ম : সাওদা ৫৬৫/৫৭০ খ্রিস্টাব্দের দিকে আরবের বিখ্যাত কুরাইশ বংশের একটি প্রসিদ্ধ শাখা লুওয়াই বিন আমের গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রথম বিবাহ : সাওদা (রা)-এর প্রথম বিয়ে হয় তাঁর পিতার চাচাত ভাই সাকরান বিন আমরের সাথে। যিনি সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান ছিলেন।

ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত : ইসলামের সূচনা লগ্নেই তারা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে আত্মীয়-স্বজনের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও ইসলাম কবুল করেন। শুধু তাই নয়, তাদের নিকটাত্মীয়দের জুলুম-অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তাঁরা রাসূল ﷺ-এর পরামর্শ অনুযায়ী আবিসিনিয়া হিজরত করেন। এ আবিসিনিয়াতেই তাদের একমাত্র সন্তান আবদুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে আবদুর রহমান হালুলার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।

প্রথম স্বামীর ইন্তেকাল : সাকরান দম্পতি আবিসিনিয়া থেকে মক্কায় ফেরার কিছুদিন পরই সাকরান ইন্তেকাল করেন। মক্কায় তাকে সমাহিত করা হয়।

রাসূল ﷺ-এর সাথে বিবাহের স্বপ্ন : সাকরানের মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগে সাওদা (রা) স্বপ্নে দেখেন, 'নবী ﷺ আগমন করে তাঁর কাঁধে কদম (পা) মুবারক স্থাপন করেছেন।' তিনি স্বামী সাকরান (রা)-কে স্বপ্ন খুলে বললে তিনি বলেন, 'তুমি সত্যই এ স্বপ্ন দেখে থাকলে আল্লাহর শপথ, আমি মারা যাবো এবং নবীজী তোমাকে বিয়ে করবেন।' সাওদা (রা) পুনরায় স্বপ্ন দেখেন যে, 'তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে হেলান দিয়ে বসে আছেন, আকাশের চাঁদ ছুটে এসে তাঁর মাথায় পড়ছে।' এ স্বপ্ন সম্পর্কেও সাকরানকে জানালে তিনি বলেন, 'আমি খুব সহসা মৃত্যুবরণ করব এবং আমার পরে তুমি বিয়ে করবে।' সাকরান (রা) সে দিনই অসুস্থ হন এবং কয়েকদিনের মধ্যেই ইন্তেকাল করেন।

স্বামী সাকরানের মৃত্যুর পর শিশুপুত্র আবদুর রহমানকে নিয়ে সাওদা (রা) অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় দিন যাপন করতে থাকেন। মুসলমান হওয়ার কারণে আত্মীয়-স্বজনরাও তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। এ সময়ে একান্ত অনন্যোপায় হয়ে তিনি শিশুপুত্রসহ রাসূল ﷺ-এর এক দূর-সম্পর্কীয় খালা খাওলার বাড়িতে আশ্রয় নেন। খাওলার অবস্থাও অস্বচ্ছল ছিল। তবুও ধৈর্য, সংযম ও পবিত্রতার মূর্ত প্রতীক সাওদা অভাব-অনটনের মধ্যে দিয়েই আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের চেষ্টা করে যেতে লাগলেন।

চিন্তিত রাসূল ﷺ : পৃষ্ঠপোষক চাচা আবূ তালিবের মৃত্যু সর্বোপরি খাদীজার মৃত্যুতে রাসূল ﷺ খুবই মনকষ্টের মধ্য দিয়ে দিন যাপন করছিলেন। মা হারা মাসুম বাচ্চা উম্মু কুলছুম ও ফাতিমাকে নিয়েই বেশি চিন্তার মধ্যে ছিলেন তিনি। এমন কি ঘরের যাবতীয় কাজকর্ম রাসূল ﷺ-কে নিজ হাতেই সম্পাদন করতে

হচ্ছিল। যা একজন পুরুষ মানুষের জন্য ছিল সত্যিই কষ্টসাধ্য। প্রকৃতপক্ষে সংসারে এ অব্যবস্থাপূর্ণ শোচনীয় পরিস্থিতিতে সন্তানদের লালন-পালনের জন্য রাসূল ﷺ-এর একজন জীবন সাথীর জরুরী প্রয়োজন ছিল। মূলত খাদীজাবিহীন নবীর সংসার জীবন অনেকটা মাঝিবিহীন নৌকার মত বেশামাল অবস্থায় পৌঁছেছিল।

সাওদার বিবাহের ব্যবস্থাপনা : রাসূল ﷺ-এর সংসারের এ দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে একদিন তাঁর খালা উসমান বিন মাযউন-এর স্ত্রী খাওলা বিনতে হাকীম নবীগৃহে এসে দেখেন যে– রাসূল ﷺ নিজ হাতে থালা-বাসন পরিষ্কার করছেন। তখন তিনি রাসূল ﷺ-কে উঠিয়ে দিয়ে নিজে সেগুলো পরিষ্কার করেন এবং বিনীতভাবে রাসূল ﷺ-কে বললেন, 'হে মুহাম্মদ, খাদীজার ইনতিকালে তোমাকে অত্যন্ত বিষণ্ন দেখছি।' বললেন, 'ঠিক! ব্যাপার তো তাই।' তখন খাওলা বললেন, 'হে মুহাম্মদ! বর্তমানে তোমার সংসারে একজন পরিচর্যাকারীণীর প্রয়োজন।

সুতরাং তুমি যদি অনুমতি প্রদান কর তাহলে সাওদা বিনতে যাম'আর সাথে তোমার বিয়ে দিতে পারি। সাওদা খুবই নিরীহ, অসহায় ও খুবই ভাল। তাঁর স্বভাব-চরিত্র ও সহিষ্ণুতার যে পরিচয় আমি পেয়েছি, এতে তাঁর মত একজন রমণী তোমার গৃহে আসলে তোমার কষ্ট অনেকাংশে লাঘব হবে। সাওদা তোমার সংসারকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।' নবী করীম ﷺ এ প্রস্তাবে রাজি হলেন এবং ঐ দিনই খাওলা সাওদাকে সুসংবাদ শুনান। সাওদা তা কবুল করলে খাওলা সাওদার নিকট বিয়ের প্রস্তাব পেশ করলেন। সাওদার মা খ্রিস্টান ছিলেন তবুও তিনি বললেন, 'কুরাইশ বংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষের সঙ্গে আমার মেয়ে বিয়ে দিতে আমি রাজি আছি।'

রাসূল ﷺ-এর সাথে সাওদার বিয়ে : সাওদা ও তাঁর পিতা বিয়েতে রাজি হওয়ায় রাসূল ﷺ নিজে সাওদার পিতার বাড়িতে উপস্থিত হলেন। চারশত দিরহাম মোহরানা ধার্য করে সাওদার পিতা নিজে খুতবা প্রদান করে বিয়ে পড়ান। কিন্তু সাওদার ভাই আবদুল্লাহ এ বিয়ের খবর জানার পর প্রচণ্ড অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন, এমন কি নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে মাথা ও কপালে ধূলাবালি মাখিয়ে বলেছিলেন, 'হায় কি সর্বনাশ হলোরে? পরে যখন তিনি ইসলাম কবুল করেন তখন তার এ জঘন্য উক্তির জন্য সব সময় আফসোস করতেন।

বিয়ের পর পরই সাওদা রাসূলﷺ-এর সংসারে চলে আসেন এবং বাচ্চাদের লালন-পালনসহ গৃহের সব দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নেন। ফলে রাসূলﷺ যে অসহনীয় যন্ত্রণার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন তা থেকে পরিত্রাণ লাভ করেন এবং ইসলাম প্রচারে মনোনিবেশ করেন।

রাসূলﷺ ও সাওদার যখন বিয়ে হয় তখন রাসূলﷺ-এর বয়স ৫০ বছর আর সাওদা (রা)-এর বয়স ৫০/৫৫ বছর। হিযরতের প্রায় তিন বছর পূর্বে সাওদা মহানবীﷺ-এর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। নবুওয়্যাতের দশম বছর রামাদান মাস হতে শুরু করে একাদশ হিজরীর রবিউল আওয়াল পর্যন্ত আনুমানিক সাড়ে বার বছর পর্যন্ত তিনি নবী করীমﷺ-এর পবিত্র সাহচর্য লাভ করেন। জীবন-সঙ্গিনী হিসেবে নবুওয়্যাতের দশম বছরের রামাদান হতে ১ম হিজরীর শাওয়াল পর্যন্ত তিনি এককভাবে নবী পরিবারের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন।

অত:পর ক্রমান্বয়ে মহানবীﷺ-এর অপরাপর জীবন-সঙ্গিনীগণ আগমন করতে থাকেন এবং সাওদা (রা)-এর দায়িত্বও হ্রাস পেতে থাকে। হিজরতের ১ম/২য় বছর রাসূলﷺ আয়েশা (রা)-কে বিয়ে করেন। এ সময় আয়েশা (রা)-এর বয়স ছিল ৬/৭/৮/৯ বছর। আয়েশা (রা) বিয়ের ৩ অথবা ৪ বছর পর রাসূলﷺ-এর সংসারে আসেন। অর্থাৎ রাসূলﷺ-এর সাথে তার বাসর হয়েছিল ৯/১০/১১/১২/১৩ বছরের সময়। এ অসম বয়সের বিয়ের ব্যাপারে অর্থাৎ বৃদ্ধা ও শিশুকে বিয়ে করার ব্যাপারে ইসলাম বিরোধী ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ সমালোচনামুখর হওয়ার চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু রাসূলﷺ ছিলেন মানবতার বন্ধু। ইচ্ছে করলে তিনি খাদীজার মৃত্যুর পরও আরবের সেরা সুন্দরী যুবতীদের যে কাউকে বিয়ে করতে পারতেন; কিন্তু তিনি তা করেন নি। তিনি সম্পূর্ণ বৃদ্ধা, বিধবা ও মোটা একজন মহিলাকে বিয়ে করলেন। কারণ সাওদা ছিলেন একজন অসহায় বিধবা। ইসলাম গ্রহণের কারণে তাঁর আত্মীয়-স্বজন তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। রাসূলﷺ এ সহায়হীন মুসলিম মহিলার কল্যাণের চিন্তা করেই তাঁকে বিয়ে করেছিলেন। অপরদিকে তাঁর শিশু কন্যা উম্মু কুলছুম ও ফাতিমা'র কথা চিন্তা করেও তিনি বৃদ্ধা সাওদাকে ঘরে তুলে নেন।

কিশোরী আয়েশাকে রাসূলﷺ-এর বিয়ে করার ব্যাপারে কথা হচ্ছে– জাহেলী যুগে আরবে প্রচলিত ছিল আরবরা কথিত ভাইয়ের মেয়ের সঙ্গে কোনো বিয়ের

সম্পর্ক করতো না। রাসূল ﷺ ও আয়েশা (রা)-এর বিয়ে সে কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত হানলো। তাছাড়া এ বিয়েটা হয়েছিল মূলত আল্লাহরই নির্দেশে।

আকৃতি : সাওদা (রা) ছিলেন দীর্ঘাঙ্গী ও সুন্দরী। তাঁর দৈহিক গঠন ছিল চমৎকার। তবে তিনি একটু মোটা ধরনের ছিলেন, যে কারণে দ্রুত চলাফেরা করতে কষ্ট হত। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমতি ও উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্না।

পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়া : তিনি বিদায় হজ্জের সময় মুজদালিফা থেকে রওয়ানা হওয়ার নির্দিষ্ট সময়ের আগেই রওয়ানা হতে চেয়েছিলেন কিন্তু মহানবী ﷺ তা অনুমোদন করেন নি। শেষ পর্যন্ত রাসূল ﷺ-এর সাথেই তাঁকে রওয়ানা হতে হয়। একদিন প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার জন্য ভোররাতে খোলা মাঠের দিকে (তখনো পর্দার আয়াত নাযিল হয়নি) সাওদা গমন করেন। ফেরার পথে ওমর (রা) তাকে চিনে ফেলেন। ওমর (রা) তাঁকে তখন বলেন, 'আমি তোমাকে চিনে ফেলেছি।' বিষয়টি সাওদা (রা) ও ওমর (রা) কেউই পছন্দ করেন নি। যে কারণে বিষয়টি নিয়ে তাঁরা রাসূল ﷺ-এর সাথে আলাদা আলাদাভাবে আলোচনা করেন। এর পর পরই পর্দার আয়াত নাযিল হয়।

وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ـ

অর্থ: আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না। তোমরা সালাত কায়েম করবে ও যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থাকবে। হে নবী-পরিবার! আল্লাহ তো কেবল চাহেন তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে। [সূরা–৩৩ আহযাব : আয়াত-৩৩]

রাসূলের নির্দেশ পালন : রাসূল ﷺ বিদায় হজ্জের পর তার পবিত্র স্ত্রীদেরকে বলেন, 'অতঃপর আর ঘরের বাইরে যাবে না।' আবূ হুরাইরা (রা) থেকে জানা যায় নবী ﷺ-এর ওফাতের পরও অন্যান্য স্ত্রীরা হজ্জ করেন। কিন্তু সাওদা বিনতে যাম'আ ও যয়নব বিনতে জাহাশ এ নির্দেশটি এমন কঠোরভাবে মেনে চলেন যে আর ঘরের বাইরে যাননি। তিনি বলতেন, 'আমি হজ্জ করেছি, ওমরাহ করেছি। এখন আল্লাহর নির্দেশ মত ঘরে বসে কাটাবো।'

রাসূলকে খাদীজার মত আশ্রয় দান : সাওদা (রা) যখন রাসূল-এর ঘরণী হয়ে আসেন তখন তাঁর ওপর শত্রুদের পক্ষ থেকে নানা ধরনের অত্যাচার-নির্যাতন নেমে এসেছিল। সাওদা স্বামীর-এর দুঃখ-কষ্ট ও মর্মযাতনার বিষয় উপলব্ধি করে সর্বদা তাঁর কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করতেন। খাদীজার মতই সাওদা তাঁর বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে স্বামীর সংকটকালের মোকাবিলা করেছেন। নিঃসন্দেহে সাওদা (রা) এসব ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠস্থানীয়া ছিলেন।

সৎ সন্তানকে মায়ের মত সোহাগদান : সাওদা (রা) নবী নন্দিনী উম্মু কুলছুম ও ফাতিমাকে এমনভাবে লালন-পালন করেন যে, তাঁরা কোন দিনই তাদের মায়ের অভাব অনুভব করেন নি। তিনি কুলছুম ও ফাতেমাকে খুবই আদর করতেন।

জীবনচরিত : স্বল্প ভাষিণী, মধুর আচরণকারিণী, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্না পবিত্র প্রাণা নারী ছিলেন সাওদা (রা)। অতিথিপরায়ণতা ও দানশীলতার জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

একবার ওমর (রা) উপহারস্বরূপ একটি থলে ভর্তি দিরহাম সাওদা (রা)-এর নিকট পাঠালেন। সাওদা (রা) থলে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'এর ভিতরে কি আছে?' বলা হল, 'দিরহাম।' এ কথা শুনে সাওদা (রা) বললেন, 'খেজুরের থলেতে কি দিরহাম শোভা পায়?' এ বলে তিনি সমস্ত দিরহাম গরীব মিসকীনের মধ্যে বিলি করে দিলেন।

সাওদা (রা) ছিলেন বেশ রসিক মহিলা। মাঝে মাঝে তিনি এমন এমন রসিকতাপূর্ণ কথা বলতেন যে, রাসূল ও হেসে ফেলতেন। একবার তিনি রাসূল-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'কাল রাতে আমি আপনার সাথে সালাত পড়ছিলাম। আপনি রুকুতে এত দেরী করছিলেন যে, আমার সন্দেহ হয়েছিল নাক ফেটে রক্ত ঝরবে। এ কারণে আমি আমার নাক অনেকক্ষণ টিপে ধরেছিলাম।' রাসূল এ কথা শুনে মুচকি হাসলেন।

সাওদা (রা) সে উদার মহিলা যিনি সপত্নী আয়েশার জন্য ছাড় দিতে গিয়ে রাসূল-এর খেদমতে বলেছিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য যে রাত আপনার সান্নিধ্যে থাকা বরাদ্দ আছে, সে রাতটুকু আমি আয়েশাকে দান করলাম। সে কুমারী, আল্লাহ আপনার সান্নিধ্য ও সাহচর্য দ্বারা তাকে অধিক উপকৃত করুন, এটাই আমার কামনা।' রাসূল ও শুনে অত্যন্ত খুশি হয়ে বললেন, 'সাওদা! প্রকৃতই তুমি অনন্যা। প্রথম বা দ্বিতীয় বা তৃতীয় বা চতুর্থ হিজরী সনে আয়েশা (রা) স্বামী গৃহে আসলে সাওদা (রা) তাঁকে অত্যন্ত আপন

করে নেন। গার্হ্যস্থ জীবনের অধিকাংশ বিষয়ে সাওদা (রা) ছিলেন আয়েশা (রা)-এর বান্ধবী।

তিনি আয়েশা (রা)-কে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। রাসূল ﷺ-এর ঘরে আসার পর সাওদা (রা) নিজেই আয়েশার সকল সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করেন। এ জন্যই আয়েশা (রা) তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, 'আমি কেবল একজন মহিলার কথাই জানি, যার অন্তরে হিংসার ছোঁয়া মোটেই পড়েনি। তিনি হলেন সাওদা। কতইনা ভাল হতো যদি আমার অন্তর তার দেহে স্থান লাভ করত।'

কতখানি উদার ও মহৎ হৃদয়ের মানুষ হলে এটা সম্ভব? সম্ভবত সাওদা (রা) বলেই তা সম্ভব হয়েছিল।

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ (رضى) وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمِ سَوْدَةَ ـ

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। সওদা বিনতে যাম'আ (রা) তাঁর কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাত যাপনের পালা আয়েশা (রা)-কে দিয়ে দেন। সুতরাং রাসূল ﷺ আয়েশা (রা)-এর জন্য (দু'দিন বরাদ্দ করেন), একদিন তার নিজের অন্যদিন সাওদার (রা)। (বুখারী)

রাসূল ﷺ-এর ঔরসে সাওদা (রা)-এর গর্ভে কোন সন্তান জন্ম লাভ করেনি। প্রথম স্বামী সাকরাণের ঔরসে আবদুর রহমান নামে একজন পুত্র সন্তান ছিলেন। যাঁর কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

হাদীস শাস্ত্র শিক্ষা ও সম্প্রসারণে তাঁর অবদান

হাদীস শিক্ষা ও সম্প্রসারণে সাওদা (রা) অনন্য অবদান রেখেছেন। তিনি সর্বমোট ৫টি হাদীস বর্ণনা করেন। এর মধ্যে বুখারী শরীফে একটি হাদীস উল্লেখ আছে। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, ইয়াহইয়া বিন আবদুর রহমান বিন আস, আদ বিন জাররার মত বিখ্যাত সাহাবীরা তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। বুখারী শরীফে বর্ণিত তাঁর হাদীসটি হল–

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضى) عَنْ سَوْدَةَ (رضى) زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ : مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا ثُمَّ مَازَلْنَا نَنْبَذُ فِيْهِ حَتّٰى صَارَ شَنًّا ـ

ইবন আব্বাস (রা) উম্মুল মু'মিনীন সাওদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আমাদের একটি বকরী মারা গেলে আমরা উহার চামড়া পরিশোধন

(দাবাগাত) করলাম। এরপর আমরা তাতে পানি ঢেলে খেজুর রাখতে লাগলাম। এমনকি তা একটি বিশেষ চর্ম থলেতে পরিণত হলো।

এ ছাড়া তাঁর থেকে বর্ণিত অন্য হাদীসের মধ্যে রয়েছে-তিনি বলেন : জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, আমার পিতা অতি বৃদ্ধ, হজ্জ করার শক্তি তাঁর নেই। নবী করীম ﷺ বললেন : তোমার পিতার ওপর যদি ঋণ থাকে, আর তা যদি তুমি আদায় করে দাও, তবে কি তা তোমার থেকে গ্রহণ করা হবে? সে বলল : হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহ অধিক দয়ালু, তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ কর।

সাওদা বিনত যাম'আ (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললাম, আবু যাম'আ তাঁর এক দাসীর সন্তান (উম্মু ওয়ালাদ) রেখে মারা গিয়েছে। ভূমিষ্ঠ সন্তান আমাদের ধারণাকৃত লোকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। অতঃপর নবী করীম ﷺ তাকে বললেন : তুমি তার থেকে পর্দা কর। সে তোমার ভাই এর থেকে নয়। আর তার উত্তরাধিকার থাকবে।

ওফাত : রাসূল ﷺ-এর ওফাতের পর প্রায় এগার বছর জীবিত ছিলেন এবং ইসলামের প্রচার ও প্রসারে আপন ভূমিকা পালন করেন। ৭৫ বছর বয়সে সাওদা (রা) ইন্তেকাল করেন। মদীনার জান্নাতুল বাকী নামক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর মৃত্যু সন নিয়ে মতভেদ আছে। ওয়াকিদীর মতে আমির মু'আবিয়ার শাসনামলে ৫৪ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। আর ইবনে হাজারের মতে ৫৫ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। ইমাম বুখারী (র) বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ওমর (রা)-এর খেলাফতের সময় ২২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

১৩. উম্মুল মু'মিনীন
যয়নব বিনতে খুযাইমা (রা)

রাসূল ﷺ-এর পবিত্র স্ত্রীগণ হলেন মু'মিনদের জন্য মাতৃতুল্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন–

اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗٓ اُمَّهٰتُهُمْ ۔

নবী মু'মিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ আর তার স্ত্রীগণ তাদের মাতা (সূরা–৩৩ আহযাব : আয়াত-৬)

তাই মু'মিনদের মাতা ও রাসূল ﷺ-এর পবিত্র স্ত্রীগণ জান্নাতে যাবে এটাই স্বাভাবিক। যাদের সাথে রাসূল ﷺ-এর দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত হয়েছে তারা জাহান্নামে যাবে আর রাসূল ﷺ জান্নাতে থাকবেন এটা অসম্ভব কথাও বটে। তাই রাসূল ﷺ-এর সাথে তাদের সম্পর্কের কারণেই তারা জান্নাতে যাবেন, এটাই দলিল তাদের জান্নাতে যাওয়ার।

নাম ও বংশ : নাম তাঁর যয়নব। ডাকনাম اُمُّ الْمَسَاكِيْنِ বা গরীব দুঃখীর মা। পিতার নাম খুজাইমা ইবনুল হারেস এবং মাতার নাম মানদাব বিনতে আউফ। তাঁর নসবনামা এ রকম-যয়নব বিনতে খুযাইমা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে আবদে মান্নাফ ইবনে হেলাল ইবনে আমের ইবনে সা'আসা'আ।

জন্ম : তিনি নবুওয়্যাতের ছাব্বিশ বছর আগে বনু বকর ইবনে হাওয়াযেনে হেলালীয়া গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিবাহ : তুফায়েল ইবনুল হারীছের সাথে তাঁর প্রথম বিয়ে হয়। প্রথম স্বামীর সাথে তাঁর বনিবনা হয়নি। এ জন্য প্রথম স্বামী তাকে তালাক দিলে আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের সাথে বিয়ে হয়। এ আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের সাথে তিনি একই সময়ে ইসলাম কবুল করেন। জাহাশ ছিলেন প্রখ্যাত সাহাবীদের একজন। তিনি বলেছেন আমি ওহুদ যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যাবো এবং প্রতিপক্ষ আমার ঠোঁট, নাক ও কান কেটে ফেলবে এবং আমি এ

অবস্থায় আল্লাহর সাথে মিলিত হবো। তখন আমাকে আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করবে, হে আবদুল্লাহ। তোমার ঠোঁট, নাক ও কান কাটা কেন, আমি আরজ করবো, হে আল্লাহ! তোমার এবং তোমার রাসূল ﷺ-এর জন্য।'

তাঁর দু'আ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কবুল করেন। তিনি অত্যন্ত বীরত্বের সাথে লড়ে যাচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে শত্রুর তরবারীর আঘাতে তাঁর তরবারি দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। তখন রাসূল ﷺ তাঁর হাতে একটি ডাল তুলে দেন। তিনি ডালটিকেই তরবারী হিসেবে ব্যবহার করতে থাকেন এবং এক সময় শাহাদাত বরণ করেন। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল মুশরিকরা তাঁর ঠোঁট, নাক এবং কান কেটে ফেলেছে। যেমন তিনি আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করেছিলেন।

যয়নবসহ আরো বহু বিধবা : আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা) শাহাদাত বরণ করলে বিধবা যয়নব (রা) খুবই অসহায় হয়ে পড়েন। আসলে ওহুদ যুদ্ধে ৭০ জন সাহাবী শহীদ হওয়ার ফলে ইসলামের সেই প্রথম যুগেই বিধবাদের একটি লম্বা কাফেলা দাঁড়িয়ে যায়। যাঁরা ছিলেন একান্তই অসহায়। কারণ মুসলমান হওয়ার কারণে তাঁদের আত্মীয়-স্বজনরা তাঁদেরকে একটু আশ্রয় পর্যন্তও দিতে রাজি ছিল না। এমতাবস্থায় রাসূল ﷺ এ অসহায় মুসলমান বিধবা মহিলাদেরকে বিয়ে করার জন্য সাহাবীদেরকে উৎসাহ দিতে থাকেন। নিজেও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসেন।

রাসূলের সাথে বিবাহ : যয়নব (রা) ছিলেন ওহুদ যুদ্ধের ফলে যাঁরা বিধবা হয়েছিলেন তাদের অন্যতম। তিনি বিধবা হওয়ার পর আত্মীয়-স্বজনের দ্বারে দ্বারে মাথা ঠুকেছেন একটু আশ্রয়ের জন্য কিন্তু তারা তাঁকে পাত্তা দেয়নি। শেষ পর্যন্ত রাসূল ﷺ তাকে সমাজে পুন:প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা ফিরিয়ে দেয়ার জন্য বিয়ে করেন। এক বর্ণনায় জানা যায়, 'অসহায়া যয়নব নিজেকে বিনা মোহরে রাসূল ﷺ-এর কাছে পেশ করেন। তবে অন্য বর্ণনা মতে রাসূল ﷺ ও তাঁর বিয়ের মোহরানা ধার্য হয়েছিল চার শত দিরহাম। হিজরী তৃতীয় সনে রাসূল ﷺ ও যয়নব (রা)-এর মধ্যে এ বিয়ে সম্পন্ন হয়। এ সময়ে যয়নব (রা)-এর বয়স ছিল ৪১ বছর এবং রাসূল ﷺ-এর বয়স ছিল ৫৫ বছর।

চরিত্র : যয়নব (রা) ছিলেন জন্মগতভাবেই প্রশস্ত হৃদয় ও উদার প্রকৃতির মানুষ। তিনি ছোটবেলা থেকেই ভূখা, নাঙা ও গরীব-দুঃখীদের বন্ধু ছিলেন। তিনি ধনাঢ্য পিতার সন্তান হওয়া সত্ত্বেও গরীবদের দুঃখ সইতে পারতেন না। এমন বহু ঘটনা আছে যে, তিনি খেতে বসেছেন– এমন সময় ক্ষুধার্ত ভিক্ষুক এসে খাবার

চেয়েছে, ব্যাস! তিনি নিজের খাবারটাই দিয়ে দিয়েছেন। এ জন্য ইসলাম গ্রহণের আগে সে বাল্যকালেই তিনি (أُمُّ الْمَسَاكِيْنِ) উম্মুল মাসাকীন বা মিসকীনদের মা নামে আরবে পরিচিতা হয়ে ওঠেন।

সাধারণ জনগণের পক্ষ থেকে এ ধরনের খেতাব নিঃসন্দেহে অত্যন্ত বড় ব্যাপার। জানা যায় উম্মাহাতুল মু'মিনীনগণ কোন এক সময় রাসূল ﷺ-এর নিকট জানতে চান, 'হে আল্লাহ্র রাসূল। আমাদের মধ্যে সকলের আগে কে পরলোক গমন করবেন।'

রাসূল ﷺ আল্লাহ্র হুকুম অনুযায়ী উত্তর দিলেন, أَسْرَعُكُنَّ لُحُوْقًا بِيْ أَطْوَلُكُنَّ يَدًا . 'তোমাদের মধ্যে যার হাত সর্বাপেক্ষা বড় সে সকলের আগে মৃত্যুবরণ করবে।' সকলেই ভাবলেন মাপের দিক দিয়ে সওদা (রা)-এর হাত তুলনামূলকভাবে যেহেতু বড় সেহেতু সম্ভবত তিনি সবার আগে ইন্তেকাল করবেন। কিন্তু সবার আগে যখন যয়নব (রা) ইন্তেকাল করলেন তখন সবাই বুঝলেন রাসূল ﷺ কী বুঝাতে চেয়েছিলেন। আসলে রাসূল ﷺ যয়নব (রা)-এর দান-খয়রাতের হাতকে বড় বলেছিলেন।

ওফাত : যয়নব (রা) রাসূল ﷺ-এর সাথে বিয়ের মাত্র তিন মাস পরেই ইন্তেকাল করেন। তিনি রাসূল ﷺ-এর উপস্থিতিতেই ইন্তেকাল করেন। তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ। উম্মাহাতুল মু'মীনীনদের মধ্যে এ ভাগ্য আর কারো হয়নি। যদিও খাদীজা (রা)ও রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশায় ইন্তেকাল করেন। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, খাদীজা (রা) যখন ইন্তেকাল করেন তখন জানাযার সালাতের হুকুম হয়নি।

মৃত্যুকালে এ সৌভাগ্যবতী যয়নব (রা)-এর বয়স হয়েছিল মাত্র ৪১ বছর। এত কম বয়সেও রাসূল ﷺ-এর কোন স্ত্রী ইন্তেকাল করেন নি। তাঁকে মদীনার বিখ্যাত কবরস্থান জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।

১৪. উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামা (রা)

রাসূলﷺ-এর পবিত্র স্ত্রীগণ হলেন মু'মিনদের জন্য মাতৃতুল্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন–

اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗٓ اُمَّهٰتُهُمْ -

নবী মু'মিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ আর তার স্ত্রীগণ তাদের মাতা (সূরা–৩৩ আহযাব : আয়াত-৬)

তাই মু'মিনদের মাতা ও রাসূলﷺ-এর পবিত্র স্ত্রীগণ জান্নাতে যাবে এটাই স্বাভাবিক। যাদের সাথে রাসূলﷺ-এর দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত হয়েছে তারা জাহান্নামে যাবে আর রাসূলﷺ জান্নাতে থাকবেন এটা অসম্ভব কথাও বটে। তাই রাসূলﷺ-এর সাথে তাদের সম্পর্কের কারণেই তারা জান্নাতে যাবেন, এটাই দলিল তাদের জান্নাতে যাওয়ার।

নাম ও পরিচয় : রাসূলﷺ-এর ষষ্ঠ স্ত্রী ছিলেন উম্মু সালামা (রা)। তাঁর মূল নাম ছিল হিন্দ। ডাক নাম উম্মু সালামা। এ নামেই তিনি পরিচিত হয়ে আছেন। পিতার আসল নাম সুহাইল, ডাক নাম আবূ উমাইয়া। ইনি কুরাইশ বংশের মাখজুম গোত্রের লোক। মায়ের নাম আতিকা। পিতার দিক থেকে তাঁর বংশ তালিকা ছিল- হিন্দ বিনতে আবূ উমাইয়া সুহাইল ইবনে মুগীরা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে মাখজুম। আর মায়ের দিক থেকে হিন্দ বিনতে আতিকা বিনতে আমের ইবনে রাবীয়াহ ইবনে মালেক কেনানা।

সামাজিক মর্যাদা : উম্মু সালামা (রা)-এর পিতা-মাতা উভয় দিক থেকেই তৎকালীন আরবের খুবই মর্যাদাসম্পন্ন বংশের লোক ছিলেন। তাঁর পিতা আবূ উমাইয়া ছিলেন আরবের একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। তিনি এতটাই উদার, দানশীল এবং হৃদয় খোলা মানুষ ছিলেন যে, 'যাদুর রাকিব' উপাধিতে ভূষিত হন। মাঝে মধ্যে যখন সফরে যাওয়ার প্রয়োজন হত তখন আবূ উমাইয়া পুরো কাফেলার ব্যয়ভার নিজেই বহন করতেন। এজন্যই তাঁর উপাধি দেয়া হয় زَادُ الرَّكِبِ 'যাদুর রাকিব' বা মুসাফিরের পাথেয়।

প্রথম বিবাহ : উম্মু সালামা (রা)-এর প্রথম বিয়ে হয় তাঁরই চাচাত ভাই আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল আসাদের সাথে। তিনি রাসূল ﷺ-এর দুধ ভাই ছিলেন। মূল নাম আবদুল্লাহ হলেও পরবর্তীতে তিনি আবূ সালামা নামেই পরিচিতি লাভ করেন।

ইসলাম গ্রহণ ও হিযরত : ইসলামের একান্ত প্রাথমিক অবস্থায়, যখন ইসলাম কবুল করা মানে বিপদের পাহাড়কে নিজের মাথায় তুলে নেয়ার মত অবস্থা ঠিক এ বিপদ সঙ্কুল অবস্থায় উম্মু সালামা এবং তাঁর স্বামী পরিবার পরিজনের তীব্র বিরোধিতার মুখে ইসলাম কবুল করেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের ওপর নেমে আসে নানা অত্যাচার-নির্যাতন। শেষ পর্যন্ত মক্কায় টিকতে না পেরে তাঁরা অন্যান্য মুসলমানদের সাথে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে আবিসিনিয়া হিজরত করেন। এখানেই তাঁদের প্রথম সন্তান সালামা জন্মগ্রহণ করেন। এ পুত্র সালামার নামেই স্বামী আবূ সালামা এবং স্ত্রী উম্মু সালামা নামে খ্যাতি লাভ করেন।

জানা যায়, আবিসিনিয়ার আবহাওয়া সালামা পরিবারের স্বাস্থ্যের অনুকূলে ছিল না। যে কারণে তাঁরা বাধ্য হয়ে মক্কায় ফিরে আসেন। পরবর্তীতে রাসূল ﷺ-এর নির্দেশে মদীনায় হিজরত করেন।

হিজরতের করুণ চিত্র : এখানে উল্লেখ্য যে, উম্মু সালামা (রা) মদীনায় হিজরতকারী প্রথম মহিলা। কিন্তু মদীনায় হিজরতের অভিজ্ঞতা ছিল খুবই তিক্ত ও দুঃখজনক। ঐতিহাসিক ইবনে আসীর সে ঘটনাটি উম্মু সালামার জবানীতেই পেশ করেছেন। তিনি বলেন, 'আবূ সালামা যখন মদীনা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তখন তাঁর কাছে একটি মাত্র উট ছিল। তিনি আমাকে এবং আমার পুত্র সালামাকে তার পিঠে সওয়ার করান। তিনি নিজে উটের লাগাম ধরে রওয়ানা করেন। বনু মুগীরা ছিল আমার সমগোত্রীয়।

এ গোত্রের লোকেরা আমাদেরকে দেখে ফেলে এবং আবূ সালামাকে বাধা দিয়ে বলে যে, আমরা আমাদের কন্যাকে এত খারাপ অবস্থায় যেতে দেবো না। তারা আবূ সালামার হাত থেকে লাগাম ছিনিয়ে নেয় এবং আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলে যায়। ইতোমধ্যে আবূ সালামার বংশের লোক বনু আবদুল আসাদ এসে পৌঁছে। তারা পুত্র সালামাকে ছিনিয়ে নেয় এবং বনু মুগীরাকে জানিয়ে দেয় যে, তোমরা তোমাদের কন্যাকে স্বামীর সাথে যেতে না দিলে আমরাও আমাদের শিশুকে তোমাদের কন্যার সাথে কিছুতেই যেতে দেবো না।

এখন আমি, আমার স্বামী এবং পুত্র সন্তান তিনজনই একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। শোকে-দুঃখে আমার অবস্থা বেগতিক। যেহেতু হিজরতের হুকুম হয়েছিলো, তাই আবূ সালামা মদীনায় চলে যান। আমি একা রয়ে যাই। প্রতিদিন ভোরে ঘর থেকে বের হতাম এবং একটা পাহাড়ে বসে বসে সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্রন্দন করতাম। প্রায় এক বছর আমাকে এ অবস্থায় কাটাতে হয়।

একদিন বনু মুগীরার এক ব্যক্তি, যিনি ছিলেন আমার বন্ধু, আমার এ অস্থিরতা দেখে দয়া পরবশ হয়ে তার বংশের লোকদেরকে একত্রিত করে বললেন, আপনারা এ অসহায়কে কেন ছেড়ে দিচ্ছেন না? একে তো আপনারা স্বামী এবং সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছেন। তার এ কথাগুলো বেশ কাজ করেছে। শেষ পর্যন্ত তাদের মনে দয়ার উদ্রেক হয়। তারা আমাকে অনুমতি দিয়ে বলে যে, তোমার ইচ্ছে হলে স্বামীর কাছে যেতে পারো।

এটা শুনে বনু আবদুল আসাদের লোকেরাও আমার কাছে সন্তান ফেরত দেয়। এবার উটের পিঠে হাওদা বেঁধে পুত্র সালামাকে বুকে নিয়ে সওয়ার হই। আমি ছিলাম সম্পূর্ণ একা। এ অবস্থায় কোবায় পৌঁছি। সেখানে ওসমান ইবনে তালহা ইবনে আবূ তালহার সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমার অবস্থা জানতে পেরে জিজ্ঞেস করেন, তোমার সাথে কেউ আছে? আমি বললাম, না, আমি একা।

আর আমার এ শিশু সন্তান। তিনি আমার উটের লাগাম ধরে টেনে নিয়ে যান। আল্লাহ্ সাক্ষী, তালহার চেয়ে ভাল লোক আরবে আমি পাইনি। মনযিল এলে আমার অবতরণ দরকার হলে তিনি গাছের আড়ালে চলে যেতেন। রওয়ানা করার সময় হলে তিনি উট নিয়ে আসতেন। আমি ভালোভাবে বসলে তিনি উটের লাগাম ধরে আগে আগে গমন করতেন। গোটা পথ এভাবে কাটে। মদীনা পৌঁছে বনু আমের ইবনে আওফ-এর জনপদ কোবা অতিক্রমকালে ওসমান ইবনে আবূ তালহা আমাকে জানান যে, তোমার স্বামী এ গ্রামে আছেন। আবূ সালামা এখানে অবস্থান করছেন।

তাঁর উপর নির্যাতন : আমরা যদি ইসলাম প্রচারের প্রথম দিকে নজর দেই তাহলে দেখবো হিজরতকালীন সময়ে আবূ সালামার গোত্রের ওপর যে অত্যাচার-নির্যাতন হয়েছে, যে কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে অন্যদের বেলায় তেমন হয়নি। উম্মু সালামা নিজেই বলেন, ‘ইসলামের জন্য আবূ সালামার গোত্রকে যে কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে, তা আহলে বাইতের আর কাউকে সইতে হয়েছে বলে আমার জানা নেই।’

উম্মু সালামা এমনই মর্যাদাবান পিতার সন্তান ছিলেন যে, যখন হিজরতকালে তিনি মদীনার কোবা পল্লীতে পৌছান তখন তাঁর পরিচয় জানতে পেরে কেউই তা বিশ্বাস করতে চায়নি। কারণ ঐ জাহেলী যুগেও কুরাইশ বংশের আবূ উমাইয়ার মত সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলারা এমনি একা বেড়াতেন না। কিন্তু উম্মু সালামার ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি ইসলামের হুকুম আহকাম সর্বোপরি আল্লাহ্র নির্দেশকে নিজের জীবনের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। এর কিছুদিন পর হজ্জ করার জন্য কিছু লোক যখন মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় তখন উম্মু সালামা তাঁর পরিবারের কাছে একটা চিঠি পাঠান। এবার সবাই বিশ্বাস করে যে, সত্যিই তিনি কুরাইশ বংশের আবূ উমাইয়ার সন্তান।

স্বামীর সাথে স্বাক্ষাত ও উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ : আল্লাহ্র মেহেরবাণীতে স্বামীর সাথে সাক্ষাৎ হয়। আবূ সালামার সন্ধান দিয়ে ওসমান ইবনে আবূ তালহা মক্কা ফিরে যান। এ ঘটনাটি উম্মু সালামার ওপর খুব প্রভাব ফেলে। তিনি তার সারা জীবনেও ঘটনাটি ভুলেন নি এবং ওসমান ইবনে তালহার মহানুভবতার কথা স্মরণ করতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন,

مَارَاَيْتُ صَاحِبًا قَطُّ اَكْرَمُ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ ـ

'আমি কখনো ওসমান ইবনে তালহার চেয়ে ভাল সাথী কাউকে দেখিনি।'

মদীনায় স্বামীর সাথে একত্রিত হওয়ার পর তাঁরা আবার সাংসারিক জীবন শুরু করেন। কিন্তু বেশিদিন একত্র থাকা সম্ভব হয়নি। এরই মধ্যে ডাক আসে ওহুদ যুদ্ধের। বীর যোদ্ধা আবূ সালামা ওহুদ যুদ্ধে বীরবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এ যুদ্ধে তিনি বহু শত্রু সৈন্যকেও নিধন করেন। তবে শত্রুর নিক্ষিপ্ত একটি তীর তাঁর বাহুতে এসে বিদ্ধ হয়। জখমটা ছিল মারাত্মক। দীর্ঘ একমাস চিকিৎসার পর তিনি কোনো রকম সুস্থ হয়ে ওঠেন।

জানা যায় এ ঘটনারও দু'বছর এগার মাস পর রাসূল ﷺ-এর নির্দেশে তিনি 'কতন' এলাকায় একটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। স্বামীর শাহাদাত বরণ এ যুদ্ধে প্রায় এক মাস সময় লেগে যায়। এখানেও তিনি আঘাতপ্রাপ্ত হন। যতদূর জানা যায়, এ আঘাতটা তাঁর পূর্বের জখমকে কাঁচা করে দেয় এবং তিনি মদীনায় ফিরে আসেন। জখমের তীব্রতা বাড়তে থাকে। এ অবস্থায় তিনি তাঁর স্ত্রী উম্মু সালামা (রা)-কে এ বলে সান্ত্বনা দিতেন।

'আমি রাসূলে করীম ﷺ-এর নিকট শুনেছি, কেউ যদি কোনো বিপদের সম্মুখীন হয় তাহলে দুঃশ্চিন্তা না করে সে যেন বলে, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।'

কারণ, আল্লাহর সান্নিধ্য পাওয়ার অনুভূতিই মু'মিনের জীবনে বিপদের মুহূর্তে প্রশান্তি দিতে পারে। তিনি এ বলেও প্রার্থনা করতে বলেছেন–

اَللّٰهُمَّ عِنْدَكَ احْتَسَبْتُ مُصِيْبَتِىْ هٰذِهٖ اَللّٰهُمَّ اخْلُفْنِىْ خَيْرًا مِّنْهَا اِلاَّ عَطَاهُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ ـ

"হে আল্লাহ! আমি আমার এ বিপদে তোমার কাছেই প্রতিদান চাচ্ছি। তুমি আমাকে এর চাইতেও উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করো, আল্লাহ অবশ্যই তাকে তা দান করবেন।'

আবূ সালামার অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছিল। একদিন সকালে রাসূলে করীম ﷺ তাঁকে দেখার জন্যে উপস্থিত হলেন। চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যের খোঁজ-খবর নিয়ে যখন তিনি প্রত্যাবর্তন করছিলেন, ঠিক সে মুহূর্তেই আবূ সালামা (রা) ইনতেকাল করলেন। রাসূলে করীম ﷺ নিজ হাতে তাঁর চোখ দুটি বুঁজিয়ে দিলেন এবং আল্লাহর কাছে এ বলে প্রার্থনা করলেন–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَبِىْ سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهٗ فِى الْمُقَرَّبِيْنَ وَاخْلُفْهُ فِىْ عَقِبِهٖ فِى الْغَابِرِيْنَ وَاغْفِرْلَنَا وَلَهٗ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ، وَافْسَحْ لَهٗ فِىْ قَبْرِهٖ، وَنَوِّرْ لَهٗ فِيْهِ ـ

'হে আল্লাহ! তুমি আবূ সালামার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দাও, তাঁর মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে তোমার প্রিয় ও নিকটতম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করো, তাঁর পরিবার-পরিজনের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করো এবং তাঁকে ও আমাদের সকলকে ক্ষমা করো। তাঁর কবরকে আলোকিত ও প্রশস্ত করে দাও।'

রাসূল ﷺ থেকে তার স্বামী কর্তৃক বর্ণিত সেই দু'আ উম্মু সালামা (রা) স্মরণ হলো। তিনি– 'হে আল্লাহ বিপদে তোমার কাছেই এর প্রতিদান চাচ্ছি'– পর্যন্ত বলে থমকে গেলেন এবং মনে মনে বললেন :

'আবূ সালামার চেয়ে উত্তম জীবন সঙ্গী আর কে হতে পারে?'

হিজরী ৪ সালের জমাদিউল উখরার ৯ তারিখে তিনি ইন্তেকাল করেন। উম্মু সালামার গর্ভে আবু সালামার ঔরসজাত দুইজন পুত্র সন্তান ছিল– সালামা ও উমার ও ২ জন কন্যা ছিল যয়নব (রা) ও রুকাইয়া (রা)।

রাসূল ﷺ-এর সান্ত্বনা ও দোয়া : আবূ সালামার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে রাসূল ﷺ তাঁর বাড়িতে ছুটে যান। শোকাহত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা ও গভীর শোক প্রকাশ করেন। উম্মু সালামা যখন খুবই কাতর হয়ে বার বার বলছিলেন, 'অসহায় অবস্থায় কেমন মৃত্যু হয়েছে হায়!' তখন রাসূল ﷺ তাঁকে ধৈর্যধারণ করবার ও মরহুমের মাগফেরাতের জন্য দু'আ করতে বলেন। বিষয়টি সুনানে নাসাঈ নামক গ্রন্থের ৫১১ পৃষ্ঠায় এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে– রাসূল ﷺ উম্মু সালামা (রা)-কে বললেন, বলো,

اَللّٰهُمَّ اَخْلِفْنِىْ خَيْرًا مِنْهَا .

'হে আল্লাহ! আমাকে তার চেয়ে উত্তম উত্তরাধিকারী দাও।

এরপর নবীজী আবূ সালামার মৃতদেহ দেখতে যান এবং অতি গুরুত্বের সাথে তাঁর জানাযার সালাত পড়ান। এ জানাযার সালাতে তিনি ৯টি তাকবীর বলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার ভুল হয়নি তো? বললেন, ইনি হাজার তাকবীরের যোগ্য ছিলেন। ইন্তেকালের পর তাঁর চোখ খোলা ছিল। নবীজী নিজ হাতে তাঁর চোখ বন্ধ করে দেন এবং তাঁর জন্য মাগফেরাতের দু'আ করেন।'

স্বামীর প্রতি তাঁর ভালবাসা : উম্মু সালামা (রা) তাঁর স্বামী আবূ সালামাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। আর এ কারণে একবার তার স্বামীকে বললেন, 'যদি কোনো স্ত্রীর স্বামী জান্নাতবাসী হয়, আর স্ত্রী তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর পুনর্বিবাহ না করে, তবে আল্লাহ সে স্ত্রীকেও তার স্বামীর সঙ্গে জান্নাতে স্থান দান করেন। এরূপ যদি স্ত্রীর মৃত্যু হয় তবে স্বামীও তার সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করে।' অতএব, হে আবূ সালামা! আসুন আমরা উভয়ে চুক্তি করি যে, আপনার পরে আমি অথবা আমার পরে আপনি আর বিয়ে করবেন না।

উত্তরে আবূ সালামা (রা) বললেন, কিন্তু পুনঃ বিয়ে সুন্নাত। আচ্ছা তুমি কি আমার উপদেশ মান্য করবে? উম্মু সালামা (রা) বললেন, কেন করবো না? আপনার আনুগত্য ছাড়া আমি আর কোনো কিছুতে খুশি হতে পারবো কি? তখন

আবূ সালামা (রা) বললেন, তবে শুন! আমি মারা গেলে আমার পরে তুমি বিয়ে করে ফেলো।' এরপর আবূ সালামা দু'আ করলেন, 'হে আল্লাহ! আমার পরে সালামাকে আমার থেকে উত্তম স্থলাভিষিক্ত দান করো।'

আবু সালামার দোয়া : উম্মু সালামা (রা) বলেন, 'আমার স্বামী আবূ সালামা (রা)-এর মৃত্যুর পর আমি ভাবতাম যে, তাঁর থেকে উত্তম ব্যক্তি কে হতে পারে? এর কিছুদিন পরেই রাসূল ﷺ-এর সাথে আমার শুভ পরিণয় অনুষ্ঠিত হয়।'

রাসূল ﷺ-এর সাথে বিবাহ : আবু সালামার ইনতেকালের সময় উম্মু সালামা অন্ত:সত্ত্বা ছিলেন। সন্তান (যয়নব) ভূমিষ্ঠের পর বিধবা উম্মু সালামা যখন অত্যন্ত অসহায়া ও দরিদ্র অবস্থায় দিনাতিপাত করছিলেন তখন আবূ বকর (রা) তাঁর অসহায়ত্বের কথা বিবেচনা করে বিয়ের প্রস্তাব দেন। কিন্তু তিনি এ বিয়েতে রাজি হননি। এক বর্ণনায় আছে ওমর (রা)-ও বিয়ের প্রস্তাব দেন। অবশ্য অন্য বর্ণনা মতে ওমর (রা) নিজের জন্য এ প্রস্তাব দেননি। বরং রাসূল ﷺ-এর হয়ে তিনি এ প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। আসলে ইসলামের জন্য উম্মু সালামার অপরিসীম ত্যাগ, স্বামীর মৃত্যুর পর ছোট ছোট বাচ্চাদের নিয়ে করুণ অবস্থা ইত্যাদির কথা চিন্তা করেই রাসূল ﷺ এ প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন।

উম্মু সালামা (রা) ছিলেন সুসাহিত্যিক, কাব্যপটু ও অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারিণী একজন আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্না মহিলা। নবী ﷺ-এর স্ত্রীদের মধ্যে সমস্ত দিক দিয়ে আয়েশা (রা)-এর পর তাঁর স্থান ছিল। রূপ-সৌন্দর্য, জ্ঞান প্রজ্ঞায় বিভূষিতা এ মহিলার পক্ষে রাসূল ﷺ-এর প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব ছিল না। তাই তিনি প্রস্তাবকারী ওমর (রা)-কে পরিষ্কার ভাষায় বললেন, 'আমি ব্যক্তিগতভাবে রাসূল ﷺ-এর প্রস্তাবকে স্বাগত জানাচ্ছি। এর সাথে সাথে আমি রাসূল ﷺ-এর দরবারে তিনটি আরজ পেশ করছি–

ক. আমি আভিজাত্যের অহংকারে অহংকারী মেয়ে
 বা আমার স্বভাবে আত্মবোধ অত্যাধিক।

খ. আমি একজন বিধবা মহিলা, আমার সন্তানাদি আছে।

গ. আমি একা, বিয়ের কাজ সম্পাদন করার আমার কেউ নেই।

ওমর (রা) উম্মু সালামার এ আরজ শোনার পর বললেন, 'হে উম্মু সালামা, তুমি কেমন মহিলা! আমার প্রস্তাবে রাজি হওনি। এখন রাসূলে করীম ﷺ-এর প্রস্তাবেও শর্তারোপ করছো!' বুদ্ধিমতি উম্মু সালামা উত্তর দিলেন, 'হে ওমর

ইবনুল খাত্তাব! আমার ইয়াতিম সন্তান আছে। আমি নিঃস্ব! আমি আমার বাস্তব অবস্থা রাসূল ﷺ-এর দরবারে কেবল তাঁর অবগতির জন্য পেশ করছি। এ কোন ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ কিংবা অহংকারবোধের বহি:প্রকাশও নয়।'

সব কথা শুনে রাসূল ﷺ উম্মু সালামাকে বললেন, 'হে উম্মু সালামা! তোমার যে ইয়াতিম সন্তানদের কথা উল্লেখ করেছো তাদের লালন-পালনের ব্যবস্থা আল্লাহই করবেন, আর তোমার কেউ নেই সে সমস্যারও সমাধান হবে।' তার উত্তরে উম্মু সালামা ছেলে ওমরকে বললেন, যাও মহানবী ﷺ-এর সাথে আমার বিয়ের ব্যবস্থা কর। এর কিছুদিন পর রাসূল ﷺ-এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। সময়টা ছিল হিজরী চতুর্থ সালের শাওয়াল মাস।

বিয়ের সময় রাসূল ﷺ উম্মু সালামাকে দু'টি যাঁতা, একটি কলসী এবং খুরমার বাকলে ভর্তি একটি চামড়ার বালিশ দান করেছিলেন।

উম্মু সালামা ছিলেন খুবই সুন্দরী ও লজ্জাবতী মহিলা। তাই দাম্পত্য জীবনে স্বাভাবিক হতে একটু বিলম্ব হয়। নবী করীম ﷺ তাঁর গৃহে আসতেই তিনি লজ্জায় কন্যা যয়নবকে কোলে নিয়ে বসে থাকতেন। বিয়ের পর ৪ জন সন্তান-সন্ততিসহ উম্মু সালামা নবীজীর গৃহে আসেন এবং সংসার জীবন শুরু করেন। নবী স্ত্রীগণ দু'টি দলে বিভক্ত ছিলেন। এর একটির নেতৃত্বে ছিলেন আয়েশা (রা) এবং অপরটির নেতৃত্বে ছিলেন উম্মু সালামা (রা)।

উম্মু সালামার বিচক্ষণতা : উপস্থিত বুদ্ধির জোরে উম্মু সালামা (রা) হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়ে যে সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল তা থেকে উত্তরণে রাসূল ﷺ-কে সহযোগিতা করেছিলেন। ঘটনাটি ছিল– হুদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর রাসূল ﷺ সেখানেই সকলকে কুরবানী করার নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে কেউই রাসূল ﷺ-এর হুকুম মত কাজ করেন নি। বরং চুপচাপ বসেছিলেন। আসলে বাহ্যত হুদায়বিয়ার সন্ধিটা ছিল বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের স্বার্থের বিরুদ্ধে। যে কারণে মুসলমানেরা খুবই মনঃকষ্টে ভুগছিলেন।

রাসূল ﷺ কুরবানী করার জন্য পর পর তিনবার নির্দেশ দেন কিন্তু তবুও মুসলমানেরা যখন কুরবানী না করে চুপ রইলেন তখন অত্যন্ত বিষণ্ন মনে তিনি নিজ তাঁবুতে ফিরে গেলেন এবং উম্মু সালামার কাছে পূর্বাপর সকল কিছু খুলে বললেন। উম্মু সালামা তখন রাসূল ﷺ-কে বললেন, 'আপনি কাউকে কিছুই

বলবেন না বরং বাইরে গিয়ে নিজের কুরবানী নিজে করে ফেলুন এবং ইহরাম ত্যাগ করার জন্য মাথার চুল কেটে ফেলুন।' তাঁর কথামত রাসূল ﷺ বাইরে বেরিয়ে এসে নিজের কুরবানী নিজে করলেন এবং মাথা মুড়িয়ে (ন্যাড়া করে) ফেললেন। এরপর দেখা গেল একে একে সবাই রাসূল ﷺ-এর অনুসরণে কুরবানী করলেন এবং ইহরাম ত্যাগ করলেন। এমন কি মাথা মুড়ানোর জন্য মোটামুটি ভিড় লেগে গিয়েছিল যে, কার আগে কে মাথা মুড়াবে।

বুঝা যায় উম্মু সালামা (রা) কেমন বুদ্ধিমতি মহিলা ছিলেন। তাঁর বুদ্ধিভিত্তিক ও মনস্তাত্বিক সিদ্ধান্তের কারণেই সেদিন বড় ধরনের সংকট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল। এ ব্যাপারে ইমামুল হারামাইন বলেছেন, 'মহিলা জগতের ইতিহাসে সঠিক সিদ্ধান্ত দানের এত বড় দৃষ্টান্ত আর নেই।' (যুরকানী ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৭২)

তাঁর মেধা : উম্মু সালামা সম্পর্কে মাহমুদ বিন লবিদ বলেন, 'যদিও মহানবী ﷺ-এর সকল পত্নী আল্লাহর রাসূলের প্রচুর হাদীস স্মৃতিতে ধারণ করেছিলেন, তবু তাদের মধ্যে আয়েশা (রা) এবং উম্মু সালামা (রা)-এর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না।' তিনি রাসূল ﷺ-এর মতই সুন্দর সুরে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারতেন এবং ছাত্রদের শেখাতেন। তিনি রাসূল ﷺ-এর প্রত্যেকটি কথা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে শুনতেন, মনে রাখতেন এবং আমল করার চেষ্টা করতেন।

মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে ইবনে কিয়াম লিখেছেন, 'উম্মু সালামার ফতোয়াসমূহ যদি একত্রিত করা যায় তাহলে তা দিয়ে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা তৈরি হতে পারে।'

হাদীস শিক্ষা ও সম্প্রসারণে উম্মু সালামা (রা)-এর অবদান

হাদীস শিক্ষা ও বর্ণনায় উম্মু সালামা (রা)-এর অবদান অনস্বীকার্য। হাদীস বর্ণনা ও প্রচারে আয়েশা (রা)-এর পরেই তাঁর স্থান। এ সম্পর্কে মাহমূদ ইবনে লবীদ বলেন–

كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ يَحْفَظْنَ مِنْ حَدِيْثِ النَّبِيِّ ﷺ كَثِيْرًا وَّلاَ مِثْلاً لِعَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ .

"রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণের বহু হাদীস মুখস্থ ছিল। তবে আয়েশা ও উম্মু সালামা (রা)-এর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না"।

(আনসাবুল আশরাফ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৫; হায়াতুস সাহাবা)

হাদীস শুনার প্রতি উম্মু সালামা (রা)-এর প্রবল আগ্রহ ছিল। একদিন তিনি চুলের বেনী বাঁধাচ্ছিলেন। এমন সময় রাসূল ﷺ ভাষণ দেয়ার জন্য মসজিদের মিম্বারে দাঁড়ালেন। তিনি কেবল, "ওহে লোক সকল! বলেছেন, আর অমনি উম্মু সালামা (রা) চুল বিন্যস্তকারিণীকে বললেন, 'চুল বেঁধে দাও।' সে বললো, এত তাড়াহুড়া কিসের? কেবল তো 'ওহে লোক সকল! বলেছেন। উম্মু সালামা (রা) বললেন : আমরা কি লোক সকলের অন্তর্ভুক্ত নই? অত:পর তিনি নিজেই চুল বেঁধে দ্রুত উঠে যান এবং দাঁড়ানো অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পূর্ণ ভাষণটি শুনেন। (মুসনাদ আহমাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৬৯৭)

এমনিভাবে হাদীস শিক্ষার প্রতি তাঁর যেমন তীব্র আকাঙ্খা ছিল, তেমনিভাবে হাদীস বর্ণনা ও সম্প্রসারণের প্রতিও ছিলেন তিনি যথেষ্ট সজাগ ও যত্নবান।

তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ ছাড়াও তাঁর পূর্ব স্বামী আবু সালামা ইবনে আব্দুল আসাদ (মৃ.৪/৬২৫) এবং নবী কন্যা ফাতিমা (রা) (মৃ.১১/৬৩২) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। (তাহযীবুত তাহযীব, ১২শ খন্ড, পৃ. ৪৮৩)

তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৩৭৮টি। তন্মধ্যে ১৩ (তের) টি মুত্তাফাকুন আলাইহি। আর এককভাবে ইমাম বুখারী (র) ৩ (তিন) টি এবং ইমাম মুসলিম ১৩ (তের) টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। সিয়ারু আ'লামিন নুবালা। মুসনাদ আহমাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৮৯-৩24 পৃষ্ঠায় তাঁর হাদীসগুলো সংকলিত হয়েছে। আমাদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা পুনরুক্তিসহ সহীহ আল-বুখারীতে ৪৮টি, সহীহ মুসলিমে ৩৯ টি, জামে' আত-তিরমিযীতে ৩৯ টি, সুনান আবূ দাউদে ৫০ টি, সুনান আন নাসাঈতে ৬৮ টি এবং সুনান ইবনে মাজায় ৫২ টি সংকলিত হয়েছে।

উম্মু সালামা (রা)-এর থেকে বর্ণিত হাদীসে শারঈ বিধি-বিধান, ইবাদত, সামাজিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক, নারী বিষয়ক, পবিত্রতা, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয় স্থান লাভ করেছে। নিম্নে তাঁর বর্ণিত হাদীস থেকে বিষয় ভিত্তিক দু'একটি করে হাদীস উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হলো।

শারঈ বিধান বিষয়ক

١. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضى) زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ، كَانَتْ زَوْجُهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى، فَخَطَبَهَا

أَبُو السَّنَابِلَ بْنِ بَعْكَكَ، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ. فَقَالَ : وَاللّٰهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِيَهُ حَتّٰى تَعْتَدِيْ أٰخِرَ الْأَجَلَيْنِ، فَمَكَثَتْ قَرِيْبًا مِّنْ عَشَرِ لَيَالٍ، ثُمَّ جَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ انْكِحِيْ.

১. উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুবাই'আ নামে আসলাম গোত্রের এক মহিলার স্বামী মারা যায়, সে ছিল গর্ভবতী। (গর্ভপাত হওয়ার পর) আবুস সানাবিল ইবনে বা'কাক তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে সে তা অস্বীকার করলো। অত:পর লোকটি বলল : আল্লাহর কসম! দু' ইদ্দতের শেষ ইদ্দত অর্থাৎ চার মাস দশ দিন অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত তোমার বিবাহ্ করা ঠিক হবে না। মহিলাটি দশ দিন পর্যন্ত অবস্থান করলো। অতঃপর নবী কারীম ﷺ-এর কাছে এসে এ সব কথা জানাল। নবী ﷺ বললেন : তুমি বিবাহ্ করতে পার। (সহীহ আল বুখারী, ২য় খণ্ড পৃ.-১৩৯; মুসনাদে আহমদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮০২)

٢. عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ (رضى) عَنِ الرَّجُلِ يَصْبَحُ جُنُبًا أَيَصُوْمُ ؟ قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ يَصْبَحُ جُنُبًا ثُمَّ يَصُوْمُ.

২. সুলায়মান ইবনে ইয়াসার উম্মু সালামা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, যদি কেউ ভোরে নাপাকী হয়ে যায় ঐ দিন রোযা রাখতে পারবে? উম্মু সালামা (রা) বললেন : নবী ﷺ ভোরে জুনুবী (অপবিত্র) হয়ে উঠলেও ঐ দিন রোযা রাখতেন। (সহীহ মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৪)

٣. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضى) قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَرِبَ فِيْ إِنَاءٍ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْفِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِيْ بَطْنِهِ نَارًا مِّنْ جَهَنَّمَ.

৩. উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি রূপা বা সোনার পাত্রে পান করল, সে যেন তার পেটে দোযখের আগুন ভর্তি করল। (বুখারী ২য় খণ্ড, পৃ.-১৩৯)

٤. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضى) قَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَعِنْدَهُ مَيْمُونَةُ فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَ ذٰلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ۔ فَقَالَ : احْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَلَيْسَ أَعْمٰى؟ لاَ يُبْصِرُنَا وَلاَ يَعْرِفُنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفَعُمْيَاوَانِ أَنْتُمَا؟ أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ۔

৪. উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-এর কাছে ছিলাম। সেখানে মায়মূনাও (রা) ছিলেন। ইবনে উম্মু মাকতূম আসলেন। এটা পর্দার বিধান নাযিল হবার পরের ঘটনা। নবী ﷺ বললেন, তোমরা তাঁর থেকে পর্দা কর। আমরা বললাম : হে রাসূল ﷺ সে তো অন্ধ, আমাদেরকে দেখতেও পারছে না, চিনতেও পারছে না। নবী ﷺ বললেন : তোমরাও কি অন্ধ, তোমরা কি তাঁকে দেখতে পাচ্ছো না? (সুনানে আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬৮)

ইবাদত বিষয়ক

٥. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضى) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِسْتَيْقَظَ لَيْلَةً فَقَالَ : مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةُ مِنَ الْفِتْنَةِ، مَا ذَا أُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ؟ مَنْ يُوْقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ ؟ أَلاَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِى الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِى الْاٰخِرَةِ۔

৫. উম্মু সালামা (রা) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ কোন এক রাতে ঘুম থেকে জেগে বললেন : সুবহানাল্লাহ্! কতই না ফিতনা এবং ধনভাণ্ডার এ রাতে নাযিল হয়েছে। এমন কে আছে যে, হুজরার অধিবাসীদেরকে জাগাবে? এমন অনেক লোক আছে যারা দুনিয়ায় কাপড় পরিধান করছে, অথচ আখিরাতে তারা হবে উলঙ্গ। (সহীহ আল-বুখারী, ১ম খন্ড, পৃ. ১৫১)

٦. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضى) قَالَتْ : شَكَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنْ أَشْتَكِيَ، فَقَالَ : طُوْفِى مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ. فَطَفْتُ وَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ يُصَلِّىْ اِلٰى جَانِبِ الْبَيْتِ، وَهُوَ يَقْرَأُ بِالطُّوْرِ و كِتَابٍ مَّسْطُوْرٍ ـ

৬. উম্মু সালামা (রা) বলেন, হজ্জে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অসুস্থতার অভিযোগ করলে তিনি বললেন : সাওয়ারে আরোহিনী হয়ে লোকদের পিছনে পিছনে তুমি তাওয়াফ কর। আমি তাওয়াফ করলাম, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বা গৃহের পার্শ্বে সূরা তুর পাঠ করে সালাত পড়ছিলেন। (মুসলিম ১ম খণ্ড, পৃ.-৪১৩)

٧. عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رض) قَالَتْ : عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اَقُوْلَ عِنْدَ اَذَانِ الْمَغْرِبِ : اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا اِقْبَالُ لَيْلِكَ وَ اِدْبَارُ نَهَارِكَ وَ اَصْوَاتُ دُعَائِكَ فَاغْفِرْلِىْ ـ

৭. উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমায় মাগরিবের আযানের পরে এ দু'আ পড়তে শিখিয়েছিলেন : اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا اِقْبَالُ لَيْلِكَ وَاِدْبَارُ نَهَارِكَ وَاَصْوَاتُ دُعَائِكَ فَاغْفِرْلِىْ ـ হে আল্লাহ নিশ্চয় ইহা আপনার রাতের আগমন, দিবসের পশ্চাত গমন এবং আপনার আহ্বানের আওয়াজ। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন। (সুনান আবু দাউদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭)

٨. عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رضى) قَالَتْ : مَا رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَصُوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ اِلاَّ شَعْبَانَ و رَمَضَانَ ـ

৮. উম্মু সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-কে শা'বান ও রমযান মাস ছাড়া অন্য কোন মাসে ক্রমাগত দু' মাস রোযা রাখতে দেখিনি। (তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৫)

٩. عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رضى) زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَمِعَ جَلَبَةَ خَصْمٍ بِبَابِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ اِلَيْهِمْ فَقَالَ : اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ وَاِنَّهُ يَاْتِيْنِى الْخَصَمُ فَلَعَلَّ

بَعْضُهُمْ اَبْلَغُ مِنْ بَعْضٍ فَاَحْسِبُ اَنَّهُ صَادِقٌ فَاَقْضِى لَهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَاِنَّمَا هِىَ قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ، فَلْيَحْمِلْهَا اَوْ يَذَرْهَا ـ

৯. যয়নব বিনত আবু সালামা (রা) উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হুজরার দরজায় ঝাগড়াকারীদের আওয়াজ শুনতে পেলেন। তাঁদের নিকট বের হয়ে এসে বললেন : আমি একজন মানুষ। ঝগড়াকারীরা আমার নিকট আসে। তাদের একেক জন অন্য জনের চেয়ে অধিক বাকপটু। আমার মনে হয় যে, সে সত্য বলেছে। অতঃপর তার পক্ষে আমি রায় দিয়ে দেই। কোন মুসলমানের অধিকার হরণ করে কারো পক্ষে রায় চলে গেলে, তার জানা উচিত সেটা হলো দোজখের আগুনের একটা টুকরা। সে ইচ্ছা করলে সেটা বহনও করতে পারে, আবার ত্যাগও করতে পারে। (মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৪)

রাজনৈতিক বিষয়ক

١٠. عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ : يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ اُمَرَاءُ فَتَعْرِفُوْنَ وَ تُنْكِرُوْنَ فَمَنْ كَرِهَ بَرِئَ، وَ مَنْ اَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلٰكِنْ مَنْ رَضِىَ وَتَابَعَ ـ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَا نُقَاتِلُهُمْ ؟ قَالَ : لَاَ، مَا صَلُّوْا ـ

১০. উম্মু সালামা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এমন কিছু শাসক তোমাদের ওপর নিয়োগ করা হবে। তোমরা তাদেরকে চিনবে এবং অস্বীকার করবে। যে ব্যক্তি অপছন্দ করবে সে নিষ্কৃতি পাবে। আর যে অস্বীকার করবে, সে নিরাপত্তা লাভ করবে। কিন্তু যে তুষ্ট হবে এবং অনুগত্য প্রকাশ করবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। লোকজন বলল : হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমরা কি তাদের সাথে যুদ্ধ করবো? নবী ﷺ বললেন : না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সালাত পড়ছে। (মুসলিম ২য় খন্ড, পৃ. ১২৮-১২৯)

অর্থনৈতিক বিষয়ক

١١. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضـ) قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ أَجْرٌ اِنْ أَنْفِقْ عَلٰى بَنِىْ أَبِىْ سَلَمَةَ اِنَّمَا هِىَ بَنِىْ؟ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ : أَنْفِقِىْ عَلَيْهِمْ فَلَكِ أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ -

১১. উম্মু সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বললাম আবু সালামার সন্তান-সন্ততি-তারা আমারও সন্তান তাদের ওপর আমি যদি সম্পদ ব্যয় করি তবে কি আমার পুণ্য হবে? নবী ﷺ বললেন : তুমি তাদের জন্য ব্যয় কর। এর প্রতিদান তুমি অবশ্যই পাবে। (বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৮)

١٢. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضى) قَالَتْ : كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِّنْ ذَهَبٍ - فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَكَنْزٌ هُوَ فَقَالَ : مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدِّىْ زَكَاتَهُ، فَزَكِّى، فَلَيْسَ بِكَنْزٍ -

১২. উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি স্বর্ণালংকার পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বললাম, ইহা কি সঞ্চিত ধন ভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত? রাসূল ﷺ বললেন : তা নিসাব পরিমাণ হলে এবং তার যাকাত আদায় করলে তা সঞ্চিত ধনের মাঝে গণ্য হবে না। (আবু দাউদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৮)

পরিবার ও পারিবারিক বিষয়

١٣. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضـ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا، وَقَالَ : اِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلٰى أَهْلِكِ هَوَانٌ، اِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِىْ -

১৩. উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বিবাহ করে তিন দিন তাঁর কাছে অবস্থান করলেন এবং বললেন : আমি এমন কাজ করবো না যার কারণে তোমাকে তোমার লোকদের মধ্যে অপমানিত হতে হবে।

তুমি যদি চাও তবে সাত দিন তোমার কাছে কাটাবো। যদি সাত দিন তোমার কাছে কাটাই, তবে আমার অন্যান্য স্ত্রীদের কাছেও সাতদিন করে কাটাবো।

(বুখারী ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৯)

١٤. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضى) قَالَتْ : لَمْ يَكُنْ ثَوْبٌ أَحَبَّ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ قَمِيْصٍ.

১৪. উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কামীস-এর চেয়ে কোন পোশাকই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অধিক প্রিয় ছিল না।

(মুসনাদে আহমদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.-২৫০)

পবিত্রতা বিষয়ক

١٥. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضى) قَالَتْ : اِنَّ اِمْرَاَةً مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَقَالَ زُهَيْرٌ : اِنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اِمْرَاَةٌ اَشَدُّ ضَفْرِ رَأْسِىْ اَفَأَنْقُضُهُ لِلْجَنَابَةِ ؟ قَالَ : اِنَّمَا يَكْفِيْكَ اَنْ تَحْثِىَ عَلَيْهِ ثَلاَثًا.

১৫. উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জনৈকা মুসলিম মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন : আমার চুল খুব ঘন ও ঝুটি বাঁধা। আমি কি জানাবাত হতে পবিত্র হওয়ার জন্য চুল কমিয়ে ফেলবো? নবী ﷺ বললেন : তিনবার চুলে পানি ঢালাই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। (আবু দাউদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩)

١٦. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَا يَغْتَسِلاَنِ فِىْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ.

১৬. উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ রোযা অবস্থায় তাঁকে চুম্বন দিতেন এবং তাঁরা দু'জন একই পাত্র থেকে গোসল করতেন।

(মুসনাদে আহমাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৪৩)

শিক্ষা বিষয়ক

١٧. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رضى) اَنَّهَا ذَكَرَتْ اَوْ كَلِمَةً غَيْرَهَا قِرَاءَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ. يَقْطَعُ قِرَائَتَهُ اٰيَةً اٰيَةً.

১৭. আব্দুল্লাহ ইবন আবু মুলায়কা উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। উম্মু সালামা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুরআন পাঠ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বিসমিল্লাহ্-এর পর সূরা ফাতিহার প্রথম তিনটি আয়াত উল্লেখ করে বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতি আয়াতে থেমে থেমে তিলাওয়াত করতেন।

(আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৫৬।)

চিকিৎসা বিষয়ক

١٨. عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَاٰى فِىْ بَيْتِهَا جَارِيَةً فِىْ وَجْهِهَا سَفْعَةً. فَقَالَ : اِسْتَرْقُوْا لَهَا فَاِنَّ بِهَا النَّظْرَةُ.

১৮. উম্মু সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ তাঁর ঘরে এক মেয়েকে দেখলেন, যার চেহারায় কালো কুচকে দাগ পড়ে গিয়েছে। নবী ﷺ বললেন : দু'আ পড়ে তাতে ফুঁক দাও। কেননা এতে নজর লেগেছে।

এরূপ অনেক গুরুত্বপূর্ণ হাদীস আমরা তাঁর থেকে লাভ করে থাকি।

উম্মু সালামা (রা) অতিশয় লাজুক প্রকৃতির মহিলা ছিলেন। বিয়ের পর রাসূল ﷺ যখন উম্মু সালামা (রা)-এর ঘরে আসতেন তখন তিনি লজ্জার কারণে মেয়ে যয়নবকে কোলে করে বসে থাকতেন। এ অবস্থা বেশ কিছু দিন বহাল ছিল। তারপর ধীরে ধীরে পরিস্থিতির উন্নতি হয়।

উম্মু সালামা (রা) ছিলেন অত্যন্ত আমলদার একজন মহিলা। বিদায় হজ্জের সময় তিনি অসুস্থ ছিলেন। কিন্তু যথার্থ ওজর থাকা সত্ত্বেও যখন তিনি রাসূল ﷺ-এর

সাথে গমন করেন, তখন রাসূল ﷺ তাওয়াফ সম্পর্কে বললেন, 'উম্মু সালামা, ফজরের সালাত চলাকালে উটের পিঠে সওয়ার হয়ে তুমি তাওয়াফ করবে।'

তিনি মাসে সোমবার, বৃহস্পতিবার ও জুমাবার রোযা রাখতেন। কুরআনের পবিত্রতার আয়াত তাঁর ঘরেই নাযিল হয়। তিনি সালাতের মুস্তাহাব সময় ত্যাগ করা লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'নবীজী যোহরের সালাত তাড়াতাড়ি পড়তেন, আর তোমরা আছরের সালাত তাড়াতাড়ি পড়।' উম্মু সালামা উদার হাতে দান-খয়রাত করতেন। তিনি একটি খেজুর হলেও তা ভিখারীর হাতে দিতে বলেছেন।

রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকালের পর উম্মু সালামা (রা) স্বামীর স্মৃতি ধরে রাখার জন্য তাঁর চুল মুবারক একটা রূপার কৌটায় সংরক্ষণ করে রাখেন এবং দর্শনার্থীদের দেখাতেন।

উম্মু সালামা (রা) চমৎকার স্বাস্থ্যের অধিকারিণী ছিলেন। তিনি তৎকালীন আরবের একজন রূপবতী মহিলা ছিলেন। রাসূল ﷺ-এর কোনো সন্তান তার ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন নি। পূর্ববর্তী স্বামী আবূ সালামার ঘরে তাঁর দু'পুত্র সালামা ও ওমর এবং দু' কন্যা দুররা ও বাররা জন্মগ্রহণ করেন। বাররার নাম রাসূল ﷺ পরিবর্তন করে রাখেন যয়নব। সালামা বড় হলে হামযা (রা)-এর কন্যা উসামার সাথে বিয়ে দেন। দ্বিতীয় পুত্র ওমর আলী (রা)-এর শাসনামলে ফারেস ও বাহরাইনের শাসনকর্তা ছিলেন।

ওফাত : উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামা (রা) ৬৩ হিজরী সনে ৮৪/৮৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। উম্মুল মু'মিনীনদের মধ্যে তিনিই সর্বাপেক্ষা দীর্ঘায়ু লাভ করেছিলেন। আবূ হুরায়রা (রা) জানাযার সালাত পড়ান। জানাযা শেষে তাকে মদীনার জান্নাতুল বাকীতে সমাধিস্থ করা হয়।

১৫. উম্মুল মু'মিনীন
যয়নব বিনতে জাহাশ (রা)

রাসূল ﷺ-এর পবিত্র স্ত্রীগণ হলেন মু'মিনদের জন্য মাতৃতুল্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন–

اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗٓ اُمَّهَاتُهُمْ ـ

নবী মু'মিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ আর তার স্ত্রীগণ তাদের মাতা (সূরা–৩৩ আহযাব : আয়াত-৬)

তাই মু'মিনদের মাতা ও রাসূল ﷺ-এর পবিত্র স্ত্রীগণ জান্নাতে যাবে এটাই স্বাভাবিক। যাদের সাথে রাসূল ﷺ-এর দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত হয়েছে তারা জাহান্নামে যাবে আর রাসূল ﷺ জান্নাতে থাকবেন এটা অসম্ভব কথাও বটে। তাই রাসূল ﷺ-এর সাথে তাদের সম্পর্কের কারণেই তারা জান্নাতে যাবেন, এটাই দলিল তাদের জান্নাতে যাওয়ার।

আল্লাহ তা'আলা আসমানে আমার আক্বদ সম্পন্ন করেছেন, আর আমার বিয়েতেই নবীজী গোশত-রুটি দিয়ে ওলীমার ব্যবস্থা করেছেন।' কথাগুলো তাঁর বিয়ের ব্যাপারে গর্বভরে বলতেন যয়নব বিনতে জাহাশ (রা)।

নাম ও পরিচয় : তাঁর নাম যয়নব। পূর্বে তাঁর নাম ছিল বুররাহ্। ডাক নাম উম্মু হাকাম। বাবার নাম জাহাশ। তিনি তৎকালীন আরবের সম্মানিত ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। তাঁর মায়ের নাম ছিল উমাইয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব। অর্থাৎ যয়নব বিনতে জাহাশ (রা) ছিলেন রাসূল ﷺ-এর আপন ফুফাতো বোন।

বংশ তালিকা : তাঁর বংশ তালিকা ছিল এ রকম, যয়নব বিনতে জাহাশ ইবনে রুবাব ইবনে ইয়া'মার ইবনে সোবরা ইবনে মুবরা ইবনে কাসীর ইবনে গানাম ইবনে দুদরান ইবনে আসাদ খুযাইমা।

ইসলাম গ্রহণ : পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে তিনি নবুওয়্যাতের সূচনালগ্নে ইসলাম গ্রহণ করেন। সে সূত্রে তিনি সাবেকুনাল আউয়ালুনদের তথা

প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীর পর্যায়ভুক্ত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন। পিতা জাহাশ পূর্বেই ইনতেকাল করেন। তাই তিনি এ সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত হন।

হিযরত : অবিশ্বাসী মক্কাবাসীদের অত্যাচার যখন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন রাসূল ﷺ-এর নির্দেশে পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সাথে যয়নব (রা) আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। পরে সেখান থেকে মদীনায় হিজরত করেন। নবী করীম ﷺ-এর অভিভাকত্বাধীনে অবস্থান করেন।

দাস প্রথা ও যায়েদ : তৎকালীন আরব সমাজে অন্যান্য পণ্য সামগ্রীর সাথে বাজারে মানুষও বেচাকেনা হতো। যাদেরকে বাজারে পণ্য সামগ্রীর মত বেচাকেনা করা হতো তারা ক্রীতদাসরূপে পরিচিত ছিল। নবুওয়্যাতের পূর্বে ও সূচনালগ্নেও এ প্রথা চালু ছিল। পরবর্তীকালে রাসূল ﷺ খোলাফায়ে রাশেদা, সাহাবাগণ ও পরবর্তীকালের মুসলিম শাসকগণ ধীরে ধীরে এ কু-প্রথার বিলুপ্তি সাধন করেন।

সেই জাহেলী যুগের প্রথা অনুযায়ী খাদীজা (রা)-এর ভাতিজা হাকীম ইবনে খুযাইমা বাজার থেকে যায়েদ ইবনে হারিসা নামের এক দাস বালককে কিনে এনে ফুফুকে উপহার হিসেবে দিলেন। পরবর্তীতে খাদীজা প্রিয় দাস যায়েদকে স্বামী মুহাম্মদ ﷺ-এর খেদমতের জন্য দিয়ে দিলেন। কিন্তু দয়ার সাগর, সর্বমানবতার মুক্তিদূত, রাহমাতুল্লিল আলামীন তাকে আযাদ (মুক্ত) করে দিলেন। এমনকি আপন পালক পুত্র হিসেবে তাকে গ্রহণ করলেন। রাসূল ﷺ-এর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে যায়েদ ইসলাম কবুল করলেন এবং অচিরেই নিজেকে কুরআন হাদীসের জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে তুললেন।

যায়েদের সাথে যয়নবের বিয়ে : এ ক্রীতদাস যায়েদ (রা)-এর সাথে রাসূল ﷺ-এর আপন ফুফাতো বোন অনিন্দ্য সুন্দরী যয়নব বিনতে জাহাশ (রা)-এর বিয়ে দেন। রাসূল ﷺ-এর উদ্দেশ্য ছিল মানুষের মধ্যে সমতা ফিরিয়ে আনা। সব মুসলমান সমান, সকলে ভাই ভাই, আশরাফ-আতরাফের কোনো বালাই ইসলামে নেই। ইসলামের সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েই তিনি একজন সদ্য আযাদপ্রাপ্ত ক্রীতদাসের সাথে আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ বংশ, কুরাইশ বংশের মেয়ে তাও আবার নিজেরই ফুফাতো বোনকে বিয়ে দেন।

কিন্তু নারীসুলভ মানসিকতার কারণে যয়নব (রা) এ বিয়েকে ভাল মনে মেনে নিতে পারেন নি। যে কারণে বিয়ের প্রায় এক বছর একত্রে বসবাস করার পরও

তাদের মধ্যে সার্বিক অর্থে কোনো ভাল সম্পর্ক গড়ে উঠেনি। ফলে যায়েদ (রা) প্রচণ্ড অশান্তির মধ্যে দিনাতিপাত করছিলেন। আসলে যয়নব (রা) বিয়ের আগেই রাসূল ﷺ-এর খেদমতে যায়েদ (রা) সম্বন্ধে আরজ করেছিলেন, 'আমি তাঁকে আমার জন্য পছন্দ করি না।' তিনি শুধু রাসূল ﷺ-এর নির্দেশ মেনে নেয়ার জন্যই এ বিয়েতে রাজি হয়েছিলেন।

যায়েদ-যয়নব দ্বন্দ্ব : কিন্তু যখন দু'জনের মধ্যে মোটেই বনিবনা হচ্ছিল না তখন একদিন যায়েদ (রা) এসে রাসূল ﷺ-কে বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ! যয়নব আমার কথার ওপর কথা বলে তর্ক করে, আমি তাকে তালাক দিতে চাই।' একথা শুনে রাসূল ﷺ যায়েদ (রা)-কে আল্লাহ্‌র ভয় দেখিয়ে তালাক দেয়া থেকে বিরত থাকতে বললেন। কারণ তালাক দেয়া শরীয়তে জায়েয হলেও অপছন্দনীয়। এমন কি বৈধ কাজসমূহের মধ্যে এ কাজটি নিকৃষ্টতম ও সর্বাধিক ঘৃণিত।

যে কারণে রাসূল ﷺ তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি তার মধ্যে কোন ত্রুটি দেখতে পেয়েছো?' যায়েদ উত্তর করলেন 'না!' কিন্তু আমি তার সংগে বসবাস করতে পারবো না।' রাসূল ﷺ তাঁকে আদেশের সুরে বললেন, 'বাড়িতে গিয়ে তোমার স্ত্রীর দেখাশোনা কর, তার সংগে ভাল আচরণ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর। কারণ আল্লাহ বলেছেন, 'তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সদাচরণ কর আর আল্লাহকে ভয় কর।' কিন্তু তাদের সম্পর্ক এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে শেষ পর্যন্ত যায়েদ (রা) রাসূল ﷺ নিষেধ করার পরও যয়নব (রা)-কে তালাক দিয়ে দেন।

এ বিষয়টি সূরা আহযাবে এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِیْٓ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ ـ

অর্থ: 'হে নবী! সে সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন তুমি সে ব্যক্তিকে বলেছিলেন যে, যার প্রতি আল্লাহ এবং তুমি অনুগ্রহ করেছিলে, তোমার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করো না এবং আল্লাহকে ভয় কর।' [সূরা–৩৩ আহযাব : আয়াত-৩৭]

নিরীহ যয়নব : যায়েদ (রা) যখন যয়নব (রা)-কে তালাক দিলেন তখন জনগণের মধ্যে জল্পনা কল্পনা চলতে লাগলো, ক্রীতদাসের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে কে-ই বা বিয়ে করবে। সত্যি কথা বলতে কি, তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পর যয়নব

(রা) হয়ে গেলেন অবজ্ঞা ও ঘৃণার পাত্রী! এ অবস্থা থেকে যয়নব (রা)-কে রেহাই দিতে আল্লাহ্ রাসূল ﷺ-এর সাথে তাঁকে বিয়ে দেয়ার মনস্থ করলেন।

তাই যয়নব (রা) তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পর ইদ্দত পুরা হলে রাসূলে করীম ﷺ তাঁকে বিয়ে করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। কিন্তু জাহেলী প্রথা সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কারণ যায়েদ (রা) ছিলেন রাসূল ﷺ-এর পালক পুত্র। তৎকালীন আরবের লোকজন পালক পুত্রকে আপন পুত্রের মতই মনে করতো। যায়েদ (রা) ঐ সময়ে যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ ﷺ নামেই পরিচিত ছিলেন। ফলে রাসূল ﷺ অপবাদের আশংকা করছিলেন। তাছাড়া মুনাফিকদের তর্জন গর্জনও ছিল।

কুপ্রথার মূলৎপাটনে আয়াত নাযিল : যা হোক, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন চাচ্ছিলেন সকল প্রকার কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করে নির্ভেজাল একটি ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য রাসূল ﷺ-কে দুনিয়াতে প্রেরণ করেন। তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সবকিছু নিরসনকল্পে ঘোষণা করলেন–

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ط وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا .

অর্থ : 'তোমাদের পুরুষদের মধ্যে মুহাম্মদ ﷺ কারো পিতা নন বরং তিনি আল্লাহ্র রাসূল এবং সর্বশেষ নবী। [সূরা–৩৩ আহযাব : আয়াত-৪০]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরও ঘোষণা করেন–

وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ج وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰهُ .

'তুমি অন্তরে তা গোপন করছিলে, যা আল্লাহ্ প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, তুমি মানুষকে ভয় করছ, অথচ আল্লাহ্ই তো বেশি ভয় পাওয়ার যোগ্য।'

[৩৩–আহযাব : ৩৭]

বিয়ের প্রস্তাব যায়েদ কর্তৃক : রাসূল ﷺ নিশ্চিন্ত হলেন। এরপর তিনি যায়েদকেই পাঠালেন বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যয়নব (রা)-এর কাছে। তিনি যয়নব (রা)-এর গৃহে গিয়ে বললেন, 'আল্লাহ্র রাসূল ﷺ তোমাকে বিয়ে করতে চান।' তিনি বললেন, 'এটা খুব ভাল কথা। তবে ইস্তেখারা করে সিদ্ধান্ত নেব।'

তিনি ইস্তেখারায় বসে গেলেন। ইতোমধ্যেই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রাসূল ﷺ ও যয়নব (রা)-এর বিয়ের ব্যাপারে আয়াত নাযিল হল–

فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَىْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِىٓ اَزْوَاجِ اَدْعِيَآئِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ط وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ـ

অর্থ: 'অতঃপর যায়েদ যখন তার সাথে স্বীয় প্রয়োজন সমাপ্ত করল তখন আমি তাঁকে তোমার নিকট বিয়ে দিলাম। যাতে প্রয়োজন পুরো করার পর মুখ ডাকা পুত্রের স্ত্রীদের ব্যাপারে মু'মিনদের ওপর কোনো দোষারোপ না চলে। আল্লাহ্র ইচ্ছে তো পূরণ হবেই।' [সূরা–৩৩ আহযাব : আয়াত-৩৭]

সরাসরি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে, 'তখন আমি তাঁকে তোমার নিকট বিয়ে দিলাম।' এমন কথা নাযিল হওয়ার পর বিয়ের কাজ সম্পন্ন করা হল। সময়টা ছিল ৫ম হিজরীর জিলক্বদ মাস। এ জন্যেই যয়নব (রা) গর্ব করে বলতেন, 'আমার বিয়ে স্বয়ং আল্লাহ দিয়েছেন।'

বিয়ের অনুষ্ঠান : এ বিয়েতে বেশ আনন্দ করা হয়। বৌভাত অনুষ্ঠানে আনসার ও মুহাজিরদের প্রায় তিনশ জনকে দাওয়াত করা হয়। খাওয়ার মেনু ছিল গোশত-রুটি। একেক বারে দশজন করে লোক খেতে বসছিলেন। কিন্তু শেষ দলের লোকজন খাওয়া শেষ হওয়ার পরও বসেছিলেন। তারা নানা গল্পে মেতে উঠলেন। ফলে রাত ক্রমেই গভীর হতে লাগলো।

পর্দার আয়াত : রাসূল ﷺ লজ্জার কারণে মেহমানদেরকে উঠতে বলতে পারছিলেন না, অথচ খুব অস্বস্তি অনুভব করছিলেন। ঠিক এ সময়ে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পর্দার আয়াত নাযিল হয়। ইরশাদ হচ্ছে–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِىِّ اِلَّآ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰهُ ل وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَامُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ ط اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ

يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِ مِنْكُمْ ز وَاللّٰهُ لَايَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ ط
وَإِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاۤءِ حِجَابٍ ـ

অর্থ: 'হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা নবী গৃহে প্রবেশ করবে না। অবশ্য দাওয়াত পেলে যাবে, তবে ডাকার আগে গিয়ে অনর্থক বসে থাকবে না। বরং ডাকবার পরে যাবে, খাওয়ার পরে চলে আসবে। বসে গল্প-গুজবে রত হবে না। নিশ্চয় এটা নবীর জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদেরকে বলতে সংকোচ বোধ করেন, কিন্তু আল্লাহ সত্য কথা বলতে সংকোচ বোধ করেন না। তোমরা নবীর স্ত্রীদের নিকট কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে।' [সূরা–৩৩ আহযাব : আয়াত-৫৩]

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূল ﷺ দরজায় পর্দা ঝুলিয়ে দেন। ফলে লোকদের ভেতরে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়।

রাসূল ﷺ ও যয়নব (রা)-এর বিয়ের ফলে আরবের দীর্ঘদিনের প্রচলিত একটি ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটে, তা হল-পালক পুত্র আদৌ আপন পুত্র হতে পারে না। ফলে তার স্ত্রীকে বিয়ে করাও দোষণীয় নয়। ইসলাম পরিষ্কারভাবে ১৪ জন নারীকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ করেছে। বাকী সকলকে বিয়ে করা জায়েয। এ ১৪ জনের মধ্যে পালক পুত্রের স্ত্রীর কথা নেই।

বিয়ের বৈশিষ্ট্য : এ বিয়ের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তা হল–

১. জাহেলী যুগে পালক পুত্র আসল পুত্রের মর্যাদাসম্পন্ন ছিল। এ প্রথার বিলুপ্তি ঘটানো হয়েছে।

২. লোকদেরকে আদেশ করা হয় যে, কাউকে তার প্রকৃত পিতা ব্যতীত অন্যের সাথে পিতৃ পরিচয়ে সম্পর্ক করা যাবে না।

৩. মানুষের মধ্যে উঁচু-নীচুর কোনো ব্যবধান থাকবে না।

৪. আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে যয়নব (রা)-এর বিয়ে দেন।

৫. যয়নবের সাথে বিয়ের সময় পর্দার আয়াত নাযিল হয় এবং পর্দা প্রথার প্রচলন হয়।

৬. একমাত্র যয়নবের বিয়েতেই জাঁকজমকপূর্ণভাবে অলিমা অনুষ্ঠান করা হয়।

শারীরিক গঠনের দিক দিয়ে জয়নব (রা) ছিলেন ক্ষুদ্রকায় কিন্তু সুন্দরী ছিলেন। সাথে সাথে শোভন শারীরিক গঠন ছিল তাঁর।

চরিত্র মাধুর্য : তিনি অত্যন্ত দ্বীনদার, পরহেযগার, উদার, দয়ার্দ্রচিত্ত, বিনয়ী ও সৎ স্বভাবী ছিলেন। আর তিনি ছিলেন পরিশ্রমী একজন মহিলা। তিনি হস্তশিল্পের কাজে খুবই পারদর্শী ছিলেন। তিনি নিজ হাতে রোজগার করে সংসার চালাতেন। তাঁর পরহেযগারিতার ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর সাক্ষ্য পাওয়া যায়। একবার সাহাবীদের মধ্যে রাসূল ﷺ কিছু মাল বিতরণ করছিলেন। কিন্তু স্ত্রী যয়নবের পরামর্শক্রমে তা কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ রাখেন। এতে ওমর (রা) রাগ করে যয়নবকে ধমক দিলে রাসূল ﷺ বলেন, 'ওমর! যয়নবকে কিছু বলো না। সে খুবই আল্লাহ্ ভীরু ও ইবাদতের সময় ক্রন্দনশীলা।'

একবার ওমর (রা) বায়তুল মাল থেকে যয়নবকে এক বছরের খরচ পাঠিয়ে দেন। যয়নব (রা)-এর সামান্য অংশ একটি চাদরে ঢেকে রেখে বাকী সমস্ত কিছু গরীব মিসকীনদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়ার জন্য পরিচারিকাকে নির্দেশ দেন। এ সময় পরিচারিকা আরজ করলেন, আম্মাজান! গরীবদের মাঝে আমিও একজন। সুতরাং এ মাল থেকে আমিও কিছু পেতে পারি। বিবি যয়নব বললেন, চাদরে ঢাকা যা আছে সবই তোমার, বাকীগুলো তুমি দান করে দাও।'

সব কিছু দান করার পর তিনি মহান রাব্বুল আলামীনের উদ্দেশ্যে আরজ করলেন, 'ইয়া রাব্বাল আলামীন! বায়তুল মাল থেকে দান যেন আর আমাকে গ্রহণ করতে না হয়।' তাঁর এ মুনাজাত কবুল হয় অর্থাৎ ঐ বছরেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য : যয়নব বিনতে জাহাশ (রা) ছিলেন আত্মমর্যাদা সম্পন্না মহিলা। মুহাম্মদ ইবনে ওমর বর্ণনা করেন যে, 'একদিন যয়নব (রা) নবীজীকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার অন্য স্ত্রীদের মত নই। তাঁদের মধ্যে একজনও এমন নেই, যার বিয়ে পিতা-ভাই বা বংশের অন্য কারো অভিভাবকত্বে সম্পন্ন হয়নি। একমাত্র আমিই ব্যতিক্রম। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আসমান থেকে আপনার স্ত্রী করেছেন।'

আয়েশা (রা) বলেছেন,

مَارَأَيْتُ اِمْرَأَةً قَطُّ فِى الدِّيْنِ مِنْ زَيْنَبَ .

'আমি দ্বীনের ব্যাপারে যয়নব (রা) থেকে উত্তম কোনো মহিলা দেখিনি।'

(আল-ইসতীয়াব-২/৭৫৪)

মূসা ইবনে তারেক যয়নব (রা) সম্পর্কে আয়েশা (রা) থেকে উদ্ধৃত করে বলেন, 'দ্বীনদারী, তাকওয়া, সত্যবাদিতা, আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সহানুভূতি, দানশীলতা এবং আত্মত্যাগে তাঁর চেয়ে উত্তম মহিলা আর কেউ ছিল না।'

আয়েশা (রা) তাঁর সম্বন্ধে আরও বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা যয়নব বিনতে জাহাশের প্রতি রহম করুন। সত্যি দুনিয়ায় তিনি অনন্য মর্যাদা লাভ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবীর সাথে তাঁকে বিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর প্রসঙ্গে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে।

তাঁর সম্বন্ধে উম্মু সালামা (রা) বলেন,

كَانَتْ صَالِحَةً صَوَّامَةً قَوَّامَةً ـ

'তিনি ছিলেন অতি নেককার, অধিক সিয়াম পালনকারী এবং অতি ইবাদতকারী।'

হাদীস শিক্ষা ও সম্প্রসারণে তাঁর অবদান

যয়নব বিনতে জাহাশ (রা) মর্যাদা সম্পন্ন মহিলা সাহাবী ছিলেন। বিভিন্ন কর্মের পাশাপাশি তিনি অল্প পরিমাণে হলেও নবী ﷺ থেকে হাদীস শিক্ষা ও তা বর্ণনা কার্যেও অবদান রেখেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে ১১টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনে হাজার (র) আল-ইসাবা গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, যয়নব (রা) নবী ﷺ থেকে কতিপয় হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীস পুনরুক্তিসহ বুখারীতে ৫টি, মুসলিমে ৩টি, তিরমিযীতে ২টি, আবু দাউদে ২টি, নাসাঈতে ২টি ও ইবনে মাজায় ২টি সংকলিত হয়েছে।

তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীসের কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

١. عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ (رضـ) أَنَّهَا قَالَتْ : اِسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ النَّوْمِ مُحْمَرًّا وَّجْهُهُ يَقُوْلُ : لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدْ اِقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمُ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مِثْلَ هٰذِهٖ وَعَقَدَ سُفْيَانُ تِسْعِيْنَ اَوْ مِائَةً ـ قِيْلَ : اَنُهْلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ ؟ قَالَ : نَعَمْ اِذَا كَثُرَ الْخُبْثُ ـ

১. যয়নব বিনত জাহাশ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ একদা রক্তিম বর্ণের চেহারা নিয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। তিনি বললেন : আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আরবদের জন্য বিপদ সমাগত। ইয়া'জূজ-মা'জূজ এর প্রাচীরের ছিদ্র আজ এ পর্যন্ত উন্মুক্ত করে ফেলা হয়েছে (বর্ণনাকারী সুফিয়ান) তাঁর হাতের আঙ্গুল দিয়ে ৯০ বা ১০০-এর আকৃতি করে দেখালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো– আমরাও কি ধ্বংস হয়ে যাবো অথচ আমাদের মাঝে পুণ্যবানগণ রয়েছে? নবী ﷺ বলেলেন : হ্যাঁ, যখন অন্যায় অধিক হবে, তোমরাও ধ্বংস হয়ে যাবে। (মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃ.–৩৮৮)

٢. عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ (رضـ) قَالَتْ : قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَنَا مُسْتَحَاضَةٌ فَقَالَ : تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَ تُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّيْهِمَا وَ تُوَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلُ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّيْهِمَا جَمِيْعًا، وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ-

২. যয়নব বিনত জাহাশ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ কে বললাম, যে, আমি ইস্তিহাযা (অনিয়ন্ত্রিত স্রাব)-এ আক্রান্ত। নবী ﷺ বললেন : তুমি তোমার পূর্ব নির্ধারিত হায়যের দিনগুলোতে অপেক্ষা করবে। অতঃপর গোসল করে যোহরকে কে বিলম্ব করত আসরকে তাড়াতাড়ি করবে। অতঃপর গোসল করে উভয় ওয়াক্ত সালাত পড়বে। অনুরূপ মাগরিব কে বিলম্ব করে এশা কে এগিয়ে এসে গোসল করে উভয় সালাত একত্রে পড়বে। আর ফজরের জন্যও আলাদা গোসল করবে। (সুনানে নাসাই ১ম খণ্ড পৃ.–৬৫-৬৬)

٣. عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ (رضى) أَنَّهُ كَانَ لَهَا مَخْضَبٌ مِّنْ صَفْرٍ - قَالَتْ : كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْهِ -

৩. যয়নব বিনত জাহাশ (রা) হতে বর্ণিত। তাঁর হলুদ রঙের একটি চিরুনী ছিল যা দ্বারা তিনি রাসূল ﷺ-এর মাথা চিরুনী করে দিতেন। (সুনান ইবনে মাজাহ)

৪. যয়নব বিনতে আবূ সালাম (রা) বলেন : তিনি যয়নাব বিনত জাহাশের (রা) নিকট আসলে তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী কোন নারীর জন্য বৈধ নয় মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের অধিক শোক প্রকাশ করা। তবে স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী চার মাস দশ দিন শোক পালন করতে পারে।

তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে ছিলেন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবন জাহ্‌শ (তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র), উম্মু হাবীবা বিনতে আবূ সুফিয়ান, যয়নব বিনতে আবু সালামা, কুলছুম বিনতুল মুসতালাক (র) প্রমুখ সাহাবী ও তাবেঈদের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ওফাত : হিজরী ২০ সালে ওমর (রা)-এর শাসন আমলে ৫৩ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকালের সময় শুধু একটি মাত্র গৃহ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তাঁর স্মৃতি চিহ্ন এ গৃহটি উমাইয়া খলীফা ওয়ালীদ ইবনে আবদুল মালেক ৫০ হাজার দিরহামের বিনিময়ে তাঁর আত্মীয়-স্বজনের নিকট থেকে ক্রয় করে মসজিদে নববীর আন্তর্ভুক্ত করেন।

মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর কাফনের কাপড় তৈরি করে যান। এ ব্যাপারে তিনি অসিয়ত করেন যে, 'ওমর আমার জন্য কাপড় পাঠাতে পারে। এমন হলে এক প্রস্থ কাপড় ছদকা করে দেবে।'

তাঁর অসিয়ত অনুযায়ী রাসূলে করীম ﷺ-এর খাটে করে তাঁকে দাফন করতে নিয়ে যাওয়া হয়। এ খাটে করে আবূ বকর (রা)-এর লাশও বহন করা হয়। তবে আবূ বকর (রা)-এর পর যাদের লাশ বহন করা হয়, তাদের মধ্যে যয়নব (রা) ছিলেন প্রথম মহিলা।

ওমর (রা)-এর নির্দেশে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ, উসামা ইবনে যায়েদ, আবদুল্লাহ ইবনে আবু আহমদ ইবনে জাহাশ এবং মুহাম্মদ ইবনে তালহা তাঁর লাশ কবরে নামান। এঁরা সবাই ছিলেন যয়নব (রা)-এর নিকটাত্মীয়।

আয়েশা (রা) তাঁর মৃত্যুতে শোকাহত হয়ে বলেছিলেন, 'ভাগ্যবতী অনন্য মহিলা বিদায় নিয়েছেন। এতীমরা হয়ে পড়েছে অস্থির ব্যাকুল। তিনি ছিলেন এতীমদের আশ্রয়স্থল।'

ওমর (রা) তাঁর জানাযার সালাত পড়ান। তাকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। আকীল এবং হানাফিয়ার কবরের মধ্যস্থলে তাঁর কবরের অবস্থান। তাঁর দাফন করার দিন প্রচণ্ড গরম পড়েছিল। এজন্য ওমর (রা) সেখানে তাঁবু গাড়েন। জানা যায় কবর খননের জন্য জান্নাতুল বাকীতে এটা ছিল প্রথম তাঁবু।

১৬. উম্মুল মু'মিনীন জুয়াইরিয়া (রা)

রাসূল ﷺ-এর পবিত্র স্ত্রীগণ হলেন মু'মিনদের জন্য মাতৃতুল্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন–

اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗٓ اُمَّهٰتُهُمْ .

নবী মু'মিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ আর তার স্ত্রীগণ তাদের মাতা (সূরা–৩৩ আহযাব : আয়াত-৬)

তাই মু'মিনদের মাতা ও রাসূল ﷺ-এর পবিত্র স্ত্রীগণ জান্নাতে যাবে এটাই স্বাভাবিক। যাদের সাথে রাসূল ﷺ-এর দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত হয়েছে তারা জাহান্নামে যাবে আর রাসূল ﷺ জান্নাতে থাকবেন এটা অসম্ভব কথাও বটে। তাই রাসূল ﷺ-এর সাথে তাদের সম্পর্কের কারণেই তারা জান্নাতে যাবেন, এটাই দলিল তাদের জান্নাতে যাওয়ার।

নাম ও পরিচয় : নাম জুয়াইরিয়া। পূর্ব নাম ছিল বাররা। রাসূল ﷺ তাঁর নাম পরিবর্তন করে রাখেন জুয়াইরিয়া। আব্বার নাম হারেস। তিনি বনু মুস্তালিক গোত্রের সর্দার ছিলেন। তাঁর বংশ তালিকা হল, জুয়াইরিয়া বিনতে হারেস ইবনে আবু দিদার ইবনে হাবীব ইবনে আয়েয ইবনে মালেক ইবনে জুয়াইমা ইবনে আসাদ ইবনে আমর ইবনে রাবীয়া ইবনে হারিসা ইবনে আমর মুযিকিয়া।

প্রথম বিবাহ : জুয়াইরিয়া (রা)-এর প্রথম বিয়ে হয়েছিল তাঁর নিজের গোত্রের মুসাফা ইবনে সাফওয়ান মুসতালেফীর সাথে। মুসাফা সম্পর্কে জুয়াইরিয়া (রা)-এর চাচাত ভাই ছিলেন। তিনি ইবনে যিয়ার নামেও পরিচিত ছিলেন।

প্রথম দিকে ইসলামের প্রকাশ্য শত্রু : জুয়াইরিয়া (রা)-এর পিতা এবং স্বামী দু'জনই ইসলামের ঘোর শত্রু ছিলেন। কুরাইশদের প্ররোচনায় অথবা নিজেদের ইচ্ছায় তারা মদীনার ওপর আক্রমণ করার পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন। সংবাদটি রাসূল ﷺ-এর কানে পৌছলে তিনি এর সত্যতা যাচাই-এর জন্য বুরাইদা ইবনে হাবীব আসলামীকে ঘটনাস্থলে প্রেরণ করেন সরেজমিনে তদন্ত করার জন্য। বুরাইদা ফিরে এসে সংবাদটি সত্য বলে জানালে রাসূল ﷺ তাঁর

বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হন এবং মুরাইসী নামক স্থানে অবস্থান নেন। এ মুরাইসী নামক স্থানটি মদীনা থেকে নয় মাইল দূরে। আর সময়টি ছিল হিজরী ৫ম সনের শাবান মাস।

বনী মুস্তালিক যুদ্ধ : ওদিকে মুসলমান বাহিনীর আগমন, অবস্থান গ্রহণ ও রণসজ্জার খবর শুনে মুস্তালিক গোত্র প্রধান জুয়াইরিয়া (রা)-এর পিতা হারেস তাঁর সংগঠিত বাহিনী থেকে সটকে পড়েন। কিন্তু তাঁর বাহিনীর মনোবল ছিল অটুট। হারেসের অধীনস্থ বাহিনী কিছুমাত্র পিছু না হটে মুসলিম বাহিনীর সাথে মরণপণ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। প্রচণ্ড যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হওয়ার পর দেখা গেল মুসলিম বাহিনী জয়লাভ করেছে। এ যুদ্ধে বনী মুস্তালিক গোত্রের এগার জন নিহত হয় ও ছয়শত সেনা মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হয়। আর দুই হাজার উট ও পাঁচ হাজার ছাগলও মুসলমানদের দখলে আসে। এ যুদ্ধে জুয়াইরিয়ার স্বামী নিহত হন।

উক্ত যুদ্ধবন্দীদের সাথে বন্দী অবস্থায় গোত্র প্রধান হারেসের কন্যা জুয়াইরিয়াও ছিলেন। তৎকালীন আরবের নিয়ম অনুযায়ী যুদ্ধবন্দীদেরকে গোলাম হিসেবে বিলি বণ্টন করা হতো। সে মুতাবেক জুয়াইরিয়া সাবিত ইবনে কায়েসের ভাগে পড়েন। পূর্বেই বলেছি জুয়াইরিয়া ছিলেন গোত্র প্রধানের কন্যা। যে কারণে তিনি দাসীর জীবন মেনে নিতে পারছিলেন না। সে জন্য তিনি সাবিত (রা)-এর কাছে অর্থের বিনিময়ে মুক্তির আবেদন জানান। সাবিত (রা) ১৯ উকিয়াহ স্বর্ণের বিনিময়ে এ আবেদন মঞ্জুর করেন।

রাসূল ﷺ জুয়াইরিয়ার পক্ষ থেকে মুক্তিপণ আদায় ও তাকে বিবাহ করা : কিন্তু জুয়াইরিয়ার কাছে এত বিপুল স্বর্ণ বা সম্পদ না থাকার কারণে তিনি এ ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য স্বয়ং রাসূল ﷺ-এর নিকট আবেদন করেন। এ ঘটনাটি আয়েশা (রা) এভাবে বর্ণনা করেছেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ বন্দীদেরকে বণ্টন করলে জুয়াইরিয়া বিনতে হারেস সাবিত ইবনে কায়েসের ভাগে পড়েন। জুয়াইরিয়া তৎক্ষণাৎ মুক্তিপণ দিয়ে মুক্তি লাভের উদ্যোগ নেন। তিনি ছিলেন খুবই লাবণ্যময়ী মিষ্টি মেয়ে। তাঁকে যে-ই দেখতো সে মুগ্ধ হয়ে যেত। জুয়াইরিয়া মুক্তিলাভের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে সাহায্য কামনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আমি হারেস ইবনে আবূ দিদারের কন্যা।

আমার পিতা গোত্রের সরদার, আমি কি বিপদে পড়েছি তা আপনার অজানা নয়। আমি সাবিত ইবনে কায়েসের ভাগে পড়েছি। আমার মুক্তিপণ আদায়ে আপনার সাহায্য কামনা করছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি যদি তোমার জন্য আরো ভাল কিছুর ব্যবস্থা করি? তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, সেটা কি? তিনি বললেন, আমি তোমার পক্ষ থেকে মুক্তিপণ আদায় করে দিয়ে তোমাকে বিয়ে করবো। জুয়াইরিয়া বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি এতে রাজি আছি। তখন রাসূল ﷺ বললেন, আমি তাই করলাম।

মুসলমানগণ যখন জানতে পারলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুয়াইরিয়াকে বিয়ে করেছেন তখন তারা তাদের হাতে বন্দী বনু মুস্তালিকের সব লোককে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আত্মীয় বিবেচনা করে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। এভাবে বনু মুস্তালিকের ছয়শ বন্দী শুধু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে জুয়াইরিয়ার বিয়ে হওয়ার কারণে মুক্তি লাভ করলো। সত্যি বলতে কি নিজ গোত্রের জন্য জুয়াইরিয়ার চেয়ে কল্যাণকর প্রমাণিত হয়েছে এমন কোন মহিলার কথা আমার জানা নেই।'

জুয়াইরিয়ার পিতার ইসলাম গ্রহণ : অন্য একটি বর্ণনা এরূপ– ইবনে আসীর (রা) বলেন, 'জুয়াইরিয়ার বাবা যখন জানতে পারলেন যে, তার কন্যা বন্দী হয়ে আছে, তখন তিনি অনেক সম্পদ ও আসবাবপত্র কয়েকটি উটের ওপর বোঝাই করে কন্যার মুক্তির জন্য মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে পছন্দনীয় দু'টি উট 'মাফিক' নামক স্থানে লুকিয়ে রেখে অবশিষ্ট উট ও আসবাব নিয়ে রাসূল ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, 'আপনি আমার কন্যাকে বন্দী করে এনেছেন। এসব মাল ও আসবাবপত্র নিন, বিনিময়ে আমার কন্যাকে ফিরিয়ে দিন।'

রাসূল ﷺ বললেন, 'যে দু'টি উট তুমি লুকিয়ে রেখে এসেছ তা কোথায়?' রাসূল ﷺ-এর কথা শুনে হারেস আশ্চর্য হয়ে গেলেন এবং তখনই ইসলাম গ্রহণ করলেন। এরপর যখন জানতে পারলেন যে, তাঁর কন্যা রাসূল ﷺ-এর স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন, তখন তিনি সীমাহীন খুশি হন এবং কন্যার সাথে সাক্ষাৎ করে গৃহে ফিরে যান।

রাজনৈতিক কারণে বিয়ে : মূলত রাসূল ﷺ এ বিয়েটা করেছিলেন সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে। একটু চোখ-কান খুলে বিয়ের বিষয়টা দেখলেই পরিষ্কার হয় যে, বিয়েটা ছিল রাজনৈতিক দূরদর্শীতার এক মাইল ফলক। এ বিয়ের ফলে রাসূল ﷺ ও মুসলমানগণ কূটনৈতিকভাবে বিজয় লাভ করেন। কারণ বনু

মুস্তালিক গোত্রের সকল মানুষ ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের চরম শত্রু। তারা কোনো প্রকারেই রাসূল ﷺ ও মুসলমানদের মেনে নিতে রাজি ছিল না। এমতাবস্থায় রাসূল ﷺ জুয়াইরিয়াকে বিয়ে করার ফলে বনু মুস্তালিকের সকল যুদ্ধ বন্দী বেকসুর মুক্তি লাভ করে। ফলে হঠাৎ করেই প্রাণের দুশমন বন্ধুতে পরিণত হয়। বনু মুস্তালিক গোত্রের কেউ আর কোনোদিন রাসূল ﷺ ও মুসলমানদের বিরোধিতা করেনি। এমন কি তারা ধীরে ধীরে সকলেই ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ করে।

জুয়াইরিয়ার ব্যক্তি সত্ত্বা : জুয়াইরিয়া (রা) ছিলেন অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্না ও স্বাধীনচেতা মহিলা। যে কারণে তিনি বন্দী জীবন সহ্য করতে পারেন নি। তিনি দেখতে ছিলেন সুন্দরী এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী। তাঁর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আয়েশা (রা) বলেন, 'জুয়াইরিয়া দেখতেই শুধু সুন্দরী ছিলেন না, বরং তাঁর অনুপম চেহারায়, চিত্তাকর্ষক এবং মধুর আচরণে এমন এক মাধুর্য নিহিত ছিল, যাতে করে যে কোনো লোক তাঁর সান্নিধ্যে আসতো, সে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল, বিমুগ্ধ ও আকৃষ্ট হয়ে যেতো। তাঁকে দেখলেই দর্শকের মনে একটা স্থায়ী মমতার চিহ্ন ফুটে উঠতো।'

জুয়াইরিয়া (রা) একজন ইবাদত গুজার মহিলা ছিলেন। জানা যায়, তিনি প্রায় সার্বক্ষণিকভাবেই ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। একদিন রাসূল ﷺ তাঁর ঘরে প্রবেশ করে দেখলেন জুয়াইরিয়া তাসবীহ পাঠ করছেন। রাসূল ﷺ বললেন, 'তুমি কি সব সময় এ আমল কর?' তিনি উত্তর দিলেন, 'জি হ্যাঁ।'

একদিন ভোরে জুয়াইরিয়া (রা) মসজিদে বসে দু'আ করছিলেন। এ অবস্থায় রাসূল ﷺ তাঁকে দেখলেন এবং চলে গেলেন। দুপুরে ফিরে এসে রাসূল ﷺ তাঁকে সেই অবস্থায় দেখতে পেলেন।

ইবনে সা'আদ বর্ণনা করেন যে, জুমু'আর দিন নবীজী জুয়াইরিয়ার কাছে যান। সেদিন তিনি সিয়াম পালনরত ছিলেন। নবীজী যেহেতু একটা রোযা রাখাকে মাকরূহ মনে করতেন, তাই জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি গতকাল সিয়াম রেখেছিলে?' বললেন, 'না। নবীজী পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, আগামীকাল রাখবে? বললেন, না। নবীজী বললেন, তাহলে সিয়াম ভেঙ্গে ফেল।

রাসূল ﷺ জুয়াইরিয়াকে খুব ভালবাসতেন। একবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'ঘরে খাবার কিছু আছে কি? জুয়াইরিয়া বললেন, আমার এক দাসী ছদকার কিছু গোশত দিয়েছে, তাই আছে। এ ছাড়া আপাতত অন্য কিছু নেই। রাসূল ﷺ বললেন, তাই নিয়ে এসো। কারণ, যাকে ছদকা দেয়া হয়েছে, তার কাছে তা পৌঁছেছে।'

হাদীস বর্ণনায় তাঁর অবদান

এ পুণ্যবতী মহিলা রাসূল ﷺ থেকে অল্প কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর, জাবের, আবূ আইয়ুব মারাসী, তোফায়েল, মুজাহিদ, কুলছুম ইবনে মুসতালিক, কুরাইব এবং আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুযুর্গ মহিলা সাহাবী। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে তিনি ৭টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে ইমাম বুখারী একটি ও মুসলিম ২টি হাদীস নিজ নিজ গ্রন্থে সংকলন করেছেন।

তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীসের কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

١. اِنَّ عُبَيْدَ بْنِ السَّبَّاكِ قَالَ : اِنَّ جُوَيْرِيَةَ (رضى) زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ : هَلْ مِنْ طَعَامٍ ؟ قَالَتْ : لاَ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ . مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ اِلاَّ عَظْمٌ مِنْ شَاةٍ اَتَيْتُهُ مَوْلاَتِىْ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ : قَرِّبِيْهِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا .

১. উবাইদা ইবনে সাববাক (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ-এর স্ত্রী জুয়াইরিয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা তাঁর কাছে এসে বললেন : তোমার কাছে কোন খাবার আছে কি? তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমার দাসীকে দেয়া সাদকার বকরীর কিছু গোশত ছাড়া আমাদের কাছে আর কিছুই নেই। নবী ﷺ বললেন : তাই নিয়ে এসো, কারণ সাদকা তার নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে গিয়েছে। (মুসলিম)

٢. عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ جُوَيْرِيَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بَكْرَةً حِيْنَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِىَ فِىْ مَسْجِدِهَا ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ اَنْ اَضْحٰى وَهِىَ جَالِسَةٌ . قَالَ : مَا زِلْتَ عَلَى الْحَالِ حَتّٰى فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ النَّبِىُّ : لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ

أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَوُوْزِنَتْ بِمَا قُلْتُ مُنْذُ الْيَوْمَ لَوَزِنَتْهُنَّ : سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَ رِضٰى نَفْسِهِ وَ زِنَةَ عَرْشِهِ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ ـ

২. ইবনে আব্বাস (রা) জুয়াইরিয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ একদা খুব ভোরে ফজরের সালাত পড়ে তাঁর নিকট থেকে বের হলেন। আর তিনি তখন তাঁর সিজদার স্থানেই ছিলেন। অত:পর নবী করীম ﷺ দুপুর বেলায় ফিরে এসে দেখেন তিনি সিজদার স্থানেই বসা। নবী করীম ﷺ বললেন : তোমাকে যে অবস্থায় রেখে গিয়েছি সে অবস্থায় আছো। তিনি বললেন, হ্যাঁ। নবী করীম ﷺ বলেছেন : নিম্নের এ চার শব্দের দু'আ টি যদি তুমি তিনবার করে বলতে তা হলে এ যাবৎ তুমি যা বলেছো তার সাথে এটা ওযন করা যেতো।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَ رِضٰى نَفْسِهِ وَ زِنَةَ عَرْشِهِ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ ـ

(মুসলিম)

٣. عَنْ جُوَيْرِيَةَ (رضى) قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ حَرِيْرٍ اَلْبَسَهُ اللّٰهُ ثَوْبًا مِّنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

৩. জুয়াইরিয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি রেশমী কাপড় পরবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে আগুনের পোশাক পরাবেন। (মুসলিম)

ওফাত : আমীর মু'আবিয়ার শাসনামলে ৬৫ বছর বয়সে জুয়াইরিয়া (রা) ইন্তেকাল করেন। সময়টা ছিল হিজরী ৫০ সালের রবিউল আউয়াল মাস। মদীনার তৎকালীন গর্ভনর মারওয়ান ইবনুল হাকাম তাঁর জানাযার সালাত পড়ান। তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত করা হয়।

১৭. উম্মুল মু'মিনীন উম্মু হাবীবা (রা)

রাসূল ﷺ-এর পবিত্র স্ত্রীগণ হলেন মু'মিনদের জন্য মাতৃতুল্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন–

اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗۤ اُمَّهَاتُهُمْ ـ

নবী মু'মিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ আর তার স্ত্রীগণ তাদের মাতা (সূরা–৩৩ আহযাব : আয়াত-৬)

তাই মু'মিনদের মাতা ও রাসূল ﷺ-এর পবিত্র স্ত্রীগণ জান্নাতে যাবে এটাই স্বাভাবিক। যাদের সাথে রাসূল ﷺ-এর দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত হয়েছে তারা জাহান্নামে যাবে আর রাসূল ﷺ জান্নাতে থাকবেন এটা অসম্ভব কথাও বটে। তাই রাসূল ﷺ-এর সাথে তাদের সম্পর্কের কারণেই তারা জান্নাতে যাবেন, এটাই দলিল তাদের জান্নাতে যাওয়ার।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন উম্মু হাবীবা (রা)-কে বিয়ে করেন তখন নিম্নের এ আয়াতটি নাযিল হয়–

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً ـ

অর্থ : যারা তোমাদের শত্রু আল্লাহ তাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সম্ভবতঃ বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন। (সূরা–৬০ মুমতাহিনা : আয়াত-৭)

নাম ও পরিচয় : তাঁর আসল নাম রামলা। কারো কারো মতে 'হিন্দ'। ডাক নাম উম্মু হাবীবা। পিতার নাম আবূ সুফিয়ান। মাতার নাম সুফিয়া বিনতে আবুল আস। তিনি ওসমান (রা)-এর ফুফু ছিলেন। অর্থাৎ ওসমান (রা) ছিলেন উম্মু হাবীবা (রা)-এর আপন ফুফাতো ভাই। উম্মু হাবীবাহ নবুওয়্যাতের ১৭ বছর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন।

বংশ : তাঁর বংশ তালিকা হল, রামলা বিনতে আবূ সুফিয়ান সখর ইবনে হারব ইবনে উমাইয়া ইবনে আবদে শামস। পিতা-মাতা উভয়েই কুরাইশ বংশের লোক ছিলেন। পিতা আবূ সুফিয়ান তো ছিলেন ইসলামের প্রধান শত্রু এবং বিখ্যাত কুরাইশ নেতা।

প্রথম বিবাহ : তিনি মক্কার শ্রেষ্ঠ সুন্দরীদের অন্যতম ছিলেন। যে কারণে পিতা আবূ সুফিয়ান গর্ব করে বলতেন, 'আমার নিকট রয়েছে সারা আরবের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী লাবণ্যময়ী নারী (উম্মু হাবীবা)।' আবূ সুফিয়ান তাই অনেক দেখাশোনা, খোঁজ খবরের পর বনু আসাদ গোত্রের সুদর্শন পুরুষ ওবায়দুল্লাহ বিন জাহাশের সাথে উম্মু হাবীবার বিয়ে দেন। ওবায়দুল্লাহ বিন জাহাশ খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি উম্মুল মু'মিনীন যয়নব বিনতে জাহাশ (রা)-এর ভাই ছিলেন।

ইসলাম গ্রহণ : নবুওয়্যাতের প্রথম যুগেই উম্মু হাবীবাহ ও স্বামী ওবায়দুল্লাহ ইসলাম কবুল করেন। মক্কায় কাফেরদের অত্যাচারে টিকতে না পেরে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে হাবশায় হিজরত করেন। এই হাবশাতেই তাঁদের কন্যা হাবীবা জন্মগ্রহণ করেন। এ হাবীবার নামেই তাঁকে উম্মু হাবীবা বলা হয় এবং এ নামেই তিনি পরিচিত হয়ে আছেন।

প্রথম স্বামীর মৃত্যুবরণ : হাবশাতে আসার পর স্বামী ওবায়দুল্লাহর ভেতর ধীরে ধীরে পরিবর্তন দেখা দেয়। ইসলাম গ্রহণের আগে ওবায়দুল্লাহ ছিলেন প্রচণ্ড মদ্যপায়ী। মদ নিষিদ্ধ হলে অন্যান্যদের মত তিনি তা ত্যাগ করেন। কিন্তু হাবশা আসার পর ওবায়দুল্লাহ আবার মদ পান শুরু করেন। উম্মু হাবীবা স্ত্রী হিসেবে তাকে এ পথ থেকে ফেরানোর প্রাণপণ চেষ্টা করেন। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। এক রাতে উম্মু হাবীবা তাঁর স্বামীকে বিভৎস অবস্থায় স্বপ্নে দেখেন।

এরপর তিনি স্বামীকে ভয় দেখিয়ে সাবধান করার চেষ্টা করেন কিন্তু উল্টো ওবায়দুল্লাহ তাঁকে বলেন, 'উম্মু হাবীবা, ধর্মের ব্যাপারে চিন্তা করে বুঝলাম, খ্রিস্টবাদের চেয়ে উত্তম কোনো ধর্ম নেই। আমি ইতোপূর্বে মুসলমান হলেও এখন পুনরায় খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছি।' এরপর উম্মু হাবীবা তাকে তিরস্কার করলেন কিন্তু কিছুই হলো না, সে খ্রিস্টান হয়ে গেল এবং একদিন মাত্রাতিরিক্ত মদ পান করার কারণে মৃত্যুবরণ করে।

নি:স্ব উম্মু হাবীবা : ওবায়দুল্লাহর মৃত্যুর পর থেকে উম্মু হাবীবা সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ হয়ে যান এবং মানবেতর জীবন যাপন করতে থাকেন। এ সংবাদ রাসূল

Contents

ﷺ-এর নিকট পৌঁছলে, ইসলামের জন্য উম্মু হাবীবার ত্যাগের কথা চিন্তা করে তিনি খুবই বিচলিত হন।

রাসূল ﷺ-এর প্রস্তাব : পরে সব দিক বিবেচনা করে বিয়ের প্রস্তাবসহ আমর ইবনে উমাইয়া যাসিরীকে হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশীর কাছে পাঠান। বাদশাহ নাজ্জাশী নিজের দাসী আবরাহার মাধ্যমে এ প্রস্তাব উম্মু হাবীবার নিকট পৌঁছান। প্রস্তাব পেয়ে উম্মু হাবীবা এতই খুশি হন যে, তিনি আবরাহাকে দু'টি রূপার চুড়ি, পায়ের দু'টি মল এবং দু'টি রূপার আংটি উপহার দেন। উম্মু হাবীবা নিজের পক্ষ থেকে খালিদ ইবনে সাঈদকে উকিল নিয়োগ করেন।

বিবাহ সম্পন্ন : বাদশাহ নাজ্জাশী সন্ধ্যায় স্থানীয় সকল মুসলমান এবং জাফর ইবনে আবূ তালিবকে ডেকে বিবাহ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। বাদশাহর পক্ষ থেকে মোহরানা হিসেবে ৪০০ দেরহাম বা দীনার আদায় করা হয়। উল্লেখ্য যে, এরপর বাদশাহ নাজ্জাশী নিজেই বিয়ে পড়ান। এই বিয়েতে কিছু খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

হিজরী ৬ অথবা ৭ সালে এ বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। বিয়ের সময় উম্মু হাবীবা (রা)-এর বয়স হয়েছিল ৩৬/৩৭ বছর। বিয়ের পর উম্মু হাবীবা জাহাজ যোগে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। জাহাজ যখন মদীনায় পৌঁছে তখন রাসূল ﷺ খায়বার অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন এবং সেখানে অবস্থান করছিলেন।

বিয়ে করার কারণ : রাসূল ﷺ উম্মু হাবীবাকে মূলত দু'টো কারণে বিয়ে করেছিলেন।

প্রথমত স্বামীর মৃত্যু হওয়ার পর বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে উম্মু হাবীবা প্রচণ্ড কষ্টের মধ্যে দিন যাপন করছিলেন। তার কষ্ট ছিল ইসলামের প্রতি মহব্বতের কারণে। তিনি স্বামীর মতই পুনরায় খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে পারতেন কিন্তু তিনি তা করেন নি। বরং স্বামীর এ ধরনের প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁর এ ত্যাগের পুরস্কার হিসেবে রাসূল ﷺ তাঁকে বিয়ে করেন।

দ্বিতীয়ত আবূ সুফিয়ান ছিলেন সে কুরাইশ নেতা যিনি আবূ জেহেলের মৃত্যুর পর ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। নবুওয়্যাতের সে প্রথম দিন থেকেই আবূ সুফিয়ান রাসূল ﷺ ও মুসলমানদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন ও জুলুমের বন্যা প্রবাহিত করেছে। বলা যায়, মানুষের পক্ষে

যত প্রকার পন্থা অবলম্বন করা সম্ভব আবূ সুফিয়ান তার কোনটিই ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে ছাড়েনি।

বিয়ের ফলাফল : ইসলাম ও মুসলমানদের এ জাত শত্রুরই কন্যা ছিলেন উম্মু হাবীবা (রা)। এ জন্য রাসূল ﷺ রাজনৈতিক কারণে সুদূর প্রসারী চিন্তা-ভাবনা করেই উম্মু হাবীবাকে বিয়ে করেন। ঐতিহাসিক ফলও পাওয়া যায়। আবূ সুফিয়ান ক্রমে নরম হতে থাকেন এবং মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম কবুল করেন।

তাঁর ঈমানের বলিষ্ঠতা : উম্মু হাবীবার চরিত্র মাধুর্যে উম্মু হাবীবা (রা) ছিলেন নেককার ও বলিষ্ঠ ঈমানের অধিকারিণী। তিনি ঈমান ও ইসলামের ব্যাপারে কারো সাথে সমঝোতা করতে বা সামান্য দুর্বলতা দেখাতেও রাজি ছিলেন না। এর প্রমাণ তো আমরা তাঁর স্বামী ওবায়দুল্লাহ যখন পুনরায় খ্রিস্টান হন তখনই পেয়েছি।

অন্যদিকে তাঁর পিতা আবূ সুফিয়ান একবার মদীনায় আসেন হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়সীমা বাড়ানোর জন্য। তিনি ইচ্ছে পোষণ করছিলেন যে, তাঁর কন্যা উম্মু হাবীবাকে দিয়েই রাসূল ﷺ-এর কাছে আবেদন পেশ করবেন, যাতে সহজেই তা পাস হয়। এ উদ্দেশ্যে তিনি উম্মু হাবীবার গৃহে পদার্পণ করেন।

একদা আবূ সুফিয়ান যখন মেয়ের গৃহে প্রবেশ করে বিছানায় বসতে যান তখন উম্মু হাবীবা তা উল্টে দেন। ঘটনার আকস্মিকতায় আবূ সুফিয়ান খুব অপমানবোধ করেন এবং বলেন, 'তুমি এ বিছানায় নিজের পিতাকেও বসতে দিবে না?' উম্মু হাবীবা বললেন, 'একজন মুশরিক রাসূল ﷺ-এর বিছানায় বসুক অবশ্যই আমি তা পছন্দ করি না।' কন্যার কথা শুনে আবূ সুফিয়ান ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, 'তুমি আমার বিরুদ্ধে খুব বেশি বিগড়ে গেছ।'

উম্মু হাবীবা নিজের পিতার সাথে যে রূঢ় আচরণ করেছিলেন তা শুধুমাত্র ঈমানের তাকিদে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে।

তিনি ছোট খাট ব্যাপারেও খুব গুরুত্ব দিতেন এবং অন্যদেরকেও সে ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন ও তাকিদ দিতেন। একবার তাঁর ভাগিনা আবূ সুফিয়ান ইবনে সাঈদ ছাতু খেয়ে কুলি না করলে তিনি বললেন, 'তোমার কুলি করা উচিৎ ছিল। কারণ, নবীজী বলেছেন, আগুনে পাকানো জিনিস খেলে অযূ করতে হয়।' একবার তিনি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, প্রতিদিন যে ১২ রাকা'আত করে নফল সালাত পড়লে জান্নাতে তার জন্য ঘর তৈরি করা হবে। এরপর থেকে তিনি আর

এ সালাত ছাড়েন নি। তিনি নিজেই বলেছেন, অত:পর আমি নিয়মিত বার রাকা'আত সালাত পড়তাম।

তাঁর পিতা আবূ সুফিয়ান ইন্তেকাল করলে তিনদিন পর তিনি খোশবু চেয়ে নিয়ে হাতে মুখে মাখেন এবং বলেন, ঈমানদার নারীর জন্য তিনদিনের বেশি শোক করা জায়েয নেই, অবশ্য স্বামী ছাড়া। স্বামীর জন্য স্ত্রীর শোক করার মেয়াদ হচ্ছে চার মাস দশ দিন। নবীজীকে একথা বলতে না শুনলে এ ব্যাপারে আমার কোনো খবরই ছিল না।'

প্রথম স্বামী ওবায়দুল্লাহর ঔরসে তাঁর দু'জন সন্তান আবদুল্লাহ ও হাবীবার জন্ম হয়। যতদূর জানা যায় তার আর কোনো সন্তান হয়নি।

হাদীস শিক্ষা ও সম্প্রসারণে তাঁর অবদান

উম্মুল মু'মিনীন উম্মু হাবীবা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ ও যয়নব বিনতে জাহাশ (রা) থেকে হাদীস শিক্ষা লাভ করেন এবং পরে তা বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে ৬৫টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে দু'টি মুত্তাফাকুন আলাইহি এবং দু'টি ইমাম মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনে উতবা, সালেম ইবনে সেওয়ার হাবীবা, মু'আবিয়া ওৎবা, আবূ সুফিয়ান, আবদুল্লাহ বিন ওৎবা, সালিম বিন সাওয়াব, আবূল জিরাহ, যয়নব বিনতে আবূ সালামা, সুফিয়া বিনতে সায়বা, ওরওয়া বিন যুবায়ের, শাহার বিন হাওশাব, আবূ সালেহ আস সামান প্রমুখ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আমাদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীস পূনরুক্তিসহ সহীহ আল-বুখারীতে ৮টি, সহীহ মুসলিমে ৯টি, জামে' আত তিরমিযীতে ৪টি, সুনান আবু দাউদে ৮টি, নাসাঈতে ৩৪টি এবং ইবনে মাজায় ৮টি সংকলিত হয়েছে।

তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীসের কয়েকটি প্রামাণ্য হাদীস গ্রন্থ হতে নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

١. عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ بِنْتِ أَبِيْ سُفْيَانَ (رضى) لَمَّا جَاءَهَا نَعْيُ أَبِيْهَا دَعَتْ بِطِيْبٍ فَمَسَحَتْ ذِرَاعَيْهَا، وَقَالَتْ : وَمَا لِيْ بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ، لَوْلَآ أَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : لاَ

يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ تَحَدُّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ اِلاَّ عَلٰى زَوْجٍ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ـ

১. উম্মু হাবীবা বিনতে আবূ সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন : যখন তাঁর পিতার মৃত্যু সংবাদ তাঁর কাছে আসলো, তিনি সুগন্ধি আনতে বললেন। অতঃপর তা স্বীয় বাজুতে মাখলেন এবং বললেন : আমার কোন সুগন্ধির প্রয়োজন হতো না, যদি না আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনতাম, তিনি বলেছেন, আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী কোন নারীর জন্য বৈধ নয় কোন মৃতের জন্য তিন দিনের অধিক শোক প্রকাশ করা। তবে স্বামীর মৃত্যুতে চারমাস দশ দিন শোক প্রকাশ করা যায়। (বুখারী ২য় খণ্ড, পৃ.-৮০৪-৮০৫)

٢. عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ (رضى) تَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ صَلّٰى اِثْنَى عَشَرَةَ رَكْعَةً فِىْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِىَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ ـ قَالَتْ اُمُّ حَبِيْبَةَ فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ـ

৩. উম্মু হাবীবা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি দিবা-রাত্রী বার (১২) রাক'আত সালাত (নফল) পড়বে, জান্নাতে তাঁর জন্য একটি ঘর বানানো হবে। উম্মু হাবীবা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ হাদীস শুনার পর আমি কখনও এ সালাত ত্যাগ করিনি।

(মুসলিম ১ম খণ্ড, পৃ.-২৫১)

٣. عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ اَنَّهُ سَاَلَ اُخْتَهُ اُمَّ حَبِيْبَةَ (رضى) زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ فِى الثَّوْبِ الَّذِىْ يُجَامِعُهَا فِيْهِ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ اِذَا لَمْ يَرَ فِيْهِ اَذًى ـ

৩. মু'আবিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান (রা) তাঁর বোন উম্মু হাবীবা (রা) কে জিজ্ঞেস করলেন, যে কাপড় পড়ে নবী কারীম ﷺ স্ত্রী সহবাস করেন, সেই কাপড় পরেই

কি তিনি সালাত পড়তেন? উম্মু হাবীবা (রা) বললেন : হ্যাঁ, যখন ঐ কাপড়ে নাপাকীর কোন চিহ্ন দেখা না যেতো। (আবু দাউদ, ১ম খণ্ড, পৃ.-৫৩)

٤. عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ (رضى) زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : كُلُّ كَلاَمِ ابْنِ اٰدَمَ عَلَيْهِ لاَ لَهُ اِلاَّ اَمْرَ بِهَا بِمَعْرُوْفٍ اَوْ نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ ذِكْرُ اللّٰهِ ـ

৪. সাফিয়্যা বিনতে শায়বা (রা) উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : বনু আদমের প্রতিটি কথাই তার বিপক্ষে যাবে তবে সৎকাজে আদেশ, অসৎ কাজে নিষেধ এবং যিকরুল্লাহ বা আল্লাহর স্মরণ ব্যতীত। (মুসলিম)

٥. عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ (رضى) اَنَّهَا حَدَّثَتْهُ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ ـ

৫. উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যদি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর না হতো তবে আমি তাদেরকে আদেশ দিতাম প্রতি সালাতে মিসওয়াক করার জন্য।

(মুসলিম : হাদীস নং-৫৮৯)

ওফাত : আপন ভাই আমীর মু'আবিয়ার শাসন আমলে হিজরী ৪৪ সালে ৭৩ বছর বয়সে উম্মু হাবীবা (রা) ইন্তেকাল করেন। মদীনায় তাঁকে দাফন করা হয়। অন্য এক বর্ণনা থেকে জানা যায়, তাঁকে আলী (রা)-এর গৃহে দাফন করা হয়। এর প্রমাণ হলো জয়নুল আবেদীন (রা) তার গৃহ খননকালে একটি শিলা লিপি পান, তাতে লেখা ছিল, এটা রামলা বিনতে সাখর-এর কবর।

মৃত্যুর আগে তিনি আয়েশাকে (রা) ডেকে বলেন, 'আমার এবং আপনার মধ্যে সতীনের মতো সম্পর্ক ছিল। কোনো ভুলত্রুটি হয়ে থাকলে মাফ করে দেবেন এবং আমার মাগফেরাতের জন্য দু'আ করবেন। আয়েশা দু'আ করলে তিনি পুনরায় বললেন, আপনি আমাকে খুশি করেছেন, আল্লাহ আপনাকে খুশি করুন।'

১৮. উম্মুল মু'মিনীন সফিয়্যা (রা)

রাসূল(ﷺ)-এর পবিত্র স্ত্রীগণ হলেন মু'মিনদের জন্য মাতৃতুল্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন–

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗٓ اُمَّهٰتُهُمْ ـ

নবী মু'মিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ আর তার স্ত্রীগণ তাদের মাতা (সূরা–৩৩ আহযাব : আয়াত-৬)

তাই মু'মিনদের মাতা ও রাসূল(ﷺ)-এর পবিত্র স্ত্রীগণ জান্নাতে যাবে এটাই স্বাভাবিক। যাদের সাথে রাসূল(ﷺ)-এর দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত হয়েছে তারা জাহান্নামে যাবে আর রাসূল(ﷺ) জান্নাতে থাকবেন এটা অসম্ভব কথাও বটে। তাই রাসূল(ﷺ)-এর সাথে তাদের সম্পর্কের কারণেই তারা জান্নাতে যাবেন, এটাই দলিল তাদের জান্নাতে যাওয়ার।

নাম ও পরিচয় : তাঁর প্রকৃত নাম যয়নব। প্রসিদ্ধ নাম সফিয়্যা। আরবের প্রথা অনুযায়ী যুদ্ধলব্ধ মাল বন্টনের সময় যে উৎকৃষ্ট বা উত্তম মাল দলপতির জন্য রাখা হতো তাকে সফিয়্যা বলা হতো। খায়বার যুদ্ধে প্রাপ্ত সকল কিছুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন যয়নব। শেষ পর্যন্ত এ যয়নবকে রাসূল (ﷺ)-এর ভাগে দেয়া হয়। এজন্য তাঁর নামকরণ করা হয় সফিয়া এবং এ নামেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল হুওয়াই ইবনে আখতাব। তিনি ছিলেন হারুন ইবনে ইমরান (عليه السلام)-এর অধস্তন পুরুষ।

বংশ : তাঁর বংশ তালিকা হল– যয়নব বিনতে হুওয়াই ইবনে আখতাব ইবনে সাঈদ ইবনে আমের ইবনে ওবাইদ ইবনে কা'আব ইবনুল খাযরাজ ইবনে আবূ হাবীব ইবনে নুছাইর ইবনে নাহহাম ইবনে মাইখুম। তাঁর মায়ের নাম ছিল বাররা বিনতে সামওয়ান। এ সামওয়ান ইয়াহূদীদের সর্বশ্রেষ্ঠ গোত্র বনু কুরাইযার নেতা ছিলেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে সফিয়্যা (রা)-এর পিতৃকুল নযীর ও মাতৃকুল বনু কুরাইযার ইয়াহূদীদের এক বংশে গিয়ে মিলিত হয়েছে।

পারিবারিক অবস্থান : সফিয়্যা (রা)-এর আব্বা ও দাদা উভয়েই ছিলেন তৎকালীন ইয়াহূদী জাতির সম্মানিত ও মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ। যে কারণে বনী ইসরাঈলের সমস্ত আরবীয় গোত্রের মধ্যে তাদেরকে আলাদা রকম সম্মান করা হতো। বিশেষ করে তাঁর বাবা হুওয়াই ইবনে আখতাবকে মর্যাদার শীর্ষে স্থান দেয়া হয়েছিল। ইয়াহূদীরা বিনা বাক্যে তাঁর নেতৃত্ব মেনে চলতো। তাঁর নানা সামওয়ান মান মর্যাদা শৌর্য বীর্য এবং বীরত্বের দিক দিয়ে সারা জাযিরাতুল আরবে ছিলেন সম্মানিত। অর্থাৎ সফিয়া (রা) ছিলেন সব দিক দিয়েই বিশিষ্টতার অধিকারিণী।

প্রথম বিবাহ : সফিয়্যা (রা)-এর প্রথম বিয়ে হয় আরবের প্রখ্যাত কবি ও সর্দার সালাম ইবনে মিশকাম আল কারাবীর সাথে। প্রথম দিকে তাদের দাম্পত্য জীবন সুখের হলেও পরবর্তীতে মনোমালিন্য ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। ফলে সফিয়্যা (রা) পিতৃগৃহে ফিরে আসেন।

দ্বিতীয় বিবাহ : এরপর কেনানা ইবনে আবূল আফীক-এর সাথে তাঁর দ্বিতীয় বিয়ে হয়। আবূল আফীক ছিলেন খায়বারের নামকরা দুর্গ আল-কামুদ-এর সর্দার। এ সময় তাঁর বয়স ছিল সতের বছর।

পিতা ও চাচার মৃত্যু : তাঁর পিতা ও চাচা আবূ ইয়াসির রাসূল ﷺ-এর চরম শত্রু ছিল। তারা মদীনা থেকে বিতাড়িত হয়ে চতুর্থ হিজরীতে খায়বারে গিয়ে কিনানা ইবনে আল রাবীর সাথে বসবাস করতে থাকেন। এখানে বসেই হুওয়াই ইবনে আখতাব মুসলমানদের ক্ষতি করার সর্বপ্রকার চেষ্টা করতে থাকে।

পরবর্তীতে রাসূল ﷺ-এর নেতৃত্বে খায়বার অভিযানকালে মুসলমানদের হাতে আলকামূস দুর্গের পতন ঘটে। যুদ্ধে ইয়াহূদীদের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। বহু নেতৃস্থানীয় ইয়াহূদী মৃত্যুবরণ করে। কেনানা ইবনে আবূল আফীক দুর্গের অভ্যন্তরে নিহত হন। এমন কি তাঁর পিতা হুওয়াই ইবনে আখতাবও নিহত হন। সফিয়্যা অন্যান্য পরিবার-পরিজনদের সাথে বন্দী হন।

বন্দীনী সফিয়্যা : সফিয়্যা বন্দীনী হিসেবে মুসলিম শিবিরে আসার পর আরবের নিয়ম অনুযায়ী সাহাবী দাহইয়া কলবীর আবেদন মোতাবেক তাঁকে তাঁর ভাগে দিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু সফিয়্যা (রা) তাঁর মর্যাদার দিক বিবেচনা করে সাহাবী দাহইয়া কালবীর ঘরে যেতে অস্বীকার করেন। এ সময়ে কতিপয় সাহাবী আরজ করেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ সফিয়্যা বনু কুরাইযা এবং বনু নজীরের মহিলা। এ

নেতৃস্থানীয়া মহিলাকে দাহ্ইয়ার হস্তে বাঁদী হিসেবে সমর্পণ করলেন? তাঁর মর্যাদা তো অনেক উঁচুতে আসীন। তিনি আমাদের নেতার জন্যই যথোপযুক্ত।'

রাসূল ﷺ সাহাবীদের আবেদন কবুল করলেন এবং দাহ্ইয়া কালবীকে অন্য একজন পরিচারিকা দান করলেন। সফিয়্যাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করে দিলেন।

রাসূলের নিকট আশ্রয় চাওয়া : সফিয়্যা কোথাও যেতে রাজি হলেন না। তিনি রাসূল ﷺ-এর কাছে বিনীত আরজ করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! খায়বার যুদ্ধে আমার পিতা এবং স্বামী নিহত হয়েছেন। আমার নিকটতম আত্মীয়-স্বজনরাও যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে। আর আমি ইয়াহূদী ধর্ম ত্যাগ করে পবিত্র ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছি। বর্তমানে আমার ইয়াহূদী আত্মীয়-স্বজন যারা বেঁচে আছে তাদের কেউই আমাকে আশ্রয় দেবে না এবং গ্রহণও করবে না। এ আশ্রয়হীন অবস্থায় আমি কোথায় যাবো? কে আমার এ অসহায় অবস্থার সহায়ক হবে? কে আমাকে স্থান দিবে? ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আর কোথাও যাবো না, আমি আপনার অন্তঃপুরে একজন দাসী হয়ে থাকতে চাই। আপনি আমাকে আশ্রয় প্রদান করুন।'

রাসূলের সাথে বিবাহের আকাঙ্খা : খায়বার যুদ্ধ বিজয়ের পর সফিয়া (রা) বন্দী হয়ে আসলে এক সময় তাকে রাসূল জিজ্ঞেস করলেন, আমার ব্যাপারে তোমার কোন আগ্রহ আছে কি? তিনি উত্তরে বললেন, শিরকের মধ্যে নিমজ্জিত থাকার সময় আমি এ আশা পোষণ করতাম। সুতরাং ইসলাম গ্রহণের দ্বারা আল্লাহ আমাকে আপনার সাহচর্য লাভের যে সুযোগ দিয়েছেন, সে সুযোগ আমি কীভাবে হারাতে পারি? অন্য বর্ণনায় এসেছে, সফিয়্যা (রা) যখন রাসূলের নিকট আসলেন, তখন তিনি বললেন, তোমার পিতা ইহুদী ছিলেন, যে আমার প্রতি শত্রুতা পোষণ করত। অবশেষে আল্লাহ তাকে নিহত করলেন। তখন সফিয়্যা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তাঁর কিতাবে বলেছেন—

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرٰى

অর্থ: 'একজনের (পাপের) বোঝা অন্যের ওপর চাপানো হবে না'।

(আন'আম ১৬৪; ইসরা ১৫; ফাতির ১৮; যুমার ৭; নাজমা ৩৮)।

তখন রাসূল ﷺ বললেন, তুমি যা পছন্দ কর, বেছে নেও। যদি তুমি ইসলামকে পছন্দ কর, তাহলে আমি তোমাকে আমার জন্য রেখে দিব। আর যদি তুমি ইহুদী ধর্ম মতকে পছন্দ কর, তাহলে আমি তোমাকে মুক্ত করে দেব, যাতে তুমি

তোমার কওমের সাথে মিলিত হতে পার। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইসলামকে ভালবেসেছি, আপনি আমাকে দাওয়াত দেওয়ার পূর্বেই আমি আপনাকে সত্য বলে স্বীকার করেছি, এমনকি আমি আপনার সওয়ারীতে চড়েছি। ইহুদী ধর্মের প্রতি আমার কোন আকর্ষণ বা অনুরাগ নেই। আর সেখানে আমার পিতা, ভাই, কেউ নেই। আপনি কুফরী বা ইসলাম যে কোনটি গ্রহণের এখতিয়ার দিয়েছেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলেই আমার নিকট অধিক প্রিয় স্বাধীন হওয়ার চেয়ে এবং আমার কওমের নিকট ফিরে যাওয়ার চেয়ে। তখন তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের জন্য রেখে দিলেন।

সফিয়্যাকে বিবাহের কারণ : বিভিন্ন কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ সফিয়্যাকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ–

১. আত্মীয়-স্বজন, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী নিহত এবং নিজেও স্বীয় ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ হওয়ায় সফিয়্যা শোক বিহ্বল ছিলেন। তার শোকাহত হৃদয়কে শান্ত করা ও তাকে দ্বীন ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ বিবাহ করেন।

২. এ বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে বনু নাযীর ও বনু কুরায়জার বিরোধিতা ও শত্রুতা হ্রাসকরণ এবং প্রশমনের অভিপ্রায়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ সফিয়্যাকে বিবাহ করেন। যা পরবর্তীতে বাস্তবায়িত হয়েছিল।

৩. সফিয়্যার যথাযথ সম্মান বজায় রাখা এবং এ নজীরবিহীন ইহসানের প্রতি লক্ষ্য করে ইহুদী সম্প্রদায় যাতে আল্লাহদ্রোহিতা থেকে ফিরে এসে ইসলাম কবুল করতে অনুপ্রাণিত হয়, এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ সফিয়্যাকে বিবাহ করেন।

রাসূলের সাথে বিয়ে : সবদিক বিবেচনা করে রাসূল ﷺ সফিয়্যা (রা)-এর আবেদন মঞ্জুর করলেন এবং খায়বার থেকে মদীনায় ফেরার পথে 'যাবাহা' নামক স্থানে তাকে বিবাহ করেন। এটা ছিল হিজরী সপ্তম সালের মহররম মাসের শেষ সপ্তাহ। এ বিয়েতে অলিমা অনুষ্ঠান অর্থাৎ খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এ ব্যাপারে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার সৈয়দ আমীর আলী লিখেছেন, 'ইয়াহূদী রমণী সফিয়্যাকে খায়বারের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় মুসলমানরা বন্দী হিসেবে এনেছিলেন। তাকেও মুহাম্মদ ﷺ উদারতার সঙ্গে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং তাঁর সনির্বন্ধ অনুরোধের জন্য তাঁকে স্ত্রীত্বে বরণ করেছিলেন।

এ বিয়ের ফলে আশ্রয়হীনা সফিয়্যা (রা) সুন্দর ও সর্বোত্তম আশ্রয় লাভ করেন। সাথে সাথে এ বিয়ের ফলে ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষোভের কিছুটা প্রশমন হয়। এমনকি ধীরে ধীরে ইয়াহূদীদের অনেকেই ইসলাম কবুল করেন।

সফিয়্যা (রা) সুন্দরী ও লাবণ্যময়ী ছিলেন। যে কারণে মদীনায় আসলে তাঁকে দেখার জন্য মহিলাদের ভীড় পড়ে যায়। এমনকি যয়নব বিনতে জাহাশ, হাফসা, আয়েশা এবং জুয়াইরিয়া (রা) তাঁকে দেখতে আসেন। দেখা শোনার পর সকলে যখন চলে যান তখন রাসূল ﷺ আয়েশা (রা)-কে একা পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আয়েশা, তাকে কেমন দেখলে? তিনি বললেন, সেতো ইয়াহূদী নারী। বললেন, এমন কথা বলবে না। সে তো মুসলমান হয়েছে। এখন ইসলামে সে উত্তম।'

স্বভাব-প্রকৃতি : সফিয়্যা (রা) ছিলেন ধীরস্থির মেজাজের চমৎকার একজন মহিলা। জনৈক দাসী অভিযোগ করলেন, তাঁর মধ্যে এখনও ইয়াহূদীদের গন্ধ পাওয়া যায়। কারণ সে এখনো শনিবারকে ভালবাসে। এছাড়া ইয়াহূদীদের সাথে এখনও তাঁর সম্পর্ক আছে। ওমর (রা) যখন অন্য লোকের মাধ্যমে বিষয়টি যাচাই করতে চান, তখন তিনি বলেন, 'শনিবারের পরিবর্তে আল্লাহ যখন শুক্রবার দিয়েছেন তখন আর শনিবারকে ভালবাসার কোন প্রয়োজন নেই।' ইয়াহূদীদের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে বলেন, 'ইয়াহূদীদের সঙ্গে তো আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক। আত্মীয়তার প্রতি আমাকে লক্ষ্য রাখতে হয়।' অতঃপর দাসীকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন-কে তোমাকে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছে? সে বললো, শয়তান। এটা শুনে সফিয়্যা (রা) চুপ থাকেন এবং দাসীকে মুক্ত করে দেন।

আল্লামা ইবনে আবদুল বার সফিয়্যা (রা)-এর স্বভাব প্রকৃতি সম্বন্ধে লিখেছেন, 'সুফিয়্যা ছিলেন বুদ্ধিমতী, মর্যাদাশীলা এবং ধৈর্যের অধিকারিণী।'

আল্লামা ইবনে কাসীর লিখেছেন, 'রাসূল ﷺ-এর স্ত্রীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতি।' রাসূল ﷺ সফিয়্যাকে খুব ভালবাসতেন এবং তাঁর সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টির খোঁজ খবর রাখতেন।

সফিয়্যা-যয়নব-আয়েশার সাময়িক দ্বন্দ্ব : একবার সফরকালীন সময়ে সফিয়্যার উটটি অসুস্থ হয়ে পড়ে। এ সময়ে যয়নব (রা)-এর সাথে একটি অতিরিক্ত উট ছিল। রাসূল ﷺ তাই যয়নবকে বললেন, যয়নব! তোমার

অতিরিক্ত উটটি সফিয়্যার সাহায্যের জন্য দাও। যয়নব বললেন, 'এ ইয়াহূদীর মেয়েকে আমি উট দিব না।' এ কথায় রাসূল ﷺ খুবই রাগ করলেন এবং একাধারে দুই মাস যয়নবের (রা)-এর সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রাখেন। পরবর্তীতে আয়েশা (রা)-এর মধ্যস্থতায়-এর পরিসমাপ্তি ঘটে।

অন্য একদিন রাসূল ﷺ গৃহে ফিরে দেখলেন সফিয়্যা কাঁদছেন। কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, 'আয়েশা এবং যয়নব বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহর স্ত্রী এবং বংশ গৌরবের দিক থেকে এক রক্তধারার অধিকারিণী। সুতরাং আমরাই শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। রাসূল ﷺ বললেন, 'তুমি কেন বললে না, আমি আল্লাহ্র নবী হারুনের বংশধর ও মূসার ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং রাসূল ﷺ আমার স্বামী। অতএব তোমরা কোন দিক থেকে আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হতে পারো?'

উদারতা : দয়া দক্ষিণার ক্ষেত্রেও তাঁর উদার হাত ছিল। তিনি যখন প্রথম মদীনায় আসেন ও রাসূল ﷺ-এর অন্তপুরে প্রবেশ করেন তখন তাঁর সর্বাঙ্গে বহু মূল্যবান স্বর্ণালঙ্কার ছিল। তিনি সেসব অলঙ্কার নবী নন্দিনী ফাতিমা ও অন্যান্য উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের মধ্যে ভাগ-বন্টন করে দেন।

ওসমান (রা) ৩৫ হিজরীতে বিদ্রোহীদের দ্বারা অবরুদ্ধ হন। বিদ্রোহীরা প্রয়োজনীয় রসদপত্র এমন কি পানি সরবরাহ পর্যন্ত বন্ধ করে দেয়। এমতাবস্থায় সফিয়্যা (রা) ঘর থেকে বের হয়ে পড়েন এবং কিছু রসদপত্রসহ ওসমান (রা)-এর গৃহের উদ্দেশ্যে খচ্চরে চেপে বসেন। কিন্তু পথিমধ্যে বিদ্রোহীরা তাঁর খচ্চরটিকে আক্রমণ করে বসলে তিনি বলেন তোমরা আমাকে এভাবে অপমান করো না। আমি যাচ্ছি।' এরপর তিনি গৃহে ফিরে আসেন এবং হাসান (রা)-কে দিয়ে দ্রব্য সামগ্রী পৌঁছে দেন। পরে যে ক'দিন ওসমান (রা) অবরুদ্ধ ছিলেন হাসান (রা)-কে দিয়েই প্রয়োজনীয় সব জিনিসপত্র পাঠিয়ে দিতেন।

এখান থেকে পরিষ্কার হয় সফিয়্যা (রা) কত বড় দায়িত্ববোধ সম্পন্ন মহিলা ছিলেন। তিনি অসম্ভব সুন্দর রান্না করতে জানতেন। এমন কি এ ক্ষেত্রে আয়েশাও (রা) তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না।

সফিয়্যা (রা) লেখাপড়া জানা মহিলা ছিলেন। তিনি প্রায়ই তাঁর ইয়াহূদী আত্মীয়-স্বজনের কাছে ইসলামের সুমহান আদর্শ তুলে ধরে চিঠি লিখতেন। আর এ দাওয়াতী কাজের ফলে অনেকেই ইসলাম কবুল করেন।

তিনি ইসলামী জ্ঞানের ক্ষেত্রে একজন অসাধারণ মানুষ ছিলেন। এ জন্য অনেকে তাঁর কাছ থেকে মাসয়ালা মাসায়েল জানতে চাইতেন ও জেনে নিতেন। ছহীরা বিনতে হায়দার হজ্জব্রত পালন করার পর সফিয়্যা (রা)-এর সাথে দেখা করতে এসে দেখেন যে, কুফার একদল মহিলা মাসআলা জিজ্ঞেস করার জন্য তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছেন আর তিনি সুন্দরভাবে সকলের জিজ্ঞাসার জবাব দিচ্ছেন।

তিনি মাত্র কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। যয়নুল আবেদীন ইসহাক ইবনে আবদুল্লাহ, মুসলিম ইবনে সাফওয়ান, কিনানা এবং ইয়াযিদ ইবনে মাআতাব প্রমুখগণ তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ওফাত : ৬০ বছর বয়সে হিজরী ৫০ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত করা হয়। তাঁর অসিয়ত অনুযায়ী মৃত্যুকালে রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ তার ভাগিনাকে দেয়া হয়। বাকী সম্পত্তি গরীব মিসকীনদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। জানা যায় মৃত্যুকালে তিনি নগদ এক লক্ষ দিরহাম রেখে যান।

১৯. উম্মুল মু'মিনীন মায়মূনা (রা)

রাসূল ﷺ-এর পবিত্র স্ত্রীগণ হলেন মু'মিনদের জন্য মাতৃতুল্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন–

اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗٓ اُمَّهٰتُهُمْ ۔

নবী মু'মিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ আর তার স্ত্রীগণ তাদের মাতা (সূরা–৩৩ আহযাব : আয়াত-৬)

তাই মু'মিনদের মাতা ও রাসূল ﷺ-এর পবিত্র স্ত্রীগণ জান্নাতে যাবে এটাই স্বাভাবিক। যাদের সাথে রাসূল ﷺ-এর দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত হয়েছে তারা জাহান্নামে যাবে আর রাসূল ﷺ জান্নাতে থাকবেন এটা অসম্ভব কথাও বটে। তাই রাসূল ﷺ-এর সাথে তাদের সম্পর্কের কারণেই তারা জান্নাতে যাবেন, এটাই দলিল তাদের জান্নাতে যাওয়ার।

নাম ও পরিচয় : পূর্বে তাঁর নাম ছিল বাররা। উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর নাম রাখা হয় মায়মূনা। তাঁর পিতার নাম হারেস এবং মাতার নাম হিন্দ বিনতে আউফ।

বংশনামা : তাঁর বংশ তালিকা হল, বাররা বিনতে হারেস ইবনে হাজন ইবনে বুযাইর ইবনে হাযাম ইবনে রোতবা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হেলাল ইবনে আমের ইবনে সা'আসা'আ ইবনে মু'আবিয়া ইবনে বকর ইবনে হাওয়াযেন ইবনে মনসুর ইবনে ইকরামা ইবনে খলিফা ইবনে কায়েস ইবনে আয়লান ইবনে মুদার। আর তাঁর মায়ের দিক দিয়ে বংশ তালিকা হল, বাররা বিনতে হিন্দ বিনতে আউফ ইবনে যাহাইর ইবনে হারেস ইবনে হামাতা ইবনে জারাশ।

মায়মূনা ছিলেন কুরাইশ বংশের হাওয়াযিন গোত্রের হারেসের কন্যা; যিনি সা'আসা'আ নামক এলাকায় বসবাস করতেন। অপরদিকে তিনি ছিলেন রাসূল

ﷺ-এর চাচা আব্বাস (রা)-এর শালিকা এবং বিশ্বখ্যাত সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদের খালা। অন্যদিকে তিনি উম্মুল ফযল লুবাবাতুস সুগরার বোন ছিলেন।

প্রথম বিবাহ : মাসউদ বিন আমর বিন উমায়ের সাকাফীর সঙ্গে তাঁর প্রথম বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু দাম্পত্য জীবনে বনিবনা না হওয়াতে মাসউদ মায়মূনাকে তালাক দেন।

দ্বিতীয় বিবাহ : পরে আবূ রহম ইবনে আবদুল্লাহর সাথে তাঁর দ্বিতীয় বিয়ে হয়। এ আবূ রহম সপ্তম হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। ফলে মায়মুনা সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে থাকেন। এমতাবস্থায় তাঁর দুলাভাই আব্বাস (রা) উদ্যোগী হয়ে রাসূলﷺ-এর নিকট বিয়ের প্রস্তাব পেশ করেন। ইসলামের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে রাসূলﷺ৫১ বছর বয়স্কা বৃদ্ধা মায়মূনাকে বিয়ে করতে রাজি হন।

রাসূলﷺ-এর সাথে বিবাহ : সপ্তম হিজরী সালের জিলক্বদ মাসে হুদায়বিয়ার সন্ধি অনুসারে রাসূলﷺ ওমরাতুল কাজা পালন করার উদ্দেশ্যে মক্কা রওয়ানা হন। এ সময় জাফর ইবনে আবূ তালিবকে মায়মুনার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে পাঠানো হয়। তিনি আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবকে উকিল নিযুক্ত করেন। রাসূলﷺ ওমরার উদ্দেশ্যে যে ইহরাম বাধেন, সেই অবস্থায় এ বিয়ে সম্পন্ন হয়। আব্বাস (রা) এ বিয়ে পড়ান। ওমরা পালন শেষে মদীনা ফেরার পথে 'সরফ' নামক স্থানে এ বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়। এ বিয়ের মোহরানা ধার্য করা হয় ৫০০ দিরহাম। কেউ কেউ বলেন মায়মূনা ছিলেন রাসূলﷺ-এর সর্বশেষ স্ত্রী। তাদের মতে রায়হানা ও মারিয়া কিবতিয়া দাসী ছিলেন স্ত্রী নয়। তবে ঘটনাচক্রে মনে হয় তারাও স্ত্রী ছিলেন। তারা রাসূলﷺস্ত্রী ছিলেন এটাই অধিক যুক্তিযুক্ত। এখানে তাদেরকে স্ত্রী হিসেবেই গ্রহণ করা হল।

বিয়ের ফলাফল : রাসূলﷺ ও মায়মূনার এ বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আব্বাস ও খালিদ বিন ওয়ালিদ ইসলাম কবুল করেন নি। মূলত এ বিয়ের ফলেই এ দু'জন বিশাল ব্যক্তিত্ব ইসলাম কবুল করেন এবং ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করেন। আসলে এ বিয়ের প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারী। এ প্রসঙ্গে স্যার সৈয়দ আমীর আলী বলেন, 'মায়মুনাকে মুহাম্মদﷺ মক্কায় বিয়ে করেছিলেন। তিনি ছিলেন তাঁর আত্মীয় ও পঞ্চাশের উর্ধ্বে ছিল তাঁর বয়স। এ বিয়ে আত্মীয়তার অবলম্বন হিসেবেই শুধু কাজ করেনি; অধিকন্তু এ ইসলামের জন্য লাভ করেছিল

দু'জন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব ইবনে আব্বাস এবং ওহুদের দুর্ভাগ্যজনক যুদ্ধে কুরাইশের অশ্বারোহী দলের সেনাপতি ও পরবর্তীকালে গ্রীক বিজেতা খালিদ বিন ওয়ালিদ।'

অনেকের ধারণা রাসূল ﷺ মায়মুনাকে বিয়ে না করলে খালিদ বিন ওয়ালিদ কোনোদিন হয়তো ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতেন না। সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, এ বিয়ে ইসলামের ও মুসলমানদের জন্য কল্যাণ বয়ে এনেছিল।

চরিত্র মাহাত্ম্য : মায়মূনা অত্যন্ত পরহেযগার একজন মহিলা ছিলেন। তিনি আল্লাহ্র ভয়ে সর্বদা কম্পিত থাকতেন এবং কান্নাকাটি করতেন। তিনি ছোটখাট আদেশ নিষেধকে সমান গুরুত্ব দিতেন। একবার এক মহিলা অসুস্থ অবস্থায় মানত করলো যে, 'সুস্থ হলে বায়তুল মুকাদ্দাস গিয়ে সালাত পড়বে। আল্লাহ তা'আলা তাকে রোগ মুক্ত করলে মানত পুরা করার উদ্দেশ্যে বায়তুল মুকাদ্দাস গমনের জন্য মায়মুনার নিকট বিদায় নিতে আসে। মায়মূনা (রা) তাকে বুঝিয়ে বলেন যে, 'অন্যান্য মসজিদে সালাত আদায়ের চেয়ে মসজিদে নব্বীতে সালাত আদায়ের সওয়াব হাজার গুণ বেশি। তুমি এখানে থেকেই মসজিদে নববীতে সালাত আদায় কর।'

তাঁর সম্পর্কে আয়েশা (রা) বলেন, 'মায়মূনা ছিলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয়কারিণী এবং আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রতি সবচেয়ে বেশি যত্নবান মহিলা।'

একবার তাঁর এক আত্মীয় বেড়াতে আসেন। কিন্তু তার মুখ দিয়ে মদের গন্ধ আসছিল। তাই মায়মুনা (রা) ক্ষেপে গিয়ে বললেন, 'ভবিষ্যতে আর কখনো আমার কাছে আসবে না।'

হাদীস শিক্ষা ও সম্প্রসারণে তাঁর অবদান

মায়মূনা (রা) রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকালের পরও দীর্ঘ দিন জীবিত ছিলেন। মহানবী ﷺ-এর অনেক হাদীসই উম্মুল মু'মিনীনদের মাধ্যমে পরবর্তীদের কাছে সম্প্রসারিত হয়েছে। মায়মুনা (রা)-এর অবদান এ ক্ষেত্রে মোটেই নগণ্য নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে তিনি হাদীস শিক্ষা লাভ করেছেন এবং তা বর্ণনাও করেছেন। ইবনুল জাওযী (র) বলেন : মায়মুনা (রা) থেকে ৭৬টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে সহীহাইন তথা সহীহ বুখারী ও মুসলিমে ১৩টি হাদীস সংকলিত

হয়েছে। ইমাম বুখারী ও মুসলিম যৌথভাবে ৭টি, ইমাম বুখারী এককভাবে ১টি এবং ইমাম মুসলিম (র) এককভাবে ৫টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আমাদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীস পুনরুক্তিসহ বুখারীতে ২১টি, মুসলিমে ১৮টি, তিরমিযীতে ৪টি, আবু দাউদে ১৫টি, নাসাঈতে ২৬টি এবং ইবনে মাজায় ১১টি সংকলিত হয়েছে। তাঁর থেকে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ, আবদুর রহমান ইবনে সায়েব, ইয়াযিদ ইবনে আছম প্রমুখ সাহাবীগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীসগুলো দ্বীন ও দুনিয়ার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বলিত।

নিম্নে তাঁর থেকে বর্ণিত কিছু হাদীস উল্লেখ করা হলো –

١. عَنْ مَيْمُوْنَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَكَلَ عِنْدَنَا كَتِفًا ثُمَّ صَلَّى وَ لَمْ يَتَوَضَّأْ ـ

১. মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর নিকট (একদা) বকরীর কাঁধের মাংশ খেলেন, অত:পর সালাত পড়লেন, কিন্তু অযু করলেন না।

٢. عَنْ مَيْمُوْنَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ فَارَةٍ سَقَطَتْ فِىْ سَمَنٍ ؟ فَقَالَ اَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوْا سَمَنَكُمْ ـ

২. মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ঘি বা মাখনে ইঁদুর পতিত হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে বললেন, ইঁদুর ও তার পার্শ্ববর্তী ঘিটুকু ফেলে দিয়ে তোমরা তোমাদের ঘি খেতে পার।

٣. عَنْ مَيْمُوْنَةَ (رضـ) قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْضَجِعُ مَعِىْ وَاَنَا حَائِضٌ وَبَيْنِىْ وَبَيْنَهُ ثَوْبٌ ـ

৩. মায়ামূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ঋতুস্রাব অবস্থায় আমার সাথে শয়ন করতেন। তাঁর ও আমার মাঝে কাপড়ের ব্যবধান থাকতো।

٤. عَنْ مَيْمُوْنَةَ (رضـ) قَالَتْ : اَدْنَيْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا، ثُمَّ اَدْخَلَ فِى الْاِنَاءِ ثُمَّ اَفْرَغَ بِهٖ عَلٰى فَرْجِهٖ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهٖ، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْاَرْضِ فَدَلَّهَا دَلْكًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ، ثُمَّ اَفْرَغَ عَلٰى رَأْسِهٖ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ مِلْأُ كَفَّيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهٖ، ثُمَّ تَنَحّٰى عَنْ مَقَامِهٖ ذٰلِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ اَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيْلِ فَرَدَّهُ.

৪. মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জানাবতের গোসল নিকট থেকে লক্ষ্য করেছি। তিনি প্রথমে দু'হাতের কব্জি দু'তিনবার ধৌত করেন। অত:পর হাত পাত্রে দিয়ে লজ্জাস্থানে পানি দেন এবং বাম হাত দিয়ে তা ভালভাবে পরিষ্কার করেন। অত:পর সালাতের ন্যায় অযূ করেন। এরপর তিন কোষ পানি মাথায় দিলেন, অতঃপর সমস্ত শরীর ধৌত করলেন। এরপর ঐ স্থান থেকে সরে এসে পা ধৌত করেন। অতঃপর আমি রুমাল নিয়ে আসি তবে তিনি তা গ্রহণ করেন নি।

٥. عَنْ مَيْمُوْنَةَ (رضـ) قَالَتْ : كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا سَجَدَ لَوْشَاءَتْ بَهِيْمَةٌ اَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ.

৫. মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন সিজ্দা দিতেন, কোন বকরীর বাচ্চা তাঁর দু'হাতের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতে চাইলে করতে পারতো।

٦. عَنْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ (رضـ) اَنَّهَا اعْتَقَتْ وَلِيْدَةً فِىْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : لَوْاَعْطَيْتِهَا اِخْوَالَكِ كَانَ اَعْظَمُ لِاَجْرِكِ.

৬. মায়মূনা বিনত আল-হারিস (রা) রাসূলের যামানায় একজন ক্রীতদাসীকে আযাদ করে মুক্ত করে দেন। অত:পর রাসূলুল্লাহ-এর নিকট এ কথা বর্ণনা করলে তিনি বললেন, তুমি যদি ঐ অর্থ তোমার ভাই ইবনুল হারিসকে দিতে তবে অধিক সাওয়াব পেতে।

٧. عَنْ مَيْمُوْنَةَ (رضـ) قَالَتْ : أُهْدِىَ لِمُوْلَاةٍ لَنَا شَاةٌ مِّنَ الصَّدَقَةِ، فَمَاتَ، فَمَرَّ بِهَا النَّبِىُّ ﷺ قَالَ : اَلاَ دَبَغْتُمْ اِهَابَهَا اَىْ جُلُوْدَهَا، فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ ؟ فَقَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ : اِنَّمَا حَرَامٌ اُكْلُهَا .

৭. মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাদের জনৈক দাসীকে একটি বকরী উপহার দেয়া হলো। বকরীটি মরে গেল। রাসূল মরা বকরীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, বললেন : তোমরা কি এর চামড়া পরিশোধন (দাবাগত) করে তা ব্যবহার করবে না? তাঁরা বললেন, হে রাসূল এটা তো মৃত। নবী বললেন, এর গোশত খাওয়া হারাম, চামড়া ব্যবহার করা নয়।

তাঁর বর্ণিত অনেক হাদীস থেকে তাঁর ফিকহী সূক্ষ্মতার পরিচয় মেলে। উদাহরণস্বরূপ একটি হাদীস উল্লেখ করা হলো : একবার ইবনে আব্বাস (রা) মলিন মুখে বসে আছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "বৎস! তোমার কি হয়েছে? বললেন, উম্মু আম্মার (তাঁর স্ত্রী) আমার চুলে চিরুনী করে দিতো, অথচ সে আজ-কাল মাসিক স্রাবে ভুগছে। তিনি বললেন, কী চমৎকার! আমার ঐ রকম দিনে নবী আমার কোলে মাথা মুবারক রেখে শুইতেন, কুরআন শরীফ পড়তেন, আমি ঐ অবস্থায় মসজিদে বিছানা (চাটাই) রেখে আসতাম। বৎস! হাতেও কি এসব হয় কখনও?

ওফাত : রাসূল-এর পদাঙ্ক অনুসরণে সতত তৎপর, পরোপকারী, দানশীলা, গোলাম আযাদকারিণী মায়মুনা (রা) হিজরী ৬১ সালে 'সরফ' নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। উল্লেখ্য যে, এ 'সরফে' তাঁর বিয়ে হয়েছিল। এটা তাঁর জীবন ইতিহাসের এক স্মরণীয় ঘটনা। ওফাতের সময় তিনি আয়েশা ও উম্মু সালামা

(রা)-কে ডেকে এনে বলেন, সাধারণত সতীনদের মধ্যে যা হয়ে থাকে মাঝে মধ্যে আমাদের মধ্যেও সে রকম হয়ত হয়ে যেত, আমি এ ব্যাপারে লজ্জিত। আপনারা আমাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আয়েশা বলেন, আমি তাকে ক্ষমা করে তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করি। এতে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে বললেন তুমি আমাকে খুশী করেছ আল্লাহ তোমায় খুশী করুন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস তাঁর জানাযার সালাত পড়েছিলেন এবং তিনি লাশ কবরে নামিয়েছিলেন। লাশ বহনের সময় আবদুল্লাহ বলেছিলেন, 'সাবধান! এ উম্মুল মু'মিনীনের লাশ। বেয়াদবী করো না, এমন কি তোমরা নড়াচড়াও করো না। খুব যত্ন সহকারে বহন করবে।'

২০. উম্মুল মু'মিনীন রায়হানা (রা)

রাসূল ﷺ-এর পবিত্র স্ত্রীগণ হলেন মু'মিনদের জন্য মাতৃতুল্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন–

اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗٓ اُمَّهٰتُهُمْ .

নবী মু'মিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ আর তার স্ত্রীগণ তাদের মাতা (সূরা–৩৩ আহযাব : আয়াত-৬)

তাই মু'মিনদের মাতা ও রাসূল ﷺ-এর পবিত্র স্ত্রীগণ জান্নাতে যাবে এটাই স্বাভাবিক। যাদের সাথে রাসূল ﷺ-এর দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত হয়েছে তারা জাহান্নামে যাবে আর রাসূল ﷺ জান্নাতে থাকবেন এটা অসম্ভব কথাও বটে। তাই রাসূল ﷺ-এর সাথে তাদের সম্পর্কের কারণেই তারা জান্নাতে যাবেন, এটাই দলিল তাদের জান্নাতে যাওয়ার।

নাম ও পরিচয় : তাঁর নাম রায়হানা। পিতার নাম শামউন। তিনি ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ ইয়াহূদী বনু নাযীর গোত্রের মেয়ে। বংশ তালিকা হল– রায়হানা বিনতে শামউন ইবনে যায়েদ, অন্য মতে রায়হানা বিনতে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে খানাফা ইবনে শামউন ইবনে যায়েদ।

প্রথম বিবাহ : তাঁর প্রথম বিয়ে হয় বনু কুরায়জা গোত্রের হাকামের সাথে। কিছুদিন পর হাকামের মৃত্যু হয়। ৬ষ্ঠ হিজরী সালে যখন মুসলমানরা বনু নাযীর ও বনু কুরায়জা গোত্রের সব কিছু দখল করে নেয় তখন রায়হানাকে যুদ্ধ বন্দী হিসেবে নিয়ে আসা হয়। এরপর কিছুদিন তাকে কায়েসের কন্যা উম্মু মুনফিরের কাছে রাখা হয়।

বিয়ে করতে রাসূল ﷺ-এর ইচ্ছা প্রকাশ রাসূল ﷺ বিদ্রোহী ইয়াহূদী গোত্রগুলোর সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য সমগ্র আরবে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য রায়হানাকে আশ্রয় দিতে ও বিয়ে করতে মনস্থ করেন এবং তাঁকে বলেন, 'তুমি আল্লাহ এবং রাসূলকে গ্রহণ করলে আমি তোমাকে আমার জন্য উপযুক্ত মনে

করি। 'রায়হানা বিনতে শামউন রাসূল ﷺ-এর এ প্রস্তাব আনন্দে গ্রহণ করেন। রায়হানা (রা) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ছিলেন কুরায়জা গোত্রের আল-হাকাম এর স্ত্রী, মুসলমানদের সাথে কুরায়জা গোত্রের সন্ধি চুক্তি ছিল। কিন্তু আহযাব যুদ্ধে কুরায়জা গোত্রে বিশ্বাসঘাতকতা করে মুশরিক কুরাইশদের পক্ষ গ্রহণ করে। ফলে আল্লাহর নির্দেশে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। দীর্ঘ দিন তাদেরকে অবরোধ করে রাখলে অনন্যোপায় হয়ে তারা আত্মসমর্পণ করে।

অত:পর তাদের পুরুষদেরকে হত্যা করা হয় এবং মহিলা ও শিশুদেরকে বন্দী করা হয়। এ সূত্রে রায়হানা-এর স্বামী আল হাকাম নিহত হয় এবং তিনি বন্দিনী হন। প্রথমত তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি উহা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং স্বীয় ইয়াহূদী ধর্মে বহাল থাকতে পছন্দ করেন। অতঃপর তাঁকে পৃথক করে উম্মুল মুনযির বিনৃত কায়েস-এর গৃহে রাখা হয়। কিছু দিন পর স্বত:প্রণোদিত হয়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

রায়হানা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তাঁর বিবাহ হওয়ার বর্ণনা নিজেই প্রদান করেয়াছেন, যা ইব্‌ন সা'দ স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন রায়হানা (রা) বলেন, বন্দীদেরকে হত্যার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট আগমন করেন, অতঃপর আমাকে কাছে বসিয়ে বললেন, তুমি যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে গ্রহণ কর তা হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের জন্য তোমাকে গ্রহণ করবেন। আমি বললাম, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে গ্রহণ করলাম। আমি ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে আলাদা করে দেন এবং আমার তাঁর অন্যান্য পত্নীদিগের ন্যায় ১টি গৃহেই আমাদের বাসর হয়। তিনি অন্যান্য স্ত্রীর ন্যায় সমভাবে পালা বন্টন অনুযায়ী আমার গৃহে আগমন করতেন এবং আমার ওপর পর্দার হুকুম আরোপ করেন।

অপর এক বর্ণনা মতে প্রথমত তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি অস্বীকার করেন। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ মনোক্ষুণ্ন হন। অতঃপর তিনি একদিন সাহাবীদের নিয়ে তিনি বসলেন। তখন পিছন হতে জুতার আওয়াজ শুনে তিনি বললেন, ছালাবা ইবনে শুভা রায়হানা ইসলাম গ্রহণের সুসংবাদ নিয়ে এসেছিল। অতঃপর ঠিকই তিনি এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রায়হানার ইসলাম গ্রহণের সুসংবাদ দিল।

অপর বর্ণনা মতে, অতঃপর রাসূল ﷺ তাকে স্বাধীন করে দেন। অতঃপর তাকে বিবাহ প্রস্তাব দেন এবং হিজাব (পর্দা) মান্য করার কথা বলে। রায়হান তাঁর উত্তরে বলেন, হে রাসূল ﷺ! বরং আমাকে দাসী হিসেবে আপনার মালিকানা

রাখুন। উহাই আপনার জন্য এবং আমার জন্য সহজতর হবে। তখন রাসূল ﷺ তাকে দাসী হিসেবে রাখার ইচ্ছা পোষণ করেন। তবে যুক্তির কষ্ঠিপাথরে এ মতটি জোরালো বলে মনে হয় না। কারণ সম্ভ্রান্ত ও স্বাধীন এ মহিলাকে যিনি দৈবক্রমে বন্দী ও দাসী হয়ে গিয়েছেন, আযাদ হওয়ার স্বাধীনতা প্রদান করলে তিনি যে উক্ত কাঙ্খিত প্রস্তাব প্রত্যাখান করে বন্দীদশাকেই স্বেচ্ছায় গ্রহণ করবেন, ইহা এক রকম অসম্ভব।

রায়হানা ছিলেন অপরূপ সুন্দরী এবং অত্যন্ত অমায়িক ব্যবহার ও পূত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারীণী। রাসূল ﷺ তার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি যা চাইতেন রাসূল ﷺ তাকে তা প্রদান করতেন।

ফলে রাসূল ﷺ তাঁকে মুক্ত করে ৪০০ দিরহাম মোহরানা প্রদান করে বিয়ে করেন।

ওফাত : ইবনে সা'আদের বর্ণনা মতে হিজরী ৬ষ্ঠ সালের মুহররম মাসে এ বিয়ে সম্পন্ন হয়। এ বিয়ের ফলে ইয়াহূদী গোত্রগুলোর সাথে মুসলমানদের সম্পর্কের চমৎকার উন্নতি হয়। উভয়ের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুসম্পর্কও প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাকের মতে রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকালের দশ মাস পূর্বে রায়হানা (রা) ইন্তেকাল করেন।

২১. উম্মুল মু'মিনীন

মারিয়া কিবতিয়া (রা)

রাসূল ﷺ-এর পবিত্র স্ত্রীগণ হলেন মু'মিনদের জন্য মাতৃতুল্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন–

اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗۤ اُمَّهٰتُهُمْ ـ

নবী মু'মিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ আর তার স্ত্রীগণ তাদের মাতা (সূরা–৩৩ আহযাব : আয়াত-৬)

তাই মু'মিনদের মাতা ও রাসূল ﷺ-এর পবিত্র স্ত্রীগণ জান্নাতে যাবে এটাই স্বাভাবিক। যাদের সাথে রাসূল ﷺ-এর দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত হয়েছে তারা জাহান্নামে যাবে আর রাসূল ﷺ জান্নাতে থাকবেন এটা অসম্ভব কথাও বটে। তাই রাসূল ﷺ-এর সাথে তাদের সম্পর্কের কারণেই তারা জান্নাতে যাবেন, এটাই দলিল তাদের জান্নাতে যাওয়ার।

হুদায়বিয়ার সন্ধি সংঘটিত হওয়ার পর রাসূল ﷺ পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলোতে রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট দূত মারফত ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত সম্বলিত চিঠি প্রেরণ করেন। এ চিঠির প্রেক্ষিতে মিসরের খ্রিস্টান শাসক মুকাওকিস সৌহার্দ্র ও শুভেচ্ছার নির্দশনস্বরূপ আপন চাচাত বোন মরিয়ম বা মারিয়া কিবতিয়াকে রাষ্ট্রীয় পর্যাপ্ত উপঢৌকনসহ তৎকালীন প্রথানুসারে মুসলিম রাষ্ট্র প্রধান রাসূল-এর দরবারে উপহারস্বরূপ প্রেরণ করেন।

অপর এক বর্ণনামতে উপঢৌকনস্বরূপ প্রেরিত মহিলার সংখ্যা ছিল চারজন। ইবনে কাছীরের বর্ণনামতে সম্ভবত অপর দুই মহিলা এ ভগ্নীদ্বয়ের খাদিমা (দাসী)-স্বরূপ ছিলেন। এ উপঢৌকনের সাথে মাবূর নামক একজন খোজা দাস (তিনি ছিলেন মারিয়ার ভ্রাতা) এবং দুলদুল নামক সাদা রংয়ের একটি খচ্চরও প্রেরিত হয়েছিল। আরও ছিল এক হাজার মিছকালে স্বর্ণ ও (বিশটি) রেশমী কাপড়, এগুলো প্রেরণ করা হয় রাসূল ﷺ-এর দূত হাতিব ইবনে আবী

বালতা'আর মাধ্যমে। হাতিব (রা) তাঁদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করলে মারিয়া ভগ্নীদ্বয় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মাবূর পরে মদীনায় রাসূল ﷺ-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

রাসূল ﷺ আন্তর্জাতিক রাজনীতির দিকে লক্ষ্য রেখে এ উপহার ও উপঢৌকন গ্রহণ করেন। এ সকল উপঢৌকন পাওয়ার পর সর্বপ্রথম রাসূল ﷺ মারিয়ার নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। মারিয়া আনন্দের সাথে এ দাওয়াত কবুল করেন ও ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর মারিয়ার সম্মতিতে সম্পূর্ণ ইসলামী বিধান মোতাবেক রাসূল ﷺ তাঁকে বিয়ে করেন। এভাবে মিসরের রাষ্ট্র প্রধান মুকাওকিসের উপহারের সঠিক মূল্যায়ন করেন।

অন্য বর্ণনা মতে, রাসূল ﷺ মারিয়াকে নিজের দাসী হিসেবে রাখেন এবং সীরীনকে হাসসান ইবনে ছাবিত (রা)-কে প্রদান করেন। তাঁর গর্ভে 'আবদু'র রাহমান ইবন হাসসান জন্মগ্রহণ করেন।

সপ্তম হিজরী সালের শেষের দিকে এ বিয়ে সংঘটিত হয়। এরপর রাসূল ﷺ আর কোন বিয়ে করেন নি। আর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেও রাসূল ﷺ-এর জন্য নতুন কোনো বিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে আয়াত নাযিল হয়। আল্লাহ বলেন–

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ .

অর্থ ঃ 'এরপর আর কোনো নারী আপনার জন্য হালাল নয় এবং তাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও হালাল নয়। যদিও তাদের সৌন্দর্য আপনাকে আকর্ষিত করে।' (সূরা–৩৩ আহযাব : আয়াত-৫২)

অন্য বর্ণনা মতে, মারিয়া হলেন রাসূল ﷺ-এর বান্দী ও তাঁর পিতা হলেন শামউন। সমস্ত বান্দীদের মধ্যে রাসূল ﷺ তাকেই পর্দা করার নির্দেশ প্রদান করেন।

মারিয়া কিবতিয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে রাসূল ﷺ-এর অন্যতম পুত্র সন্তান ইব্রাহীম। আওয়ালী নামক স্থানে হিজরী ৮ম সালে তাঁর জন্ম হয়। এখানেই মারিয়া (রা) বাস করতেন। এখানে ইব্রাহীমের জন্ম হওয়ার কারণে স্থানটি 'মাশরাবাই ইব্রাহীম' নামে পরিচিতি লাভ করে। ইব্রাহীমের জন্মকালে ধাত্রী নিযুক্ত ছিলেন প্রখ্যাত সাহাবী আবূ রাফের পত্নী বিবি সালমা। তিনি যখন রাসূল

ﷺ-এর দরবারে হাজির হয়ে পুত্র সন্তান হওয়ার শুভ সংবাদটি দেন তখন রাসূল ﷺ খুশি হয়ে তাকে একজন গোলাম দান করেন।

ইব্রাহীমের জন্মের সংবাদে রাসূল ﷺ খুব খুশি হন। সাতদিনের দিন তাঁর আকীকা দেয়া হয় এবং মাথা মুড়িয়ে চুলের ওজন পরিমাণ রূপা গরীবদের মাঝে দান করে দেন। এ দিনেই মুসলিম জাতির পিতা ইব্রাহীম (عليه السلام)-এর নামে তাঁর নামকরণ করা হয় ইব্রাহীম।

সদ্য প্রসূত শিশু ইব্রাহীমকে দুধ পান করানোর জন্য অনেক আনসার মহিলা প্রার্থী হন। শেষে খাওলা বিনতু যায়দুল আনসারীকে দাই নিযুক্ত করেন। এ জন্য রাসূল ﷺ তাকে কয়েকটি ফলবান খেজুর গাছ দান করেন।

খাওলা বিনতে যায়দুল উম্মু রাফে নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি তাঁর স্বামী বারা বিন আউদ্'র সাথে মদীনার উপকণ্ঠে বাস করতেন। বারা পেশায় ছিলেন কর্মকার। এ জন্য তার বাড়ি প্রায়ই ধোয়ায় আচ্ছন্ন থাকতো। তবুও রাসূল ﷺ সন্তানের টানে প্রায়শ সেখানে যেতেন এবং ইব্রাহীমের খোঁজ খবর নিতেন।

সতের বা আঠার মাস বয়সের সময়ে ইব্রাহীম ধাত্রী মাতা খাওলার গৃহেই ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে রাসূল ﷺ সাহাবী আবদুর রহমানসহ সেখানে ছুটে যান। হাত বাড়িয়ে মৃত ইব্রাহীমকে কোলে তুলে নেন। আর তখনি রাসূল ﷺ-এর দু'চোখ দিয়ে বাধ ভাঙা জোয়ারের মত পানি নেমে আসে। আবদুর রহমান আরজ করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আপনার অবস্থা এমন কেন? রাসূল ﷺ বলেন, 'আজ আমার অপত্য স্নেহ অশ্রু বিন্দু হয়ে ঝরে পড়ছে।'

রাসূল ﷺ তাঁর প্রিয়তম পুত্রের মৃত্যুতে ভীষণ মর্মাহত হন। তাঁর চক্ষু হতে অশ্রু প্রবাহিত হয়। এ অবস্থায় তিনি বললেন : চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত, অন্তর ব্যথিত, কিন্তু মুখে এমন কথা বলতে পারি না যা আল্লাহ তা'আলা অপছন্দ করেন। হে ইবরাহীম! আমরা তোমার বিচ্ছেদে শোকাভিভূত। আল্লাহর নির্দেশমত আমরা اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পড়ছি। ফাদল ইবনে 'আব্বাস (রা) বা উম্মু বুরদা (রা) তাঁকে গোসল দেন। ছোট খাটিয়ায় করে জানাযা বহন করা হয়।

ইব্রাহীমের মৃত্যুর দিন ঘটনাক্রমে সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। সকলে বলাবলি করতে লাগলো যে, রাসূল ﷺ-এর পুত্র মারা গেছে বলেই আজ সূর্যগ্রহণ হয়েছে। তারা বলতে লাগলো, 'আকাশ শোকাভিভূত হয়ে পড়েছে, সে জন্যই দুনিয়ায় বিদঘুটে

অন্ধকার নেমে এসেছে।' কিন্তু বিশ্ব সংস্কারক রাসূল ﷺ যখন এ সংবাদ শুনলেন তখনই তিনি এ কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করার জন্য সকলকে ডেকে বললেন, 'সূর্যগ্রহণ এবং চন্দ্রগ্রহণ হচ্ছে আল্লাহ্র নিদর্শন। কারো জীবন ও মরণের সঙ্গে এগুলোর কোনোই যোগাযোগ নেই। সুতরাং গ্রহণ লাগা বা না লাগার পেছনে কারো মৃত্যুর কোনো সম্বন্ধ নেই।'

ইব্রাহীমের লাশ ছোট একটা খাটে করে আনা হয়। রাসূল ﷺ নিজে পুত্রের জানাযা পড়ান। তারপর তাঁকে বিশিষ্ট সাহাবী উসমান বিন মাযউনের কবরের পাশে দাফন করা হয়। তাঁর লাশ কবরে নামান উসামা ও ফযল বিন আব্বাস। রাসূল ﷺ দাফন শেষ হওয়া পর্যন্ত সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন। পরে কবরের ওপর সামান্য পানি ছিটিয়ে দেয়া হয় এবং নির্দিষ্ট চিহ্ন দিয়ে কবরটিকে চিহ্নিত করা হয়।

খোলাফায়ে রাশেদার প্রথম ও দ্বিতীয় খলিফা আবূ বকর ও ওমর (রা) মারিয়া (রা)-কে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখতেন। রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকালের পর উভয় খলিফাই তাঁর প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এমন কি মারিয়া কিবতিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর আত্মীয়-স্বজনকেও উক্ত দু'জন খলিফা সম্ভাব্য সকল সাহায্য সহযোগিতা করেছেন।

ওফাত : ইব্রাহীম (রা)-এর মৃত্যুর পাঁচ বছর পর মারিয়া কিবতিয়া ইন্তেকাল করেন। তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।

২২. হালীমা (রা)

নাম ও পরিচয় : হালীমা আস-সা'দিয়া (রা) মুহাম্মদ ﷺ-এর দুধ-মাতা, যিনি পরবর্তীতে সাহাবীয়া হওয়ার সৌভাগ্যও অর্জন করেছিলেন। তিনি ছিলেন মক্কার পার্শ্ববর্তী গ্রামে বসবাসরত বানূ সা'দ ইবন বাক্র গোত্রের মেয়ে। তাঁর পিতার নাম ছিল আবূ যু'আয়ব আব্দুল্লাহ ইবনু'ল-হারিছ ইবন শিজনা এবং স্বামীর নাম ছিল আল-হারিছ (রা) ইবন আবদুল উয্যা।

অন্য নারীর দুগ্ধ পান করানোর কারণ : আরবের অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে এ প্রথা প্রচলিত ছিল যে, তারা নবজাতকে শিশুকে দুগ্ধপানের জন্য গ্রামে পাঠাতেন যাতে শিশু বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল আরবী ভাষা শিখতে পারে এবং গ্রামের নির্মল আলো-বাতাস সেবনে শিশুর দৈহিক গঠন বলিষ্ঠ হয়।

দুগ্ধপোষ্য-শিশুর খোঁজে হালীমা : নবী করীম ﷺ ভূমিষ্ঠ হওয়ার বছর যথারীতি হালীমা (রা) তাঁর গোত্রের অন্যান্য নারীদের সাথে দুগ্ধপোষ্য শিশুর খোঁজে স্বামীসহ মক্কায় আগমন করলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল স্বীয় দুগ্ধপোষ্য শিশু আব্দুল্লাহ, একটি বয়:বৃদ্ধ উষ্ট্রী ও একটি দুর্বল গাঁধা। দুর্বল গাধায় আরোহণ করার কারণে তারা সকলের শেষে মক্কায় প্রবেশ করলেন। সকলের নিকটই নবী করীম ﷺ-কে পেশ করা হল। কিন্তু তারা যখনই শুনল যে, শিশুটি এতীম তখনই তাঁকে রেখে অন্য শিশুর খোঁজে চলে গেল। কারণ তাদের ধারণা ছিল যে, মেয়াদ শেষে যখন শিশুকে প্রত্যার্পণ করা হবে তখন শিশুর পিতা কর্তৃক যে মোটা অংকের উপহার দেয়া হয়ে থাকে, এ ক্ষেত্রে তা পাওয়া যাবে না।

হালীমা (রা) অন্য কোনও শিশু না পেয়ে স্বামীকে বললেন : আল্লাহর কসম। সঙ্গীদের নিকট খালি হাতে প্রত্যাবর্তন করা আমি খারাপ মনে করছি। তাই অবশ্যই উক্ত ইয়াতীমের নিকট যাব এবং তাকে গ্রহণ করব। স্বামী হারিছ ইব্ন আবদুল উয্যা তাতে দ্বিমত পোষণ করলেন না। অত:পর হালীমা (রা) নবী করীম ﷺ কে দুগ্ধপোষ্য শিশু হিসেবে গ্রহণ করে তখন তার সাথে দুগ্ধপোষ্য

শিশু ও একটি বয়:বৃদ্ধ উষ্ট্রী ছিল। হালিমা বলেন যে, উষ্ট্রীর দুধে আমরা পরিতৃপ্ত হতে পারতাম না। ফলে আমার স্তনের দুধেও শিশুটির পেট পূর্ণ হত না। তাই অনাহারের ফলে তার কান্নার কারণে রাত্রিতে আমরা ঠিকমত ঘুমাতে পারতাম না। কিন্তু মক্কার শিশুটিকে কোলে নিয়ে যখন সওয়ারীর নিকট ফিরে আসলাম তখন দেখলাম আমার স্তন দুধে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। অত:পর সে ও তাঁর দুধ ভাই উহা পান করে পরিতৃপ্ত হয়ে গেল এবং ঘুমিয়ে পড়ল। আমার স্বামী উস্ট্রীর দুগ্ধ দোহন করতে গিয়ে দেখলেন, উষ্ট্রীর বাঁট দুধে পরিপূর্ণ। আমরা তৃপ্তিসহকারে উহা পান করলাম। অত:পর সে দিন আমরা সবচেয়ে উত্তম রাত যাপন করলাম।

আমার স্বামী বললেন হালীমা আল্লাহর কসম! আমি দেখতে পেয়েছি যে, তুমি একটি বরকতময় শিশু গ্রহণ করেছ। অত:পর যখন আমরা আমাদের সে দুর্বল গাধাটিতে আরোহণ করলাম তখন সেটি দ্রুত গতিতে অন্যান্য সকলকে পিছনে ফেলে ছুটে চলল। আমার সঙ্গীগণ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগল, হে আবু যু'আয়বের কন্যা। একি সে গাধাটি? সেটি ছিল দুর্ভিক্ষের বছর। অথচ আমাদের ছাগলগুলো চারণভূমি থেকে আহারে পরিতৃপ্ত ও বাঁটে দুগ্ধভর্তি অবস্থায় ঘরে ফিরত। অথচ অন্যদের ছাগল ক্ষুধার্ত ফিরত। ফলে কারো ছাগলে এক ফোটা দুধও থাকত না। গোত্রের লোকজন এটা দেখে তাদের রাখালদেরকে বলত, হালীমার ছাগলগুলো যেখানে বিচরণ করে তোমরাও সেখানে চরাও। কিন্তু তাতেও কোনো ফল হল না। পূর্বের ন্যায় তাদের ছাগল অনাহারে দুধবিহীন অবস্থায় ফিরতে লাগল। সব কিছুতেই আমরা বরকত ও কল্যাণ পেতে থাকলাম।

এমনিভাবে দুই বছর কেটে গেল। অত:পর হালীমা (রা) তাঁকে মক্কায় নিয়ে আসলেন এবং একাধারে বরকত ও কল্যাণ ধরে রাখার জন্য তাঁর মাতার নিকট মক্কার আবহাওয়া খারাপ ও মহামারীর প্রাদুর্ভাব হওয়ার কথা বলে আরও কিছু সময় বাড়িয়ে নিলেন। এর কয়েক মাস পর যখন নবী করীম ﷺ-এর বক্ষ বিদারণের (শাক্কু'স-সাদ্র) ঘটনা ঘটল তখন তিনি তাঁকে নিয়ে মক্কায় আসলেন এবং আমিনার নিকট প্রত্যর্পণ করলেন। এক বর্ণনামতে নবী করীম ﷺ ৬ বছর বয়সকাল পর্যন্ত হালীমা (রা)-এর নিকট ছিলেন।

হালীমা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ : হালীমা (রা) ঠিক কখন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও অনুমান করা হয় যে, ইসলামের

প্রথম দিকে নবী করীম ﷺ-এর মক্কায় অবস্থানকালেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। কারণ ইসলামের দাওয়াত তাঁর কর্ণগোচর হতেই যে তিনি উহা বিশ্বাস করবেন এটাই স্বাভাবিক। যেহেতু শৈশবে তিনি নবী করীম ﷺ-কে অত্যন্ত নিকট থেকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন এবং তখন থেকে তাঁর মনে এ দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে যে, এ শিশুকালে একজন মহামানব হবেন, তজ্জন্যই তাঁর স্বামী হারিছ ইবন আবদুল উয্যা মক্কায় তাঁর কথা শ্রবণ করে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মুসলমান হয়ে স্বগোত্রে ফিরে আসলে তাঁর মুখে শুনে হালীমা (রা) ইসলাম গ্রহণ করে থাকবেন।

দুধমাতার সম্মানে রাসূল ﷺ কখনো কখনো হালীমা (রা) নিকট আগমন করতেন। নবী করীম ﷺ তাঁকে আপন মাতার ন্যায় অতিশয় সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর বসার জন্য নিজের দেহের চাদর বিছিয়ে দিতেন। আবু'-তুফাইল (রা) বলেন : নবী করীম ﷺ একবার জি'ইরানায় গোশ্‌ত বণ্টন করেছিলেন। আমি তখন বালক ছিলাম।

আমি উটের একটি অংশ নিলাম। তখন সেখানে গ্রাম্য এক মহিলা আগমন করল। মহিলাটি নবী করীম ﷺ এর নিকটে গেলে তিনি তার জন্য স্বীয় চাদর বিছিয়ে দিলেন। মহিলাটি তার উপর বসলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, মহিলাটি কে? লোকজন উত্তর দিল, তিনি নবী করীম ﷺ এর দুধমাতা। আতা ইবন ইয়াসার সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ-এর দুধমাতা হালীমা (রা) হুনাইনের দিন তাঁর নিকট আগমন করলে নবী করীম ﷺ তাঁর সম্মানে উঠে দাঁড়ান এবং নিজের চাদর বিছিয়ে দেন। অত:পর হালীমা (রা) তার উপর বসেন।

হালীমা (রা)-এর আব্দুল্লাহ নামক এক পুত্র এবং উনায়সা : ও খিযামা : (মতান্তরে হুযাফা:) নামক দুই কন্যা ছিল। খিযামা : আশ-শায়মা' নামে পরিচিতা ছিলেন। তিনি মাতা হালীমা (রা)-এর দুগ্ধপোষ্য সন্তান (মুহাম্মদ ﷺ-কে লালন-পালনে সহযোগিতা করেন। হুনাইনের যুদ্ধে তিনি হাওয়াযিন গোত্রের অন্যান্যের সাথে মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়ে আসেন। মুহাম্মদ ﷺ রিদাঈ (দুগ্ধজাত) সম্পর্কের খাতিরে তাঁর সাথে অতিশয় সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করেন এবং উপহার দিয়ে আযাদ করে দেন।

নবী করীম ﷺ-এর বহু বিবাহের সমালোচনার প্রতিবাদ

ইয়াহুদী-খ্রিস্টানসহ ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী জ্ঞানপাপী খোদাদ্রোহীরা একাধিক স্ত্রী রাখার ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর কঠোর সমালোচনা এবং তার মর্যাদার ওপর কটাক্ষ করতে দেখা যায়। তারা বিশ্বনবী ও বিশ্বসংস্কারক পূত পবিত্র চরিত্রের অধিকারী রাসূল ﷺ-এর পবিত্র চরিত্রের ব্যাপারে প্রশ্ন তোলেন। রাসূল ﷺ তাঁর পবিত্র যৌবনের সিংহভাগ সময় ব্যয় করেন তার থেকে ১৫ বছর বড় একজন বিধবা নারীকে স্ত্রী বানিয়ে। প্রথম স্ত্রী খাদিজা (রা)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর বয়স যখন ৫১/৫২ বছর তখন তাঁর মাঝে নারীভোগের চেতনা আসল তা কখনো বিশ্বাসযোগ্য নয়।

মুসলমানদের অন্তরে সন্দেহের বীজ রোপণ করা এবং ইসলামের প্রবর্তক বিশ্বনবীর প্রতি অমুসলিমদের অন্তরে ঘৃণা আর অসমর্থনের মনোভাব সৃষ্টি করাই হচ্ছে মূলত: এদের অহেতুক অপপ্রচারের আসল ও ব্যর্থ উদ্দেশ্য। কোন কোন মুসলিম যুবকের ইয়াহুদী প্ররোচনার জবাবে অপারগতা এবং দুর্বলতা প্রকাশ হয় বিধায় এ সম্পর্কে কিছু লেখার প্রয়োজন মনে হচ্ছে। অন্যথায় এরূপ সমালোচনাকারীদের সমালোচনার প্রতিবাদে কলম ধরার কোন প্রয়োজন ছিল না। অসত্যের মুকাবিলায় সত্যের সম্মুখে নতশির হওয়ার লোক এরা নয়। সঠিক তথ্য অবগত হওয়ার পরও ওরা বিভ্রান্তি বর্জন করে না। ওদের এরূপ ভূমিকার বিবরণ দিয়ে আল্লাহ ইরশাদ করেন—

فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ -

অর্থ: জ্ঞাত বস্তু তাদের নিকট আসলে তারা তা প্রত্যাখ্যান করে, কাফেরদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ। (সূরা-২ আল বাক্বারা : আয়াত-৮৯)

فَاِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُوْنَكَ (اَىْ يَعْلَمُوْنَ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ) وَلٰكِنَّ الظَّالِمِيْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ۔

অর্থ: তারা আপনাকে মিথ্যুক বলে না, (অর্থাৎ, আপনি রাসূল তা তারা জানে) কিন্তু জালেমরা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করে থাকে।

(সূরা–৬ আন'আম : আয়াত-৩৩)

তাই এদের ভিত্তিহীন সমালোচনার মুখোশ উন্মোচন এবং সঠিক তত্ত্ব প্রকাশের তাগিদে আমরা বলতে চাই যে, অধিক বিবাহ রাসূল ﷺ-এর চরিত্র মাধুরী, তাঁর দয়া-মায়া, উদারতা, ধৈর্য-সহ্য, শিষ্টাচারিতা, মহত্ত্ব এবং নবুওয়্যাতের উৎকর্ষতার পরিচায়ক। কেননা–

১. যৌবনের ২৫তম বয়সে টগবগে যুবক বিশ্বনবী সমাজের নিকট নির্মল ও পূত-পবিত্র চরিত্রের প্রতীক হিসেবে পরিগণিত ছিলেন। যৌবনের তাড়নায় উদভ্রান্ত হয়েছেন, অপকর্মে সাড়া দিয়েছেন, এমনকি কোন মহিলার প্রতি এরূপ মন-মানসিকতা নিয়ে ভ্রূক্ষেপ করেছেন, তার ঘোর শত্রুরাও তাঁর প্রতি এমন দোষারোপ করতে সাহস করেনি। ৪০ বছর বয়সের মহিলা খাদীজাকে বিবাহ করেন, তাও নিজের খাহেশে নয়, বরং খাদীজার প্রস্তাবে। তখন তার বয়স ছিল ২৫ বছর। যৌবনের পুরো সময়, গোটা যৌবনকাল এরূপ এক বয়স্কা মহিলাকে নিয়েই কাটিয়ে দেন, আর কোন বিবাহ করেননি। তাঁর ৫০ বছর বয়সের সময় ৬৫ বছর বয়স্কা স্ত্রী খাদীজার মৃত্যু হয়। যদি তিনি নারী ভোগের কামনায় উদ্বেলিত স্বভাবের হতেন, তাহলে এ দীর্ঘসময় আরো দু-চারটি বিবাহ করে নিতেন। কারণ আরবের সেরা সুন্দরীরা তাকে বিয়ে করতে আগ্রহী ছিলেন। কারণ এটাই ছিল যৌবনের আসল মুহূর্ত, এ মুহূর্তেই নারীভোগের প্রতি মানুষের আকর্ষণ অধিক হয়ে থাকে।

   খাদীজা (রা)-এর আগেও আরো দুইটি বিবাহ হয়েছিল। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও মানবিক কারণেই তাকে বিবাহ করেন। ২৫ বছর বয়সে একজন বয়স্কা মহিলাকে বিবাহ করে যৌবনের পুরো সময় তাকে নিয়ে কাটিয়ে দেয়া সমালোচনাকারীদের অসারতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয় কি? যাদের অন্তর ব্যাধিমুক্ত, যারা ন্যায় ও নিরপেক্ষ বিচারক, যারা শুভবুদ্ধির অধিকারী, তাদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। খাদীজা (রা)-এর মৃত্যুর পর অবশ্যই তিনি একাধিক বিবাহ করেছেন। কিন্তু কেন করেছেন, কোন

প্রয়োজনে করেছেন, এ ব্যাপারে সমালোচনাকারীদের চক্ষু অন্ধ হলেও বুদ্ধিজীবি এবং সঠিক পর্যালোচনাকারীদের চক্ষু অন্ধ নয়।

২. খাদীজা (রা)-এর মৃত্যুর পর বিশ্বনবী ﷺ সাওদা (রা)-এর মত একজন বিধবা মহিলাকে বিবাহ করেন। ইসলামের প্রথম আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণের পর মক্কার জালেম কাফেরদের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে স্বামী সুকরান মৃত্যুবরণ করলে বৃদ্ধা এ মহিলার জীবনে নেমে আসে চরম নৈরাশ্য ও হতাশা। মোটা স্বাস্থ্যের অধিকারীণী ও অনুভূতিহীনা এই বিধবাকে কে বিবাহ করবে? তাকে কে আশ্রয় দেবে! কারও তার প্রতি আকর্ষণ নেই। হাবশায় হিজরতকারিণী দুঃখিনী বিধবা বৃদ্ধা মহিলাকে বিবাহ করে তার প্রতি করুণা এবং সহনশীলতা প্রদর্শন করা বিশ্বনবীর পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। কারণ এমন কোন মানবের পক্ষে সম্ভব নয় যে, নিজের বয়সের চেয়ে ৪ বছর বড় বা সমান এবং মোটা নারীকে বিবাহ করে জীবন কাটানো।

৩. এরপর তিনি আয়েশা (রা)-কে বিবাহ করেন। স্ত্রীদের মধ্যে কেবল আয়েশাই ছিলেন কুমারী। আল্লাহর ইশারাতেই এ বিবাহ কাজ সম্পাদিত হয়। তখন আয়েশা (রা)-এর বয়স ছিল ৬/৭ বছর আর রাসূল ﷺ-এর বয়স ছিল ৫২ বছর। আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর মত একজন নিঃস্বার্থ কর্মীর মন জয় করাও একটি অন্যতম কারণ। তার সাথে বন্ধুত্বকে সুদৃঢ় করার তাগিদেও এ বিবাহ ছিল একটি উপযুক্ত উপায় এবং পদক্ষেপ। আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ছিলেন প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী একজন নির্ভিক মুসলিম। সততা, সরলতা ও শিষ্টাচারিতার কারণে আরব সমাজে একজন নির্ভরযোগ্য ও বিশেষ ব্যক্তিত্ব হিসেবে তাকে মূল্যায়ন করা হত। তিনি হলেন ইসলাম এবং ইসলামের মহানবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর জানমাল কুরবানকারী প্রধান ব্যক্তিত্ব। তার কন্যা ব্যতীত কে বিশ্বনবীর স্ত্রী হওয়ার মর্যাদার অধিকারিণী হতে পারে? সে ব্যতীত কে হতে পারে উম্মুল মু'মিনীনের শিরোপার অধিকারিণী? এ বিবাহের ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট সম্পর্ক এবং আনুগত্যের ফলে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ইসলাম প্রচার প্রসারের ভূমিকা তাকে মুসলিম উম্মার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং নবীর প্রধান খলীফার মর্যাদায় সমাসীন করেছে।

৪. এরপর ওমর (রা)-এর কন্যা হাফসাকে তিনি বিবাহ করেন। তার প্রথম স্বামী খুনাইস ইবনে হুযাফা ওহুদের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করার পর রাসূল ﷺ বিবাহ করেন। বিধবা হাফসার চিন্তাগ্রস্ত পিতা ওমর (রা) স্বীয় কন্যার আশ্রয় খুঁজে আবু বকর এবং উসমানের নিকট বিবাহ প্রস্তাব করেন। সেখান

থেকে ব্যর্থ হওয়ার পর অধিরচিত্তে রাসূল ﷺ-এর মহান দরবারের শরণাপন্ন হন। এমনকি আবূ বকর এবং উসমানের মত প্রাণপ্রিয় বন্ধুদের অসম্মতি প্রকাশের অসহনীয় বেদনার কথাও বিশ্বনবীর গোচরীভূত করেন। এ মুহূর্তে রাসূল ﷺ ওমর (রা)-কে সান্ত্বনা দিয়ে ইরশাদ করেন : হাফসাকে তাদের তুলনায় উত্তম ব্যক্তি বিবাহ করবে। ওমর (রা)-কে সান্ত্বনা প্রদান, মুসলিম উম্মার শ্রেষ্ঠতম দুজন মহামানবের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি এবং হিজরতকারিণী বিধবা হাফসার প্রতি আন্তরিকতা প্রদর্শনের তাগিদে এ বিবাহ যে কত গুরুত্বপূর্ণ এবং উপযুক্ত পদক্ষেপ ছিল তা বলাই বাহুল্য।

৫. এরপর রাসূল ﷺ যয়নব বিনতে খুযাইমা (রা)-কে বিবাহ করেন। তার প্রথম স্বামী উবায়দা ইবনে হারিছ বদরের যুদ্ধ সূচনাকারী তিন জনের একজন ছিলেন। বদরের যুদ্ধে আহত হয়ে উবায়দার শাহাদাত বরণ করার পর আশ্রয় হিসেবে রাসূল ﷺ যয়নবকে বিবাহ করেন, কিন্তু বিবাহের ৮ মাস পর রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

৬. এরপর রাসূল ﷺ উম্মু সালামা (রা)-কে বিবাহ করেন। উম্মু সালামা (রা)-এর প্রথম স্বামী আবূ সালামা রাসূল ﷺ-এর দুধ ভাই ছিলেন। স্ত্রীকে নিয়ে হাবশা এবং মদীনায় হিজরত করেন। আবূ সালামা বদর এবং ওহুদ উভয় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং ওহুদের যুদ্ধে আহত হয়ে শাহাদাত বরণ করেন। দুই দুইটি হিজরত অতঃপর স্বামীর শাহাদাত বরণের কারণে উম্মু সালামা (রা) অসহায় এবং দুঃখ-কষ্টের চরম সীমায় উপনীত হন। রাসূল ﷺ-এর চাচাতো এবং দুধ ভাই আবূ সালামার এতীম সন্তানাদির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে দুধ শরীক ভাইয়ের হক আদায় করা রাসূল ﷺ-এর জন্য একান্ত কর্তব্য ছিল।

উম্মু সালামা (রা) ছিলেন উঁচু খান্দান এবং সম্মানী বংশের মহিলা। ইসলাম এবং মুসলমানের জন্য ছিল তার অসাধারণ ত্যাগ ও কুরবানী। স্বামীর মৃত্যুর কারণে এতীম সন্তানাদির লালন-পালন কষ্টে একাকী জীবন যাপন দুরূহ হয়ে পড়েছিল। এমতাবস্থায় এই বিবাহ তার প্রতি বিশ্বনবীর সহানুভূতি বৈ অন্য কিছু নয়।

৭. এরপর নবী করীম ﷺ আপন ফুফাতো বোন যয়নব বিনতে জাহাশ (রা)-কে বিবাহ করেন। তার প্রথম বিবাহ হয় রাসূল ﷺ-এর অত্যন্ত প্রিয় গোলাম পালকপুত্র যায়েদ ইবনে হারেছার সাথে। এ বিবাহের মূল কারণ

ছিল জাহেলী যুগের গলদ প্রথার মূলোৎপাটন করা। কেননা সে যুগে পালকপুত্রকে আপন পুত্র মনে করা হত এবং পালকপুত্রের স্ত্রীকে পালক পিতার জন্য বিবাহ করা হারাম মনে করা হত। এ কুপ্রথার মূলোৎপাটনের জন্যই এ বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।

৮. এরপর রাসূল ﷺ বনু মুসতালিকের মহিলা জুওয়াইরিয়াকে আযাদ করে তাকে বিবাহ করেন। পিতা গোত্র প্রধানের প্রস্তাবে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার তাগিদেই এ বিবাহ কাজ সম্পন্ন হয়। ফলে সাহাবাযে কেরাম রাসূল ﷺ -এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনস্বরূপ বিনা শর্তে এবং বিনিময় গ্রহণ করা ব্যতীত বনু মুসতালিকের সমস্ত বন্দীকে মুক্ত করে দেন। আর তারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে। বস্তুত: এ বিবাহ ছিল বনু মুসতালিকের জন্য বিরাট রহমত এবং বরকতস্বরূপ এবং সমগ্র মুসলিম জাতির জন্য একটি শিক্ষণীয় আদর্শ।

৯. এরপর রাসূল (স) আবূ সুফিয়ানের কন্যা উম্মু হাবীবাকে বিবাহ করেন। তার প্রথম বিবাহ হয় উবায়দুল্লাহ ইবনে জাহাশের সাথে। উম্মু হাবীবা (তার প্রথম স্বামীর সাথে হাবশায় হিজরত করেন। কিন্তু উবায়দুল্লাহ সেখানে মুরতাদ হয়ে মৃত্যুবরণ করে। হাবশা থেকে আসার পর দুঃখিনী বিধবা মহিলার প্রতি সমবেদনা এবং সম্মানস্বরূপ মক্কার কাফেরদের অবিস্মরণীয় নেতা আবূ সুফিয়ানের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের একান্ত প্রয়োজনে এ বিবাহ ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রকারান্তরে এ বিবাহের কারণে রাসূল ﷺ-এর প্রতি তার শত্রুতার চেতনা শিথিল হয়ে পড়ে, আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায় এবং ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে তার অভিযান একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়।

বরং তার অন্তরে লুক্কায়িত অনুভূতির ফল মক্কা বিজয়ের সুপ্রভাতে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের সূরতে প্রকাশ পায়। তার ইসলাম গ্রহণ মক্কার হাজার হাজার কাফেরদের জন্য ইসলাম গ্রহণের পথ সুগম করে। তিনি তার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইসলামের বীর মুজাহিদ ও একনিষ্ঠ নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বিভিন্নমুখী অভিযান ও রণকৌশলে এবং বুদ্ধি পরামর্শের জন্য যেমন ছিলেন তিনি বিশ্বনবীর লক্ষ্যের পাত্র, তেমনি ছিলেন সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের জন্য বিশেষ কেন্দ্রবিন্দু। তিনি এবং তার আনুগত্যকারী সকলেই ইয়ারমুক ও শামসহ বিভিন্ন যুদ্ধ অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ এবং অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

১০. এরপর ইয়াহুদীদের ঐতিহাসিক নেতা হুয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা খায়বারের যুদ্ধে বন্দীকৃত সফিয়্যা ইসলাম গ্রহণে ধন্য হলে রাসূল ﷺ তাকে আযাদ করে বিবাহ করেন। ইয়াহুদী নেতা হুয়াই ইবনে আখতাব এবং ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্ক স্থাপন, তাদেরকে ইসলামী আক্বীদা বিশ্বাসের প্রতি আকৃষ্টকরণের জন্য এ বিবাহ ছিল অত্যন্ত উপকারী। এরা একজন নবীয়ে উম্মীর শুভাগমনের কথা তাওরাত এবং ইঞ্জীলের সূত্রে অবহিত ছিল। অবহিত ছিল বলেই তারা গোপনে বিশ্বনবীর বিষয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিল কিন্তু পরশ্রীকাতরতা এবং শত্রুতা ছিল তাদের জন্য বাধা। এমতাবস্থায় সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ ইয়াহুদীদের শত্রুতার অগ্নি নির্বাপিতকরণ এবং ইসলামের প্রতি তাদের সমর্থন ও আনুগত্য আদায়ের কামনা বাসনার নিরিখে এ বিবাহ ছিল অত্যন্ত ফলদায়ক উপায় ও কৌশল।

১১. এরপর রাসূল ﷺ মাইমূনা বিনতে হারিছকে বিবাহ করেন। তিনি হচ্ছেন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, খালেদ ইবনে ওয়ালীদ, এবং জাফর তাইয়্যারের সন্তানাদির খালা। ২৬ বছর বয়সে তিনি বিধবা হন। হিজরী ৭ সনে কাজা উমরা আদায় করে ফেরার পথে তানয়ীম নামক স্থানের নিকটবর্তী এলাকা 'ছারিফ' নামক স্থানে রাসূল ﷺ-এর সাথে তার বিবাহ হয়। একজন সম্মানী দুঃখিনী বিধবা মহিলাকে আশ্রয় দেয়া এবং উম্মতের সম্মুখে আদর্শ স্থাপন করাই ছিল বিশ্ব নবীর এ বিবাহের মূল উদ্দেশ্য। এটা ছিল রাসূল ﷺ-এর সর্বশ্রেষ্ঠ বিবাহ।

তারপর রাসূল ﷺ-এর নিকট রায়হানা ও মারিয়া কিবতিয়া (রা) হাদিয়া স্বরূপ আসলে তাদেরকে প্রথমে দাস হিসেবে রাখার সিদ্ধান্ত নিলে তাদের পছন্দ মোতাবেক ও আল্লাহর নির্দেশে তাদেরকে উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের অন্তর্ভুক্ত করেন। অবশ্য কারো কারো মতে রায়হানা ও মারিয়া কিবতিয়া (রা) রাসূল ﷺ-এর স্ত্রীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তারা ছিলেন রাসূল ﷺ-এর দাসী। রাসূল ﷺ মূলত কয়েকটি কারণে একাধিক বিবাহ করেছেন—

১. আসলে ওহুদ যুদ্ধে ৭০ জন সাহাবী শহীদ হওয়ার ফলে ইসলামের সেই প্রথম যুগেই বিধবাদের একটি লম্বা কাফেলা দাঁড়িয়ে যায়। যাঁরা ছিলেন একান্তই অসহায়। কারণ মুসলমান হওয়ার কারণে তাঁদের আত্মীয়-স্বজনরা তাঁদেরকে একটু আশ্রয় পর্যন্তও দিতে রাজি ছিল না। এমতাবস্থায় রাসূল (স) এ অসহায় মুসলমান বিধবা মহিলাদেরকে বিয়ে করার জন্য সাহাবীদেরকে উৎসাহ দিতে থাকেন। নিজেও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসেন।

Contents

২. আত্মীয়তার সম্পর্ক বাড়ানোর জন্য।

৩. পারিবারিক একান্ত বিষয়গুলোকে উম্মতকে জানানোর জন্য।

৪. পোষ্যপুত্রের স্ত্রী বিয়ে করা যায় এ বিধান চালু করার জন্য।

৫. মুখঢাকা ভাইয়ের মেয়েও বিবাহ করা যায় তা বাস্তবায়ন করণার্থে।

৬. একান্তই ইসলামের স্বার্থে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে।

৭. সর্বোপরি আল্লাহর নির্দেশে সকল বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন যে, চারের অধিক বিবাহ করা অবৈধ ঘোষিত হওয়ার পূর্বেই রাসূল ﷺ-এর এ সব বিবাহ হয়েছিল। নিষেধাজ্ঞার আয়াতে অতিরিক্ত স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে বলা হয়নি। আল্লাহ ইরশাদ করেন–

يَآيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ الّٰتِيْ اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّآ اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمّٰتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خٰلٰتِكَ الّٰتِيْ هَاجَرْنَ مَعَكَ ز وَامْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ط قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْٓ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۔

অর্থ: হে নবী! যাদের মোহরানা আদায় করেছেন আপনার জন্য সে স্ত্রীদেরকে হালাল করেছি এবং আপনার করায়ত্ব দাসীদের আপনার জন্য হালাল করেছি। আর আপনার চাচাতো, ফুফাতো, মামাতো এবং খালাতো বোন যারা আপনার সাথে হিজরত করেছে তাদেরকে বিবাহের জন্য হালাল করেছি এবং কোন মু'মিন নারী নিজেকে নবীর নিকট সমর্পণ করলে নবী তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছা পোষণ করলে তাও হালাল। এটা কেবল আপনার জন্য; অন্য কোন মুমিনের জন্য হালাল নয়। যাতে আপনার কোন অসুবিধা না হয়। মু'মিনদের স্ত্রী এবং দাসীদের ব্যাপারে আমি যা নির্ধারণ করেছি তা আমার জানা আছে। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (সূরা আহযাব : আয়াত-৫০)

চারের অধিক বিবাহের এ বিষয়টি বিশ্বনবী এবং তার স্ত্রীদের জন্য একান্ত ব্যতিক্রমধর্মী একটি বিষয়। তাছাড়া রাসূল ﷺ শারীরিকভাবে ৪০ জন পুরুষের শক্তি রাখতেন। এরূপ ব্যতিক্রম আরো অনেক ব্যাপারে রয়েছে। যেমন : তার প্রতি বাধ্যতামূলক কিয়ামুল্লাইল, বিরতিহীন রোজা এবং তাঁর পরিবারের পক্ষে যাকাত ফিতরা গ্রহণ করা হারাম হওয়া, তার কোন উত্তরাধিকারী না থাকা, নবীর স্ত্রীদের প্রতি গোনাহের শাস্তি অধিক নির্ধারণ করা, অধিক নেক আমল করার বাধ্যতামূলক নির্দেশ ইত্যাদি। এ সবকিছুই বিশ্বনবী এবং তার পত্নীদের জন্য একান্ত এবং ব্যতিক্রমী নির্দেশ। আল্লাহ ইরশাদ করেন–

يَانِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّاتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ط وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ـ وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا ـ

অর্থ: হে নবী পত্নীগণ! তোমাদের কেউ অশ্লীল কাজ করলে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে। যা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ। আর যে আল্লাহর এবং তার রাসূলের অনুগত হবে আর নেক কাজ করবে আমি তাকে দুবার পুরস্কার দিব এবং আমি তার জন্য সম্মানজনক রিযিক প্রস্তুত রেখেছি। (সূরা আহযাব : আয়াত-৩০-৩১)

এরপর অধিক বিবাহ থেকে রাসূল ﷺ-কে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ ইরশাদ করেন–

لَايَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ ' بَعْدُ وَلَآ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيْبًا ـ

অর্থ: এরপর কোন নারী আপনার জন্য হালাল নয় এবং তাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও হালাল নয়, তাদের রূপলাবণ্য আপনাকে মুগ্ধ করলেও।

(সূরা আহযাব : আয়াত-৫২)

চারের অধিক স্ত্রীদেরকে তালাক দেয়ার নির্দেশ না দেয়ার পিছনে তাদের প্রতি এহসান, দয়া-মায়া, মানবতা প্রদর্শন ইত্যাদি হেকমত বিদ্যমান রয়েছে। যদি

তাদের কতককে তালাক দেয়া হত, তাহলে তারা বিরাট বিপদের সম্মুখীন হত, তাদের কোন আশ্রয় থাকত না। কেননা বৃদ্ধা রূপহীনা বিধবাদেরকে বিবাহ করতে কেউ সম্মত হতনা। অপরপক্ষে এ বিবাহসমুহের বর্ণিত উদ্দেশাবলী সম্পূর্ণ ভাবেই বিনষ্ট হত। তাদেরকে সম্মান প্রদর্শনের পর অসম্মান প্রদর্শন করা হত, খাতামুন্নাবী এবং শ্রেষ্ঠ নবীর স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জনের পর তাদেরকে অপদস্ত করা হত। যদি রাসূল ﷺ তাদেরকে তালাক দিতেন, তাহলে তা হত তাঁর শিষ্টাচারিতা এবং উত্তম চরিত্রের জন্য বিরাট কলংক। তিনি সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির প্রতি রহমতস্বরূপ আল্লাহর এই ঘোষণার অবমাননা সাব্যস্ত হত। বস্তুত: তাদেরকে তালাক দেয়া শ্রেষ্ঠ নবী এবং বিশ্বনবীর জন্য মোটেই শোভনীয় হত না।

তাছাড়া আল্লাহ তাআলা রাসূল ﷺ-এর স্ত্রীদেরকে মুসলমানদের জননী ঘোষণা করেছেন। এ ঘোষণার মাধ্যমে উম্মতের পক্ষে নবী পত্নীদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। ইরশাদ হয়েছে–

اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗۤ اُمَّهَاتُهُمْ ـ

অর্থ: নবী মু'মিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ আর তার স্ত্রীগণ তাদের মাতা। (সূরা আহযাব : আয়াত-৬)

এ সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে নবীর স্ত্রীদেরকে বিবাহ করা উম্মতের জন্য হারাম করা হয়েছে। নবীপত্নীদেরকে বিবাহ করা নবীর প্রতি অবমাননা এবং নবীর সাথে অসদাচরণ হিসেবে এটা অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য। আল্লাহ ইরশাদ করেন–

وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَاۤ اَنْ تَنْكِحُوْا اَزْوَاجَهٗ مِنْ بَعْدِهٖۤ اَبَدًا ؕ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ـ

অর্থ: আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়া এবং তার ওফাতের পর তার পত্নীদেরকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য হালাল নয়। এটা আল্লাহর নিকট বড় অপরাধ।

(সূরা আহযাব : আয়াত-৫৩)

ইসলামের শত্রু এবং পরশ্রীকাতর লোকদেরকে রাসূল ﷺ-এর সমালোচনা করে এ কথাও বলতে শোনা যায় যে, তিনি ৫৩ বছর বয়সে অল্প বয়সের কুমারী কন্যা আয়েশাকে বিবাহ করলেন কি করে? কিন্তু এদের এরূপ সমালোচনা আমাদের দৃষ্টিতে মাকড়সার জালের মত। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন–

كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا ط وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ.

অর্থ: তারা মাকড়সাতুল্য, যে ঘর বানায় আর সমস্ত ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো অধিক দুর্বল। (সূরা আনকাবুত : আয়াত-৪১)

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, অনেক মুসলমানকেও এ ব্যাপারে সন্দিহান এবং দুর্বলমনা প্রতীয়মান হয়। তারা এ ব্যাপারে প্রশ্নের সম্মুখীন হলে অথবা কেউ এ ব্যাপারে তাদেরকে কু-ধারণা দিলে তারা হতভম্ব এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। চোখে মুখে কোন দিশা পায় না, আবার অনেকে তো তাদের সাথে হ্যাঁ মিলিয়ে জাহান্নামের পথে ধাবিত হয়ে যায়। এর জবাবে আমরা বলতে চাই যে, হে মুসলিম সমাজ! এ বিষয়টিকে শত্রুদের দৃষ্টিতে বিবেচনা করা সমীচীন নয়। সাদাকে কালো, সুন্দরকে অসুন্দর, হালালকে হারাম এবং সম্ভবকে অসম্ভবের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করা সঠিক হবে না।

মিথ্যা অপপ্রচারক, সত্য গোপনকারী, সত্যের সাথে অসত্য মিশ্রণকারী, গোমরাহ, পাপাচারী, অশ্লীল এবং ফ্লিমবাজদের গালগল্প, তাদের রচিত বইপুস্তক, প্রবন্ধ এবং নাটকের চশমায় রাসূল ﷺ-এর বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি আরোপ করা ন্যায়সংগত হবে না। বরং ইসলাম, ঈমান এবং ব্যাধিমুক্ত অন্তরে এ ব্যাপারটি বিবেচনা করতে হবে। আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের দুশমন কাফের মুনাফিক, ফাসেক, ফাজের কিয়ামতের হিসাব নিকাশে অবিশ্বাসীদের হাতিয়ার হওয়া মুসলমানদের জন্য মোটেই মঙ্গলজনক নয়। কারণ এ বিবাহ রাসূল ﷺ আবূ বকর সিদ্দীক (রা), আয়েশা (রা) এবং মুসলিম জাতির জন্য অতীব বরকতময় এবং চিরন্তন আদর্শ।

স্ত্রীদের মধ্যে আয়েশা (রা)-এর স্থান সবার উপরে। তাকে রাসূল ﷺ কুমারী অবস্থায় বিবাহ করেন। তার প্রতি ছিল রাসূল ﷺ-এর অফুরন্ত ভালবাসা, দয়া মমতা এবং একান্ত প্রেম। সুতরাং যে রাসূলের আনন্দে আনন্দ, তাঁর খুশীতে খুশী এবং তাঁর শান্তিতে প্রশান্তি বোধ করে না সে আবার কেমন মুসলমান? এতো ঈমানের দুর্বলতা, অন্তরের কলুষতা এবং মহব্বতের দাবীর অসারতার বাস্তব প্রমাণ। রাসূলের জন্য এবং তার উম্মতের জন্য আল্লাহ্ যা হালাল করেছেন তা হারাম করার অধিকার কার আছে? শ্রেষ্ঠ নবীর সাথে শ্রেষ্ঠতমা মহিলা আয়েশা

(রা)-এর বিবাহ মহান রাব্বুল আলামীনের তত্ত্বাবধানে তাঁর নির্দেশক্রমেই হয়েছে, তা কেউ অস্বীকার করতে পারে?

বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ ও তিরমিযী শরীফে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর নির্দেশক্রমে স্বয়ং জিবরাঈল (عليه السلام) রেশমের সবুজ কাপড় পরিহিত অবস্থায় আয়েশা (রা)-কে রাসূল ﷺ-এর সম্মুখে হাজির করত: বলেছিলেন যে, এ মহিলা ইহকাল এবং পরকাল উভয় জগতের জন্য আপনার স্ত্রী।

এ বিবাহের ব্যবস্থাপনায় আছেন একজন ফিরিশতা, অহীপ্রাপ্ত নবী, এবং নবীর পরম বন্ধু, ছাওর পাহাড়ের সাথী, পবিত্র কুরআনের ভাষায় শ্রেষ্ঠতম মানব আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এবং সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম। আর আয়েশা (রা) হচ্ছেন উম্মুল মু'মিনীন, সমকালীন মহিলাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম মহিলা। যাদের নিকট পিতৃতুল্য বয়সের স্বামীর সাথে অপ্রাপ্ত বয়স্কার বিবাহ অযৌক্তিক এবং আশোভনীয় মনে হয়, তাদের চিন্তা-ভাবনা করা উচিত যে, তাদের এ চিন্তা ও উক্তি মহান আল্লাহকে দোষারোপ করার শামিল কি না? তাদের একথাও বিবেচনা করা বাঞ্ছনীয় যে, এখানে কোন রহস্য এবং স্বতন্ত্র কোন কিছু থাকতে পারে।

রাসূল ﷺ আয়েশার সাথে এমন শিষ্টাচারিতার সাথে ব্যবহার করতেন যে, আয়েশা বয়সে ছোট একথা তিনি কখনও বুঝতে পারতেন না। আর বয়সের কারণে ব্যবহারের তারতম্য না হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কারণ তিনি আল্লাহর প্রিয় এবং দয়ালু নবী ছিলেন। পবিত্রতা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং আল্লাহ প্রদত্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন ন্যায়নিষ্ঠার প্রতীক। তিনি নবী হিসেবে যেমন ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ, তেমনি স্বামী হিসেবে এবং পরিবারের জন্যও শ্রেষ্ঠ এবং উত্তম ব্যক্তি হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। প্রকারান্তরে এ বিবাহ তার রিসালাত এবং নবুওয়্যাতের জন্য ছিল উজ্জ্বল প্রমাণ।

রাসূল ﷺ-এর সাথে জীবন-যাপনকালে আয়েশা (রা) কখনও ভাবতেও পারেননি যে, তিনি বস্তুজগতের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। আয়েশা (রা) যেমন ছিলেন কুমারী এবং সুন্দরী, তেমনি আল্লাহ তাঁর নবীকে অতি সুন্দর এবং যৌবন শক্তিতে পরিপূর্ণতা দান করেছিলেন। যৌবন শক্তি, যৌন প্রক্রিয়া এবং জীবন পরিক্রমায় তার কোন নজীর যুবকদের মধ্যেও ছিল না। তদুপরি তার প্রতি সদা সর্বদা অহী নাযিল হত। নবী হিসেবে রাসূল ﷺ শারীরিক শক্তির প্রশ্নে বিশেষত্বের অধিকারী ছিলেন। অনেক সাহাবার মতে রাসূল ﷺ ৪০ জন শক্তিশালী পুরুষের সমান শক্তির একাই অধিকারী ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করলে

একই রাত্রে সমস্ত স্ত্রীদের সাথে মিলিত হতে এবং তাদের হক পরিপূর্ণভাবে আদায় করতে পারতেন, যা কোন সাধারণ লোকের পক্ষে মোটেও সম্ভব নয়। রূপ সৌন্দর্যের প্রশ্নে রাসূল ﷺ-এর কোন নজীর ছিল না। এমন কি ইউসুফ (عليه السلام) -এর তুলনায়ও তিনি অধিক রূপ সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন। কোন কোন সময় তা প্রকাশও পেয়ে যেত। সাহাবী বারা (রা) বলেন, রাসূল ﷺ মধ্যম আকারের লোক ছিলেন। একদিন (পাড়ে কাজ করা) লাল রংয়ের পোষাক পরিহিত অবস্থায় রাসূল ﷺ-কে দেখেছি। এমন রূপের লোক আর আমি কোনদিন দেখিনি এবং শুনিওনি।

এ বিবাহের কারণে আয়েশা (রা) যে পদমর্যাদার অধিকারী হন কোন বিবেক বুদ্ধির অধিকারী মহিলা তার আকাঙ্ক্ষী না হয়ে পারে না। এ বিবাহের কারণেই তিনি শ্রেষ্ঠ নবীর প্রিয়তমা স্ত্রী এবং উম্মুল মু'মিনীন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। জান্নাতের উচ্চমর্যাদার সুসংবাদ দুনিয়ার বুকেই লাভ করেন। পবিত্র কুরআনে তার প্রশংসার বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে। সূরায়ে নূরের প্রায় এগারোটি আয়াতে তার চারিত্রিক পবিত্রতা এবং উৎকর্ষতার কথা স্বয়ং আল্লাহ ঘোষণা করেছেন। এ গভীর তত্ত্ব এবং রহস্যময় প্রত্যেকটি আয়াতই মুসলিম উম্মাহ এবং সমগ্র মানব জাতির জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। পূত:পবিত্র এ সমাজ গড়ে তোলার জন্য এর প্রত্যেকটি আয়াতই সীমাহীন গুরুত্ব রাখে। তার পবিত্রতা এবং আদর্শ স্ত্রী হওয়ার কথা স্বয়ং আল্লাহ ঘোষণা করে ইরশাদ করেন–

اَلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ -

অর্থ: সচ্চরিত্রা নারীগণ সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষগণ সচ্চরিত্রা নারীদের জন্য। লোকেরা যা বলে তারা তা হতে সম্পূর্ণ পাক-পবিত্র, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা। (সূরা নূর : আয়াত-২৬)

হে আয়েশা! আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার পবিত্রতার বর্ণনা আপনার জন্য মুবারক হোক। আপনি যে কত মহান এবং কত মহান আপনার পদমর্যাদা! আয়েশার প্রতি অপবাদের বর্ণনা সম্বলিত আয়াত যতবার মানুষ তেলাওয়াত করবে, পাঠ করবে এবং গবেষণা করবে, তাদের অন্তরে আয়েশা (রা)-এর পবিত্রতা এবং চরিত্রগত নির্মলতা প্রস্ফুটিত হবে এবং হতে থাকবে।

আয়েশা (রা) বিশ্বনবীর জীবদ্দশাতেই বিশিষ্ট ফকীহা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে অসংখ্য মাসআলা-মাসায়েল তিনি রাসূল ﷺ-এর নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করেন। ফলে সমকালীন এবং পরবর্তী যুগে নারী সমাজের অগণিত সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য তিনি নবীর সরাসরি প্রতিনিধিত্ব করেন।

সারা বিশ্বের লোকেরা বিশেষত: মহিলারা রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশায় এবং তাঁর ওফাতের পর মদীনায় সমবেত হতেন। আর তিনি তাদেরকে আল্লাহ পাকের হুকুম-আহকাম এবং রাসূল ﷺ-এর সুন্নাতের তরবিয়াত করতেন। তার নির্দেশিত মাসআলা-মাসায়েল এবং বর্ণিত হাদীসমূহ ফিকাহের কিতাবসমূহে অদ্যাবধি সুসংরক্ষিত রয়েছে এবং মুসলিম উম্মাহ তার দ্বারা সীমাহীন উপকৃত হয়ে চলেছেন। তার জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কেরামও তার প্রতি মুখাপেক্ষী ছিলেন।

রাসূল ﷺ-এর গভীর এবং রহস্যময় তত্ত্ব, তাঁর ইবাদত, সালাত, সিয়াম, হজ্জ, উমরা, পানাহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, বস্তু বিরাগিতা, দ্বীনতা-হীনতা, মুনাজাত-কান্নাকাটি, যুদ্ধ-সন্ধি, ভিতর-বাহির মোটকথা রাসূল ﷺ-এর আদর্শ জীবনের বিস্তারিত বিষয়াদি উম্মতের নিকট পৌছানো তিনি একনিষ্ঠ মাধ্যম এবং সূত্র। যাদের আয়েশা (রা)-এর জীবনী সম্পর্কে নূন্যতম জ্ঞান আছে তারা নিঃসন্দেহে একথা বলতে বাধ্য যে, বিশ্বনবীর আদর্শ জীবনকে সুসংরক্ষিত করে সঠিক সুন্দরভাবে উম্মতের নিকট পৌছানোর জন্য আল্লাহ আয়েশা (রা)-কে বিশেষভাবে নির্বাচন করেছিলেন এবং তিনি তার দায়িত্ব যথাযথভাবেই আদায় করেছেন।

আয়েশা (রা)-এর বিবাহ আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর জীবনেও বিরাট প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়। এ বিবাহের বরকতে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ঈমানী শক্তি, রাসূল ﷺ-এর সাথে বন্ধুত্ব বন্ধন, সিদ্দীকী মকাম, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং সুদৃঢ় হয়। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে বিশ্বনবী ﷺ সাহাবায়ে কেরাম তথা সমগ্র মুসলিম জাতিকে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর মর্যাদা, উম্মতের প্রতি তার এহসান অবদান এবং কুরবানীর কথা উল্লেখ করে নিদর্শনস্বরূপ নির্দেশ দেন– "মসজিদের দিকের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দাও, কেবলমাত্র আবূ বকরের দরজা খুলে রাখ।"

রাসূল ﷺ-এর এ অসিয়তের কারণে আজও আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সে দরজা খোলা আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত খোলা থাকবে। তাকে রাসূল ﷺ "সিদ্দীক" খেতাবে ভূষিত করেন।

আয়েশা (রা) বিশ্ব মুসলিম নারী সমাজের জন্য এক অবিস্মরণীয় আর্দশ। তিনি ১৯ বছর বয়সে বিধবা হন এবং ৬৭ বছর বয়স পর্যন্ত একাকী জীবন যাপন করেন। বিশ্বনীর অন্যান্য স্ত্রীর মত আয়েশা (রা)-এর বিবাহও উম্মতের ওপর হারাম করে দেয়া হয়। যৌবনের এ দীর্ঘ মুহূর্তে তিনি পাক পবিত্রতা, শিষ্টাচারিতা, সংযমশীলতা, দূরদর্শিতা, ধৈর্যশীলতা এবং আল্লাহভীরুতার পরিচয় দেন। কোনদিন তিনি স্বামীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। রাসূল-এর স্ত্রী হিসেবে অর্জিত সম্মান মর্যাদাকে অক্ষুণ্ন রাখেন, জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে নবীর স্ত্রীর মর্যাদা লাভের গৌরবকে অগ্রাধিকার দেন। যে সমস্ত নারী যৌবনকালে বিধবা হয়ে যান এবং মৃত স্বামীর স্মরণে তার এতীম সন্তান-সন্ততির লালন পালনের তাগিদে অথবা তাকদীরের ফয়সালার কারণে অবিবাহিতা জীবন যাপন করতে হয় আয়েশা (রা) তাদের জন্য উজ্জ্বল আদর্শ। আয়েশা (রা) প্রমাণ করেছেন যে, নারী সমাজ অতি মহান, তারা বস্তু পরাধীন নয়, তারা লোভাতুর নয়, তারা যৌবনের লাগামকে নিয়ন্ত্রণ করতে সুসক্ষম।

আয়েশা (রা) ছিলেন বিশ্বনবীর পর বিশ্বজগতের প্রধান ব্যক্তিত্ব আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর কন্যা। ভদ্রতা শিষ্টাচারিতা, চারিত্রিক উৎকর্ষতা, আন্তরিক পবিত্রতা এবং ঈমানী শক্তির প্রশ্নে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর উত্তরসূরী। বিবাহিত জীবনে নবীর সান্নিধ্যে, অহীর পরশে স্বয়ং রাসূলের সাহচর্যে সরাসরি বস্তু বিরাগিতার শিক্ষা গ্রহণ করেন। বস্তু সামগ্রী অথবা আল্লাহ এবং তার রাসূলকে গ্রহণের কথা স্ত্রীদেরকে বলা হলে মাতা-পিতা এবং মুরুব্বীদের পরামর্শ গ্রহণ উপেক্ষা করে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল ও আখেরাতকে গ্রহণের কথা সকল স্ত্রীদের পূর্বে আয়েশাই প্রথম ঘোষণা করেন। তিনি বয়সে ছোট হতে পারেন কিন্তু সেদিন তিনি নজীরবিহীন বুদ্ধিমত্তা, মেধা এবং দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। আল্লাহ আয়েশা (রা) এবং নবীপত্নী সকলের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

প্রসঙ্গত: এখানে পরিবার-পরিজন এবং আত্মীয়দের সাথে রাসূল-এর আচার-ব্যবহার, চলাফেরা, উঠাবসা, কথাবার্তা, জীবন যাপন প্রণালী কেমন ছিল তা বর্ণনা করা যেতে পারে। তার জীবন ধারণ উপকরণ ছিল খুবই স্বাভাবিক। তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত জীবনোপকরণ গ্রহণ না করার বিষয়টি সকলকে অবাক করে রাখত। কৃচ্ছতা অবলম্বন ছিল তার জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক।

আয়েশা (রা)-এর সূত্রে উরওয়া বলেন, রাসূল-এর ঘরে মাসের পর মাস আগুন জ্বলত না, শুধুমাত্র খেজুর এবং পানির উপর যথেষ্ট করা হত। হ্যাঁ কোন

কোন সময় আনসারী সাহাবীগণ দুধ পাঠাতেন যা তিনি এবং তার পরিবার-পরিজন পান করতেন। রাসূল ﷺ-এর এ অবস্থা অভাব অনটনের কারণে নয়, কারণ তিনি বিশ্ব বিজয়ী ছিলেন, গনীমতের মালসহ রাষ্ট্রীয় কোষাগারেরও তিনি একচ্ছত্র অধিকারী ছিলেন। উম্মতের বেশুমার অর্থ সামগ্রী তার নিয়ন্ত্রণে ছিল। কিন্তু তাঁর হাত ছিল সম্পূর্ণ প্রশস্ত। তাই সবকিছুই তিনি গরীব মিসকীনদের স্বার্থে ব্যয় করে দিতেন, দান-খয়রাত করে দিতেন।

জাবের (রা) বলেন, রাসূল ﷺ কোন প্রার্থনাকারীকে ফেরত পাঠাতেন না।

আনাস (রা) বলেন, রাসূল ﷺ-এর নিকট যে কেউ প্রার্থনা করত সে এমনকি কোন কাফেরও প্রার্থনা করে বিমুখ হয়ে ফিরেনি।

একবার জনৈক কাফের রাসূল ﷺ-এর দরবারে প্রার্থনা জানালে অসংখ্য বকরী দিয়ে তার নিকট ওজরখাহী করেন। কাফের লোকটি ছিল অত্যন্ত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন। সে রাসূল ﷺ-এর দান-খয়রাতের প্রশস্ততা দেখে অনুপ্রাণিত হয় এবং স্বীয় সম্প্রদায়ের লোকদেরকে একত্রিত করে বলেন, হে লোকসমাজ! তোমরা সকলেই ইসলাম গ্রহণ কর, তাহলে তোমাদের অভাব-অনটন দূরীভূত হবে। এভাবে অনেক লোক অর্থ সম্পদের লোভে ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু কিছুদিন রাসূল ﷺ এবং সাহাবীদের সাহচর্যে থাকার পর তাদের অন্তর থেকে বস্তু আকর্ষণ সমূলে নির্মূল হয়ে যেত এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং ইসলামের আক্বীদা বিশ্বাস তাদের অন্তরে সুদৃঢ় হত। বস্তু সামগ্রী ও বস্তু আকর্ষণ পরিহারের এই অপূর্ব আদর্শ তিনি এবং তার পরিবার-পরিজনের নজীরবিহীন বৈশিষ্ট্য।

এ পৃথিবী এর শোভাসামগ্রী যে ক্ষণস্থায়ী আর ঈমান আমলের প্রতিফল ও আখেরাতের জান্নাত যে স্থায়ী এবং চিরস্থায়ী একথা তার ভাল করেই বিশ্বাস ছিল। তাই তিনি আখেরাতের এবং জান্নাতের চিরস্থায়ী ভোগ সামগ্রী লাভের কামনায় দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী বস্তুসামগ্রী বর্জন করার উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করেন, মানব জাতিকে এ আদর্শের প্রতি অনুপ্রাণিত করেন এবং তার দিকে আহ্বান জানান।

ফকীর মিসকীন এবং অভাবগ্রস্ত লোকেরা বিশ্বনবী ﷺ এবং তার পবিত্র পরিবার-পরিজনকে এমন অভাবগ্রস্ত এবং সম্বলহীন দেখতে পায় যার কোন নজীর নেই। অপরপক্ষে ধনাঢ্য সমাজ নবী করীম ﷺ ও তার পরিবার-পরিজনের সংযমশীলতা, কৃচ্ছতা অবলম্বন পরিদর্শন করে প্রকৃত সাফল্যের সন্ধান পায়। সংযমশীলতা এবং বিলাসিতা পরিহারের দিক নির্দেশনা লাভ করে গরীব

মিসকীনের প্রতি দান-খয়রাতের হাত প্রশস্তকরণে অনুপ্রাণিত হয়। মূলত: আল্লাহ তার নবীকে গরীব ধনী সকলের জন্যই আদর্শ নবী হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। তিনি ইরশাদ করেন–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ـ

অর্থ: যারা আল্লাহ এবং আখেরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। (সূরা–৩৩ আহযাব : আয়াত-৩৩)

রাসূল ﷺ-এর সাথে সীমাহীন অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে কৃচ্ছতা অবলম্বন এবং সংকটময় জীবন যাপন করা প্রথম স্ত্রীদের জন্য অসহনীয় এবং কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সে কারণে সকল স্ত্রী রাসূল ﷺ-এর দরবারে তাদের কষ্টের কথা ব্যক্ত করেন এবং এ ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানান। কিন্তু রাসূল ﷺ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন এবং কারো নিকট এ ব্যাপারে যোগাযোগ করতে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। এমতাবস্থায় আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এবং ওমর (রা) সহ সাহাবায়ে কেরাম ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একাধিকবার অনুমতি প্রার্থনা করে ব্যর্থ হন। আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আয়েশা (রা)-এর প্রতি এবং ওমর (রা) হাফসা (রা)-এর প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে বলেন, সাবধান! তোমরা রাসূল ﷺ-কে বিরক্ত কর না এবং তার সামর্থ্যের বহির্ভুত কোন কিছু তার নিকট প্রার্থনা কর না। আয়েশা এবং হাফসা উভয়ই অনুতপ্ত হন এবং ভবিষ্যতে রাসূল ﷺ-এর নিকট কোন কিছু প্রার্থনা না করার প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেন। এ মুহূর্তে নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়–

يَآأَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلاً ـ وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَإِنَّ اللّٰهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيْمًا ـ

অর্থ: হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন এবং তার বিলাসিতা কামনা কর, তবে আস আমি তোমাদের জন্য ভোগসামগ্রীর

ব্যবস্থা করে দিই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদেরকে বিদায় করি। আর যদি তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং আখেরাত কামনা কর তবে তোমাদের মধ্যকার নেককারদের জন্য আল্লাহ্ মহাপুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।

(সূরা আহযাব : আয়াত–২৮-২৯)

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূল ﷺ সর্বপ্রথম সর্বাধিক প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েশাকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেন, হে আয়েশা! আমি তোমাকে একটি কথা বলব, তুমি তোমার মাতা-পিতার পরামর্শ ব্যতীত উত্তর প্রদানে তাড়াহুড়া কর না। আয়েশা (রা) বললেন, সে কথাটি কি? রাসূল ﷺ তাকে আয়াত তিলাওয়াত করে আয়াতের সারমর্ম সম্পর্কে অবগত করলেন। আয়েশা (রা) বললেন, এ ব্যাপারে মাতা-পিতার সাথে পরামর্শ করার কোন প্রয়োজন নেই, আমি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে গ্রহণ করলাম। এরপর পর্যায়ক্রমে রাসূল ﷺ তাঁর সকল পত্নীকে আয়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করলেন। তারা সকলেই একই পথ অবলম্বন করেন, বস্তু সামগ্রী এবং সহায় সম্পদের উপর আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকেই প্রাধান্য দেন। মৃত্যু পর্যন্ত তাঁরা আর কোন দিন দুনিয়া এবং দুনিয়াবী মরীচিকার প্রতি আকর্ষিত হননি বরং বস্তু বিরাগিতায় নিমগ্ন থাকেন।

আবূ সাঈদ মাকবূরী বলেন, বকরীর ভুনা গোশত নিয়ে লোকেরা আবূ হুরায়রা (রা)-কে পানাহারের নিমন্ত্রণ জানালে তিনি এ বলে নিমন্ত্রণে সাড়া দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন যে, রাসূল ﷺ কোনদিন ময়দার রুটি পেট পুরে পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করনেনি। এমতাবস্থায় তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন।

আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল ﷺ ৩০ সা আটার বিনিময়ে স্বীয় 'দেরা' (লৌহ বর্ম) ইয়াহুদীর নিকট বন্ধক রেখে মৃত্যুবরণ করেন।

এ আলোচনার পর যাদের অন্তর রোগাগ্রস্ত অথবা যারা আল্লাহ্ এবং রাসূলের চরম শত্রু, তারা ছাড়া আর কেউ রাসূল ﷺ-এর সমালোচনা করতে পারে কি? পারে কি এমন কটুক্তি করতে যার কঠোর নিষেধাজ্ঞা প্রদান করে আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۔

অর্থ: হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রণী হয়ো না।! (সূরা হুজরাত : আয়াত-১)

বস্তুত: ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান এবং ইসলাম প্রবর্তিত শরী'আত স্থান, কাল ও পাত্র নির্বিশেষে সকলের জন্য ব্যাপক এবং উপযুক্ত। ইসলামী শরী'আত পিতা-মাতা এবং অভিভাবকদেরকে মোটেই এ অধিকার দেয়নি যে, তারা হীন স্বার্থ অথবা ব্যক্তি ও অর্থ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য কন্যাদেরকে কুফুবিহীন বিবাহে বাধ্য করবে। যার যা খুশী তাই করবে এতো নিরেট সীমালংঘন এবং জুলুম। ইসলাম ইনসাফের ধর্ম, কি করে ইসলামে এরূপ অনুমতি থাকতে পারে? কেউ যদি ইসলামকে এই মনে করে তাহলে এটা হবে তার মারাত্মক ভুল। যাতে মানুষ নারী সমাজকে পশ্চিমাদের মত ভোগবিলাসের উপকরণ মনে না করে এবং যাতে নারী সমাজের আল্লাহ প্রদত্ত সম্মান অক্ষুণ্ন থাকে, এ জন্যই বিবাহ শাদীর ক্ষেত্রে ইসলামী শরী'আতে জরুরী এবং প্রয়োজনীয় শর্তাবলী এবং বিধি-নিষেধ রাখা হয়েছে। কন্যার মতামত গ্রহণ, কুফুবিহীন বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা, কুরআন সুন্নাহ বিরোধী বিবাহ-শাদীকে বাতিল বলে ঘোষণা দেয়া, জালেম এবং অত্যাচারী স্বামীর অধিকার খর্ব করে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর মুসলিম কাজীর অধিকার এরই অন্তর্ভুক্ত।

ইসলাম বিশেষজ্ঞ মনীষীগণ বিবাহ সংক্রান্ত বিধি-নিষেধে স্থান, কাল, পাত্রের নিরিখে আলোচনা করে সে দর্শন এবং যুক্তির বিশদ বিবরণ প্রকাশ করেছেন, তাতে বিবাহ সংক্রান্ত আইন কানুনে ইসলামী শরী'আতের বৈশিষ্ট্য দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়। সুস্পষ্ট হয় যে, ইসলামী নিয়ম শৃংখলাই স্থান, কাল এবং পাত্র নির্বিশেষে নারী সমাজের মান মর্যাদা এবং অধিকার সুসংরক্ষণে একমাত্র অদ্বিতীয় ব্যবস্থাপনা।

তবে ইসলাম নাবালেগা অথবা অপ্রাপ্ত বয়স্কা ও বয়স্কদের ব্যাপারেও কোন কোন ক্ষেত্রে অনুমতি প্রদান করেছে। কিন্তু তা করেছে প্রয়োজন এবং বিশেষ অবস্থার খাতিরেই। যাতে মানুষ সেখানেই হীন স্বার্থ উদ্ধারের সুযোগ না পায় সেজন্য উপযুক্ত শর্তাবলী আরোপ করেছে। এ সমূহ শর্তাবলী উপেক্ষা করার মোটেই অবকাশ নেই।

সমাপ্ত

তথ্যসূত্র

১. হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান – ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম

২. আহলে বাইত বা বিশ্বনবীর পরিবার – নাসির হেলাল, সুহৃদ প্রকাশনী

৩. আসহাবে রাসূলের জীবন কথা– মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ; প্রথম প্রকাশ, ১-৩ খণ্ড। বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার।

৪. বিশ্বনবীর সাহাবী– তালিবুল হাশেমী; অনুবাদ : আবদুল কাদের, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১-৫ম খণ্ড, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।

৫. মহিলা সাহাবী– নিয়ায ফতেহপুরী, আনুবাদ : গোলাম সোবহান সিদ্দিকী, তৃতীয় প্রকাশ- ১৯৯৫; আল ফালাহ পাবলিকেশন্স।

৬. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহধর্মিনীগণ– আলহাজ্জ মৌঃ মোঃ নূরুজ্জামান, দ্বিতীয় প্রকাশ–১৯৯৬, বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী লিঃ।

৭ বিশ্বনবীর দাম্পত্য জীবন– ফজলুর রহমান মুন্সী। প্রথম প্রকাশ– ১৯৮৬। বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী লিঃ, ঢাকা।

৮. আসমাউর রিজাল বা রাবী চরিত– মাইন উদ্দিন সিরাজী, আল-বারাকা লাইব্রেরী, ঢাকা।

৯. আসমাউর রিজাল বাংলা– আবূল মোহছেন আবদুল্লাহ আল মাহমুদ, প্রথম প্রকাশ– ১৯৯৪, ছাহাবা প্রকাশনী, লক্ষ্মীপুর।

১০. বহুবিবাহ ইসলাম ও মুহাম্মদ ﷺ আহমদ মনসুর, প্রকাশকাল– ১৯৯৫। তাসনিম পাবলিকেশন্স, মিরপুর ঢাকা।

১১. সংগ্রামী নারী– মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।

১২. নবী পরিবারের প্রতি ভালবাসা– মাওলানা মাহমুদুল হাসান, মজলিসে ইলমী, দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা, আগস্ট– ১৯৯৫।

১৩. মহিলা সাহাবী– তালিবুল হাশেমী, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ– জুন-১৯৯০।

১৪. আর রাহীকুল মাখতুম। প্রকাশক– সোনালী সোপান

১৫. ইসলামী বিশ্বকোষ, বিভিন্ন খণ্ড – ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

১৬. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম ২য় খণ্ড – দ্বিতীয় সংস্করণ, নভেম্বর ১৯৮৭। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

Contents

পিস পাবলিকেশনের বইসমূহ

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
১.	THE GLORIOUS QURAN (আরবি, বাংলা, ইংরেজি)	১২০০
২.	VOCABULARY OF THE HOLY QURAN	২০০
৩.	বিষয়ভিত্তিক আল কুরআনের অভিধান – মো: রফিকুল ইসলাম	
৪.	শব্দে শব্দে আল কুরআনের অভিধান	২৫০
৫.	কিতাবুত তাওহীদ –মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব	১৫০
৬.	বিষয়ভিত্তিক সিরিজ-১ কুরআন ও হাদীস সংকলন –মো: রফিকুল ইসলাম	৪০০
৭.	বিষয়ভিত্তিক সিরিজ-২ লা-তাহযান হতাশ হবেন না –আয়িদ আল কুরনী	৪০০
৮.	বিষয়ভিত্তিক সিরিজ-৩ বুলূগুল মারাম –হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ:)	৪০০
৯.	বিষয়ভিত্তিক সিরিজ-৪, সহীহ হাদীস প্রতিদিন বুখারী মুসলিম হাদীস সংকলন	
১০.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাসি-কান্না ও যিকির –মো : নূরুল ইসলাম মণি	২১০
১১.	নামাজের ৫০০ মাসয়ালা –ইকবাল কিলানী	১৫০
১২.	সহীহ মুকসূদুল মুকমিনীন	৪০০
১৩.	সহীহ নেয়ামুল কুরআন	৪০০
১৪.	সহীহ আমলে নাজাত	২২৫
১৫.	রাসূল ﷺ-এর প্র্যাকটিকাল নামায –মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আততুওয়াইজিরী	২২৫
১৬.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণ যেমন ছিলেন –মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	১৪০
১৭.	রিয়াযুস স্বা-লিহিন –যাকারিয়া ইয়াহইয়া	৬০০
১৮.	রাসূল ﷺ-এর ২৪ ঘন্টা –মো : নূরুল ইসলাম মণি	৪০০
১৯.	নারী ও পুরুষ ভুল করে কোথায় – আল্ বাহি আল্ খাওলি (মিসর)	২১০
২০.	জান্নাতী ২০ (বিশ) রমণী –মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২০০
২১.	জান্নাতী ২০ (বিশ) সাহাবী –মো : নূরুল ইসলাম মণি	২০০
২২.	রাসূল ﷺ সম্পর্কে ১০০০ প্রশ্ন –সাইয়্যেদ মাসুদুল হাসান	১৪০
২৩.	সুখী পরিবার ও পারিবারিক জীবন –মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২২০
২৪.	রাসূল ﷺ-এর লেনদেন ও বিচার ফয়সালা –মো: নূরুল ইসলাম মণি	২২৫
২৫.	রাসূল ﷺ জানাযার নামাজ পড়াতেন যেভাবে –ইকবাল কিলানী	১৩০
২৬.	জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা –ইকবাল কিলানী	২২৫
২৭.	মৃত্যুর পর অনন্ত যে জীবন (মৃত্যুর আগে ও পরে) –ইকবাল কিলানী	২২৫
২৮.	কবরের বর্ণনা (সাওয়াল জওয়াব) –ইকবাল কিলানী	১৫০
২৯.	বাছাইকৃত ১০০ হাদীসে কুদসী –সাইয়্যেদ মাসুদুল হাসান	১৫০
৩০.	দোয়া কবুলের পূর্বশত –মো: মোজাম্মেল হক	১০০
৩১.	ড. বেলাল ফিলিপস সমগ্র	৩৫০
৩২.	ফেরেশতারা যাদের জন্য দোয়া করেন – ড. ফযলে ইলাহী (মক্কী)	৭০
৩৩.	জাদু টোনা, জ্বীনের আছর, ঝাঁর-ফুঁক, তাবীজ কবজ	১৫০
৩৪.	ফাজায়েলে আমল	
৩৫.	কবিরা গুনাহ্	২১০
৩৬.	দাম্পত্য জীবনে সমস্যাবলির ৫০টি সমাধান	১২০
৩৭.	আল্লাহর ভয়ে কাঁদা	৯০